কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো · ১৯৭৯

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том I

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101\text{-}672}{014(01)\text{-}79}$ 737-79 0101010000

সূচি

কার্ল মার্কস। ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ . . . ৯

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। ফয়েরবাখ। বস্তুবাদী এবং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিযোগ ('জার্মান ভাবাদর্শ'-এর ১ম পরিচ্ছেদ) . . ১৩

[১] ১৩

[১। সাধারণভাবে ভাবাদর্শ, বিশেষভাবে জার্মান ভাবাদর্শ . ১৫

[২। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার বিভিন্ন সিদ্ধান্তসূত্র] ১৮

[৩। উৎপাদন এবং সংসর্গ। শ্রমবিভাগ এবং মালিকানার বিভিন্ন আকার: গোষ্ঠীগত, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক] ২০

[৪। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণার সারমর্ম। সামাজিক সত্তা এবং সামাজিক চেতনা] . ২৪

[২] ২৮

[১। মানুষের আদত মুক্তির পরিবেশ] ২৮

[২। ফয়েরবাখের পরিচিন্তনগত এবং সংগতিহীন বস্তুবাদের সমালোচনা] . ২৯

[৩। প্রাথমিক ঐতিহাসিক সম্পর্কসমূহ, বা সামাজিক কর্মবৃত্তির বুনিয়াদী দিকগুলি: জীবনোপায় উৎপাদন, নতুন নতুন চাহিদা উৎপাদন, লোকসমষ্টির পুনরুৎপাদন (পরিবার), সামাজিক আদান-প্রদান, চেতনা] ৩৩

[৪। সামাজিক শ্রমবিভাগ এবং সেটার পরিণতি: ব্যক্তিগত মালিকানা, রাষ্ট্র, সামাজিক কর্মবৃত্তির 'পরকীকরণ'] ৩৯

[৫। কমিউনিজমের একটা বৈষয়িক পত্তন হিসেবে উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ] ৪৩

[৬। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণা থেকে সিদ্ধান্তসমূহ: ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা, ইতিহাসের রূপান্তর বিশ্ব-ইতিহাসে, কমিউনিস্ট বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা] ৪৪

[৭। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণার সংক্ষিপ্তসার] ৫০
[৮। ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ববর্তী, ভাববাদী ধারণার, বিশেষত হেগেলোত্তর জার্মান দর্শনের ভিত্তিহীনতা] ৫২
[৯। ফয়েরবাখ সম্বন্ধে, ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁর ভাববাদী ধারণা সম্বন্ধে বাড়তি সমালোচনা] ৫৫
[৩] ৫৮
[১। শাসক শ্রেণী এবং কর্তৃত্বশালী চেতনা। ইতিহাসে জীবাত্মার আধিপত্য সংক্রান্ত হেগেলীয় ধারণা গঠন] ৫৮
[৪] ৬৩
[১। উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহ এবং মালিকানার বিভিন্ন রূপ] ৬৩
[২। ভৌত আর মানসিক শ্রমের বিভাগ। শহর আর গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছেদ। গিল্ড-ব্যবস্থা।] ৬৫
[৩। আরও শ্রমবিভাগ। বাণিজ্য আর শিল্পের বিচ্ছেদ। বিভিন্ন শহরের মধ্যে শ্রমবিভাগ। ম্যান্যুফ্যাকচার। ৬৮
[৪। সবচেয়ে জটিল শ্রমবিভাগ। বৃহৎ শিল্প] ৭৬
[৫। সমাজ-বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের ধরনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-অসংগতি] ৭৯
[৬। বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষে প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন শ্রেণী গঠন। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতির উদ্ভব। বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিভ্রমজনক সম্মিলনী এবং কমিউনিজমের আমলে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যথার্থ একত্ব। সম্মিলিত ব্যক্তিগণের ক্ষমতার কাছে সমাজের জীবনযাত্রার পরিবেশের বশবর্তিতা] ৮০
[৭। বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষ এবং তাদের জীবনের পরিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতি — উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের ধরনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব-অসংগতি। উৎপাদন-শক্তির উন্নয়ন এবং সংসর্গের ধরন পরিবর্তন] . ৮৮
[৮। ইতিহাসে বলপ্রয়োগের (দেশজয়ের) ভূমিকা] ৯২
[৯। বৃহৎ শিল্প আর অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশে উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের ধরনের মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতির বিকাশ। শ্রম আর পুঁজির মধ্যে বৈপরীত্য।] ৯৪
[১০। ব্যক্তিগত মালিকানা লোপের অপরিহার্যতা, পরিবেশ এবং পরিণতি] ৯৬
[১১।] সম্পত্তির সঙ্গে রাষ্ট্র আর আইনের সম্পর্ক . ৯৯
[১২। সামাজিক চেতনার বিভিন্ন আকার] . ১০৩

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। **কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ** . . ১০৬

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। **কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার** . . . ১২৮
১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা . . . ১২৮
১৮৮২ সালের দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের ভূমিকা . . . ১৩০
১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণে ফ. এঙ্গেলসের ভূমিকা . . . ১৩১
১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে ফ. এঙ্গেলসের ভূমিকা থেকে . . . ১৩৩
১৮৯২ সালের পোলীয় সংস্করণের ভূমিকা . . . ১৩৬
১৮৯৩ সালের ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকা . . . ১৩৮

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার . . . ১৪১

১। বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়ানরা . . . ১৪২
২। প্রলেতারিয়ানরা এবং কমিউনিস্টরা . . . ১৫৭
৩। সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সাহিত্য . . . ১৬৮
১। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র . . . ১৬৮
ক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্র . . . ১৬৮
খ। পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র . . . ১৭০
গ। জার্মান, বা 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র . . . ১৭১
২। রক্ষণশীল, বা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র . . . ১৭৫
৩। সমালোচনী-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম . . . ১৭৬
৪। বিভিন্ন প্রতিপক্ষ পার্টি প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের অবস্থান . . . ১৭৯

কার্ল মার্কস। **বুর্জোয়া শ্রেণী এবং প্রতিবিপ্লব** (দ্বিতীয় প্রবন্ধ) . . . ১৮২

কার্ল মার্কস। **পত্রাবলী** . . . ১৮৮
প্যারিসে প. ভ. আন্নেনকভ সমীপে মার্কস . . . ১৮৮

টীকা . . . ২০৪

নামের সূচি . . . ২১৯

কার্ল মার্ক্স

ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ (১)

১

ফয়েরবাখের বস্তুবাদ সমেত পূর্ববর্তী সমস্ত বস্তুবাদের প্রধান দোষ এই যে, তাতে বস্তুকে [Gegenstand], বাস্তবতাকে, সংবেদ্যতাকে কেবল **বিষয়** [Objekt] রূপে বা **ধ্যান** রূপে ধরা হয়েছে, **মানবিক সংবেদনগত ক্রিয়া** হিসেবে, **ব্যবহারিক কর্ম** হিসেবে দেখা হয় নি, বিষয়ীগতভাবে [subjectively] দেখা হয় নি। ফলে বস্তুবাদের বিপরীতে **সক্রিয়** দিকটি বিকশিত হয়েছে ভাববাদ দিয়ে, কিন্তু তা কেবল বিমূর্তভাবে, কেননা ভাববাদ অবশ্য সংবেদনগত ক্রিয়া ঠিক যা সেইভাবে সেটাকে জানে না। ফয়েরবাখ চান সংবেদনগত বিষয়কে চিন্তাগত বিষয় থেকে সত্যই পৃথক করতে, কিন্তু খোদ মানবিক ক্রিয়াটাকে তিনি **বিষয়গত** [gegenständliche] ক্রিয়া হিসেবে ধরেন না। অতএব, 'খৃষ্টধর্মের সারমর্ম' গ্রন্থে তিনি তাত্ত্বিক ধারণাকেই একমাত্র খাঁটি মানবিক ধারণা বলে গ্রহণ করেন; অপরপক্ষে ব্যবহারিক কর্মকে তিনি তার নোংরা-দোকানদারী চেহারায় কল্পনা করেন এবং সেইভাবেই সেটাকে স্থিরবদ্ধ করে রাখেন। তাই 'বৈপ্লবিক', 'ব্যবহারিক-পরীক্ষামূলক' ক্রিয়ার তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেন না।

২

মানব চিন্তার বিষয়গত সত্য আছে কিনা, এ প্রশ্ন তত্ত্বগত নয়, **ব্যবহারিক**। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষকে তার চিন্তার সত্যতাকে অর্থাৎ বাস্তবতা আর শক্তিকে, ইহমুখিতাকে প্রমাণ করতে হবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তার বাস্তবতা বা অবাস্তবতা নিয়ে বিতর্ক নিছক **পাণ্ডিতী** প্রশ্ন।

মানুষ পরিবেশ এবং পরিপালনের ফল, অতএব পরিবর্তিত মানুষ হল অন্য পরিবেশ এবং পরিবর্তিত পরিপালনেরই ফল, এই বস্তুবাদী মতবাদ ভুলে যায় যে, মানুষই পরিবেশকে পরিবর্তিত করে, এবং স্বয়ং পরিপালককেই পরিপালন করা প্রয়োজন। অতএব, এই মতবাদ অনিবার্যভাবেই সমাজকে দুই অংশে ভাগ করে, তার মধ্যে একাংশ সমাজের ঊর্ধ্বে (যথা, রবার্ট ওয়েনের ক্ষেত্রে)।

পরিবেশের পরিবর্তন এবং মানব ক্রিয়ার পরিবর্তনের মধ্যে মিলটাকে ধারণা করা এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে বোঝা সম্ভব একমাত্র **বৈপ্লবিক পরিবর্তনসাধক ব্যবহারিক কর্ম** হিসেবে।

৪

ফয়েরবাখ শুরু করেন ধর্মমূলক আত্ম-অন্যীভবন — জগৎকে একটা ধর্মীয় কল্পিত জগৎ এবং একটা বাস্তব জগৎ রূপে দ্বিগুণিত করার ঘটনাটা থেকে। ধর্মীয় জগৎকে সেটার ঐহলৌকিক ভিত্তিতে পর্যবসিত করাই তাঁর কাজ। তিনি এইটে উপেক্ষা করেন যে, উক্ত কার্য সমাধার পর প্রধানতম কাজটিই বাকি থেকে যায়; কেননা, ঐহলৌকিক ভিত্তিটি যে নিজের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা স্বতন্ত্র এলাকা হিসেবে মেঘলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, এই ঘটনার একমাত্র প্রকৃত ব্যাখ্যা হল এই ঐহলৌকিক ভিত্তিটিরই স্ববিভাগ এবং স্ববিরোধ। অতএব, শেষোক্তটাকে প্রথমে তার স্ববিরোধের দিক থেকে বুঝতে হবে, তারপর এই বিরোধ দূর করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেটার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ফলে, যেমন ধরা যাক, ঐশ পরিবারের রহস্য হিসেবে পার্থিব পরিবার আবিষ্কৃত হয়ে গেলেই, পার্থিব পরিবারটিকেই তত্ত্বগতভাবে সমালোচনা করা এবং সেটার ব্যবহারিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান প্রয়োজন।

৫

বিমূর্ত চিন্তায় অতৃপ্ত হয়ে ফয়েরবাখ **সংবেদনগত ধ্যানের** দ্বারস্থ হন, কিন্তু সংবেদ্যতাকে তিনি **ব্যবহারিক,** মানবিক-সংবেদনগত ক্রিয়া রূপে দেখেন না।

৬

ধর্মীয় সারমর্মকে ফয়েরবাখ **মানবীয়** সারমর্মে পর্যবসিত করেন। কিন্তু মানবীয় সারমর্ম এমন একটা বিমূর্তায়ন নয় যা প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে নিহিত। বাস্তবে সেটা হল সামাজিক সম্পর্কসমূহের যোগফল।

এই আসল সারমর্মের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন নি বলেই ফয়েরবাখ বাধ্য হন:

১) ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মীয় অনুভূতিকে [Gemüt] আপনাতে একটা কিছু হিসেবে স্থিরবদ্ধ করে তুলতে এবং একটা বিমূর্ত — **বিচ্ছিন্ন** — ব্যক্তি-মানুষকে ধরে নিতে।

২) তাই মানবিক সারমর্মকে তাঁর পক্ষে কেবল একটা 'গণ' ['genus'] হিসেবে, একটি অভ্যন্তরীণ মূক সাধারণ গণ হিসেবে গ্রহণ করাই সম্ভব, যা বহু ব্যক্তি-মানুষকে মেলায় কেবল **স্বাভাবিকভাবে**।

৭

তাই ফয়েরবাখ দেখতে পান না যে, 'ধর্মীয় অনুভূতি' নিজেই একটা **সামাজিক ফল** এবং যে বিমূর্ত ব্যক্তিটির বিশ্লেষণ তিনি করেন সেও প্রকৃতপক্ষে কোন একটা নির্দিষ্ট রূপের সমাজের অন্তর্ভুক্ত।

৮

সামাজিক জীবন মূলতই **ব্যবহারিক**। যেসব রহস্য তত্ত্বকে বিপথচালিত করে নিয়ে যায় অতীন্দ্রিয়বাদে, সেই সমস্ত রহস্যেরই যুক্তিসিদ্ধ সমাধান

পাওয়া যায় মানবিক ব্যবহারিক কর্মের মধ্যে এবং সেটা উপলব্ধি করার মধ্যে।

৯

মননসর্বস্ব বস্তুবাদ, অর্থাৎ যে বস্তুবাদ সংবেদ্যতাকে ব্যবহারিক কর্ম হিসেবে বোঝে না, সেটার অর্জিত **সর্বোচ্চ** শিখর হল 'নাগরিক **সমাজের**' পৃথক পৃথক ব্যক্তি-মানুষকে নিয়ে ধ্যান।

১০

পুরন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল **'নাগরিক'** সমাজ; নতুন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল **মানব-সমাজ** বা **সমাজীকৃত** মানবজাতি।

১১

দার্শনিকেরা কেবল নানাভাবে জগৎকে **ব্যাখ্যা করেছেন,** কিন্তু আসল কথা হল সেটাকে **পরিবর্তিত করা।**

১৮৪৫ সালের বসন্তকালে মার্কসের লেখা

১৮৮৮ সালে এঙ্গেলসের 'ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ এবং চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থের স্বতন্ত্র সংস্করণে পরিশিষ্ট হিসেবে প্রথম প্রকাশিত

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ফয়েরবাখ। বস্তুবাদী এবং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিযোগ

('জার্মান ভাবাদর্শ'-এর ১ম পরিচ্ছেদ) (২)

১

[১ বিভাগ] জার্মান ভাবাদর্শবিদদের কাছ থেকে আমরা যা শুনছি, গত কয়েক বছরে জার্মানি চলেছে একটা তুলনাহীন বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। স্ট্রাউস (৩) থেকে যা শুরু হয়, হেগেলীয় দর্শনের সেই বিয়োজন একটা সর্বব্যাপী গাজনে পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে পাতিত হয়েছে সমস্ত 'অতীতের শক্তি'। সার্ব বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিভিন্ন পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছে, কিন্তু সেগুলির পতনই হয়েছে অবিলম্বে; ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন বীরপুরুষ, কিন্তু আরও দুঃসাহসী এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে তারা নিক্ষিপ্তই হয়েছে তমসাচ্ছন্নতার মাঝে। এটা ছিল এমন বিপ্লব যার পাশে ফরাসী বিপ্লব (৪) একটা ছেলে-খেলা, এটা এমন একটা বিশ্ব-সংগ্রাম যার পাশে দিয়াদোচিদের (৫) সংগ্রামগুলো তুচ্ছ প্রতীয়মান হয়। অশ্রুতপূর্ব দ্রুত পরস্পরকে উচ্ছেদ করেছে বিভিন্ন নীতি, পরস্পরকে পরাস্ত করেছে বিভিন্ন মনন-বীর, আর ১৮৪২—১৮৪৫ সালের তিন বছরে জার্মানিতে অতীতের বস্তু ঝেঁটিয়ে দূর হয়েছে অন্যান্য সময়ে তিন শতাব্দীতে যা হয় তার চেয়ে বেশি।

ধরে নিতে হবে এই সবকিছু ঘটেছে নাকি বিশুদ্ধ চিন্তনের রাজ্যে।

যে-ঘটনা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা নিশ্চয়ই কৌতূহলজনক: পরম ভাবের শটন। সেটার প্রাণের শেষ ঝলকগুলো যখন নিবে গিয়েছিল তখন এই caput mortuum*-এর বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদানের বিয়োজন শুরু হয়েছিল,

---

* আক্ষরিক অর্থে: মরা মাথা; পাতনের পরে পড়ে থাকা অবশেষের জন্যে অভিধাটা ব্যবহৃত হয়; এখানে — অবশিষ্টাংশ, অবশেষ। — সম্পাঃ

সেগুলি নতুন নতুন সমবায়ের অংশভুক্ত হয়েছিল এবং সেগুলো নিয়ে গড়ে উঠেছিল নতুন নতুন পদার্থ। দর্শনের শিল্পপতিরা, যাদের তখন অবধি চলছিল পরম ভাব শোষণের উপর, তারা তখন নতুন সমবায়গুলোকে হস্তগত করেছিল। প্রত্যেকে সম্ভাব্য সমগ্র উৎসাহভরে খুচরো বিক্রি করতে লেগেছিল নিজ ভাগে পাওয়া অংশটাকে। এর ফলে স্বভাবতই দেখা দিয়েছিল প্রতিযোগিতা, সেটা শুরুতে চালান হয়েছিল মোটামুটি রাশভারী বুর্জোয়া চালে। পরে, জার্মান বাজারে যোগান যখন অত্যধিক হয়ে গেল, এবং সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পণ্যটা বিশ্ব-বাজারে কোন সাড়া পেল না, তখন জাল আর ভুয়ো উৎপাদ, উৎকর্ষের অবনতি, কাঁচামালে ভেজাল, লেবেলের মিথ্যাকরণ, ভুয়ো ক্রয়, বিল্-এর দালালি এবং কোন প্রকৃত ভিত্তি ছাড়া ক্রেডিট ব্যবস্থার ফলে কারবারটা মাটি হয়ে গিয়েছিল সচরাচরের জার্মান ধরনে। প্রতিযোগিতাটা পরিণত হয়েছিল উগ্র লড়াইয়ে, যেটাকে এখন পৃথিবীজোড়া তাৎপর্যসম্পন্ন বিপ্লব, অতি বিস্ময়কর ফল আর সাধনসাফল্যের পয়দাকারী বলে উচ্চ প্রশংসা এবং ব্যাখ্যা করা হচ্ছে আমাদের কাছে।

এই যে দার্শনিক ভন্ডামি এমনকি সৎ জার্মান নাগরিকদেরও অন্তরে জাতীয় গর্ববোধের আবেগ জাগিয়ে তোলে, এটার আসল মূল্য আমরা যদি হিসাব করতে চাই, আমরা যদি স্পষ্ট প্রকটিত করতে চাই সমগ্র নবীন-হেগেলীয় আন্দোলনের তুচ্ছতাটাকে, চিন্তার সংকীর্ণতাটাকে এবং বিশেষত নিজেদের সাধনসাফল্য সম্বন্ধে এইসব বীরপুরুষের বিভ্রান্তি এবং খোদ প্রকৃত সাধনসাফল্যের মধ্যকার ট্র্যাজিকমিক বৈসাদৃশ্যটাকে, তাহলে সমগ্র দৃশ্যটার উপর আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে জার্মানির সীমান্ত পেরিয়ে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে।*

---

* [প্রথম আকারের পরিচ্ছন্ন কপিতে এই জায়গায় নিম্নলিখিত অংশটা কেটে দেওয়া আছে:]

[২ পৃঃ] কাজেই এই আন্দোলনের পৃথক পৃথক প্রতিনিধিদের বিশেষ, নির্দিষ্ট সমালোচনার ভূমিকাস্বরূপ আমরা অল্প কয়েকটা সাধারণ মন্তব্য করছি, তাতে তাঁদের সবার পক্ষে অভিন্ন ভাবাদর্শগত সিদ্ধান্তসূত্র [premise] বিশদ করা হচ্ছে। পরবর্তী পৃথক পৃথক সমালোচনাগুলির বুঝ-সমঝ আর প্রেষণার জন্যে যতখানি আবশ্যক সেই পরিমাণে আমাদের সমালোচনার দৃষ্টিকোণ নির্দেশ করতে এই মন্তব্যগুলি যথেষ্ট হবে।

[১।] সাধারণভাবে ভাবাদর্শ, বিশেষভাবে জার্মান ভাবাদর্শ

[২ বিভাগ] একেবারে সেটার সর্বসাম্প্রতিক প্রচেষ্টা অবধি জার্মান সমালোচনা কখনও দর্শনের রাজ্য ছাড়ে নি। এটার সাধারণ দার্শনিক সিদ্ধান্তসূত্রগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা দূরের কথা, এর সমগ্র জিজ্ঞাসা-সমষ্টি প্রকৃতপক্ষে উদ্ভূত হয়েছে একটা নির্দিষ্ট দর্শনতন্ত্রের জমিন থেকে — সেটা হেগেলের। তাদের উত্তরগুলিতেই শুধু নয়, তাদের একেবারে প্রশ্নগুলিতেই ছিল একটা দুর্জ্ঞেয়করণের উপাদান। হেগেলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন বলে এই আধুনিক সমালোচকদের প্রত্যেকেই যত জোর গলায় বলুন না কেন, তাঁদের একজনও হেগেলীয় তন্ত্রের একটা সর্বাত্মক সমালোচনার এমনকি চেষ্টাও করেন নি, তার কারণ হল হেগেলের উপর এই নির্ভর। হেগেলের বিরুদ্ধে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে তাঁদের তর্কযুদ্ধটা গণ্ডিবদ্ধ এতে — প্রত্যেকে হেগেলীয় তন্ত্রের একটা দিক বেছে নিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে ধরেন সমগ্র তন্ত্রটার বিরুদ্ধে এবং অন্যান্যের বেছে-নেওয়া দিকগুলোরও

এই মন্তব্যগুলিকে [৩ পৃঃ] আমরা উপস্থিত করছি বিশেষত **ফয়েরবাখ-এর** বিরুদ্ধে, কেননা তিনিই একমাত্র জন যিনি অন্তত কিছুটা অগ্রগতি করেছেন এবং যাঁর রচনাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে de bonne foi.

১। সাধারণভাবে ভাবাদর্শ এবং বিশেষভাবে জার্মান ভাবাদর্শ

ক। আমরা জানি একটামাত্র বিজ্ঞান, ইতিহাস-বিজ্ঞান। ইতিহাসের দিকে দুটো দিক থেকে তাকিয়ে সেটাকে প্রকৃতির ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাসে ভাগ করা যায়। দিক-দুটো কিন্তু অবিচ্ছেদ্য; যতকাল মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে ততে প্রকৃতির ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাস পরস্পরের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির ইতিহাস, যাকে বলা হয় প্রকৃতিবিজ্ঞান, সেটার সঙ্গে আমরা এখানে সংশ্লিষ্ট নই; কিন্তু মানুষের ইতিহাস নিয়ে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে, যেহেতু প্রায় সমগ্র ভাবাদর্শ বলতে বোঝায় হয় এই ইতিহাসের একটা বিকৃত ব্যাখ্যা, নইলে এর থেকে একটা পরিপূর্ণ বিমূর্তন। ভাবাদর্শ নিজেই হল এই ইতিহাসের একটা দিক মাত্র।

[প্রথম আকারের পরিচ্ছন্ন কপিতে পরে একটা রচনাংশ রয়েছে, যেটাকে কেটে দেওয়া হয় নি, সেটা ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার সিদ্ধান্তসূত্র সম্বন্ধে। এই পুস্তকখণ্ডে এই রচনাংশটাকে প্রধান (দ্বিতীয়) আকারের পরিচ্ছন্ন কপির বয়ানে ২য় বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হল (১৮-২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ]

বিরুদ্ধে। শুরুতে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন 'পদার্থ' আর 'আত্মচেতনার'* মতো বিশুদ্ধ না-মিথ্যাকৃত হেগেলীয় ধারণামৌল [category], পরে তাঁরা 'প্রজাতি,' 'সেই অদ্বিতীয়,' 'মানুষ',** ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত লোকায়ত অভিধা দিয়ে ঐসব ধারণামৌল অপবিত্র করেন।

স্ট্রাউস থেকে স্টির্নার অবধি জর্মান দার্শনিক সমালোচনার সমগ্র বিন্যাসটা **ধর্মীয়** ধারণাসমূহের*** সমালোচনায় গণ্ডিবদ্ধ। সমালোচকেরা শুরু করেছিলেন আসল ধর্ম এবং প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা থেকে। ধর্মীয় চেতনা এবং ধর্মীয় ধারণা বলতে আসলে কী বোঝায় সেটা তাঁরা চলবার সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত হয়েছিল বিভিন্ন প্রকারে। তাঁদের অগ্রগতিটা ছিল এই যে, কর্তৃত্বশালী বলে কথিত আধিবিদ্যক, রাজনীতিক, আইনগত, নৈতিক এবং অন্যান্য ধারণাকে তাঁরা ধর্মীয় কিংবা ব্রহ্মবিদ্যাগত ধারণার শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন; আর তেমনি সেটা ছিল এই যে, তাঁরা রাজনীতিক, আইনগত, নৈতিক চেতনাকে ধর্মীয় কিংবা ব্রহ্মবিদ্যাগত বলে, এবং রাজনীতিক, আইনগত, নীতিগত মানুষকে — শেষ উপায় হিসেবে 'মানুষকে' — ধর্মনিষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মের আধিপত্যটাকে বাস্তব বলে ধরেই নেওয়া হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটা প্রাধান্যশালী সম্পর্ককে এক-একটা ধর্মীয় সম্পর্ক বলে ঘোষণা করে এক-একটা আচারতন্ত্রে পরিণত করা হয়েছিল — আইনের আচারতন্ত্র, রাষ্ট্রের আচারতন্ত্র, ইত্যাদি। চারদিকে প্রশ্নটা ছিল কেবল বিভিন্ন আপ্তবাক্য নিয়ে এবং বিভিন্ন আপ্তবাক্যে বিশ্বাস নিয়ে। জগৎটাকে ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় পবিত্রীকৃত করতে করতে শেষে আমাদের ভেনারেব্‌ল সেন্ট মাক্স**** সেটাকে একযোগে মাহাত্ম্য প্রদান করে উঠতে এবং চূড়ান্তভাবে এটার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলেন।

---

* ডাভিড স্ট্রাউস এবং ব্রুনো বাউয়েরের বুনিয়াদী ধারণামৌল। — সম্পাঃ

** লুডভিগ ফয়েরবাখ এবং মাক্স স্টির্নারের বুনিয়াদী ধারণামৌল। — সম্পাঃ

*** [নিম্নলিখিত রচনাংশ পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] ...যেটাকে সমস্ত অমঙ্গল থেকে জগতের পরম ত্রাণকর্তা বলে দাবি করা হয়েছিল। ধর্মকে প্রধান শত্রু হিসেবে, এইসব দার্শনিকের পক্ষে বিতৃষ্ণাকর সমস্ত সম্পর্কের চূড়ান্ত কারণ বলে ক্রমাগত গণ্য করা এবং সেইভাবে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।

**** মাক্স স্টির্নার। — সম্পাঃ

যেকোন জিনিসকে যেইমাত্র কোন হেগেলীয় যুক্তিবিদ্যাঘটিত ধারণামৌলে পরিণত করা হত অমনি সাবেকী হেগেলপন্থীরা সেটাকে **উপলব্ধি করতেন।** নবীন হেগেলপন্থীরা যেকোন জিনিসে ধর্মীয় ধারণা আরোপ করে কিংবা সেটাকে ব্রহ্মবিদ্যাগত বিষয় বলে দিয়ে সেটার **সমালোচনা করেন।** ধর্মের, বিভিন্ন ধারণার, বিদ্যমান জগতে একটা সর্বব্যাপী মূলনীতির নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসের ব্যাপারে নবীন হেগেলপন্থীরা সাবেকী হেগেলপন্থীদের সঙ্গে একমত। শুধু, একপক্ষ এই রাজ্যটাকে আক্রমণ করে অন্যায়-দখল বলে, আর ন্যায়সম্মত বলে সেটার স্তুতিবাদ করে অপর পক্ষ।

যেহেতু নবীন হেগেলপন্থীরা বিভিন্ন ধারণা, চিন্তন, ভাবকে, প্রকৃতপক্ষে চেতনার সমস্ত উৎপাদকে — তাঁরা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করেন যেগুলিতে — বিবেচনা করেন মানুষের আসল শৃঙ্খল বলে (ঠিক যেমন সাবেকী হেগেলপন্থীরা সেগুলিকে ঘোষণা করেছিলেন মানব-সমাজের আসল বন্ধনী বলে), তাই এটা স্পষ্টপ্রতীয়মান যে, নবীন হেগেলপন্থীদের লড়তে হবে কেবল চেতনার এইসব অধ্যাসের বিরুদ্ধে। যেহেতু, নবীন হেগেলপন্থীদের উদ্ভট কল্পনা অনুসারে, মনুষ্যগণের সম্পর্কগুলো, তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, তাদের শৃঙ্খলগুলো এবং তাদের অসামর্থ্যগুলো তাদের চেতনার জাতফল, তাই তাঁরা মানুষের বর্তমান চেতনার বদলে মানবিক, বৈচারিক কিংবা অহমিকার চেতনা* লাভের এবং এইভাবে তাদের অসামর্থ্যগুলো দূর করার নৈতিক স্বীকার্য যৌক্তিক প্রণালীতে আরোপ করেন মানুষে। চেতনা বদলের এই দাবিটা হল বাস্তবতাকে অন্য উপায়ে ব্যাখ্যা করার, অর্থাৎ অন্য একটা ব্যাখ্যার সাহায্যে বাস্তবতাকে চেনার দাবির সমতুল। 'জগৎবিদারক' (৬) বলে কথিত তাঁদের চিন্তনগুলো সত্ত্বেও নবীন-হেগেলীয় ভাবাদর্শবিদেরা অতি কট্টর রক্ষণশীল। সর্বসাম্প্রতিক নবীন হেগেলপন্থীরা বলেছেন, তাঁরা লড়ছেন কেবল **'বিভিন্ন চিন্তনের'** বিরুদ্ধে — এতে তাঁরা পেয়েছেন নিজেদের ক্রিয়াকলাপের সঠিক বাচনটি। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, ঐসব চিন্তনের বিপরীতে তাঁরা নিজেরাই শুধু দাঁড় করাচ্ছেন অন্যান্য চিন্তন, আর এই জগতের নিছক চিন্তনগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে থেকে তাঁরা আসল বিদ্যমান জগৎটার

* ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ, ব্রুনো বাউয়ের এবং মাক্স স্টির্নার-এর কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

বিরুদ্ধে লড়ছেন না কোনক্রমেই। এই দার্শনিক সমালোচনা একমাত্র যে ফল লাভ করতে পেরেছে সেটা হল ধর্মীয় ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে খৃষ্টধর্মের অল্প কয়েকটা (তাও আবার একেবারেই একপেশে) বিশদীকরণ; এইসব গুরুত্বহীন বিশদীকরণে তাঁরা সর্বব্যাপী গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন আবিষ্কার করেছেন বলে যে-দাবি করেন তারই শুধু আরও অলঙ্করণ হল তাঁদের বাদবাকি যাবতীয় দৃঢ়োক্তি।

জার্মান বাস্তবতার সঙ্গে জার্মান দর্শনের সংযোগের ব্যাপারে, তাঁদের নিজেদের ভৌত পরিপার্শ্বের সঙ্গে তাঁদের সমালোচনার সম্পর্কের ব্যাপারে অনুসন্ধান করার কথাটা এইসব দার্শনিকের কারও মনে পড়ে নি।*

[২ ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার বিভিন্ন সিদ্ধান্তসূত্র]**

[৩ পৃঃ] যেসব সিদ্ধান্তসূত্র থেকে আমরা শুরু করছি সেগুলি খামখেয়ালী নয়, আপ্তবাক্য নয়, সেগুলি হল বাস্তব সিদ্ধান্তসূত্র, যার থেকে বিমূর্তন করা যেতে পারে কেবল কল্পনায়। সেগুলি হল বাস্তব ব্যক্তিগণ, তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং তারা জীবনযাপন করে যে বৈষয়িক পরিবেশে, যে-পরিবেশ তারা পায় ইতঃপূর্বে বিদ্যমান, আর যে-পরিবেশ তারা পয়দা করে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে, উভয়ই। এইভাবে, এইসব সিদ্ধান্তসূত্র [৪ পৃঃ] যাচাই করা যেতে পারে নিছক প্রায়োগিক উপায়ে।

সমগ্র মানব-ইতিহাসের প্রথম সিদ্ধান্তসূত্র নিশ্চয়ই জীবন্ত ব্যক্তি মনুষ্যগণের অস্তিত্ব।*** এইভাবে, প্রথম যে-তথ্যটা প্রতিপাদন করতে হবে সেটা

* পরিচ্ছন্ন কপির প্রধান আকারের পাণ্ডুলিপিতে এর পরে পৃষ্ঠাটার বাদবাকি অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে। তার পরের পৃষ্ঠায় যে-বয়ান আছে সেটাকে এই খণ্ডে ছাপা হল ৩ বিভাগ হিসেবে। — সম্পাঃ

** এই বিভাগটার বয়ান নেওয়া হয়েছে পরিচ্ছন্ন কপির প্রথম আকার থেকে। — সম্পাঃ

*** [পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত রচনাংশটা কেটে দেওয়া আছে:] এসব ব্যক্তিকে প্রাণী থেকে যা পৃথক করে ফেলে তাদের সেই প্রথম **ঐতিহাসিক** কৃতি এই নয় যে, তারা চিন্তা করে, সেটা এই যে, তারা **তাদের জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন করতে শুরু করে।**

হল এইসব ব্যক্তির ভৌত সংগঠন এবং বাদবাকি প্রকৃতির সঙ্গে তাদের অনুবর্তী সম্পর্ক। আমরা অবশ্য এখানে মানুষের প্রকৃত ভৌত প্রকৃতি কিংবা মানুষ যে-প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্মুখীন হয় — ভূতাত্ত্বিক, পর্বত-জলভাগ সংক্রান্ত, জলবায়ুঘটিত, ইত্যাদি — এর কোনটা নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হতে পারি নে।* ইতিহাস লিখন সবসময়েই শুরু হওয়া চাই এইসব প্রাকৃতিক বনিয়াদ এবং মানুষের কার্যকরণের ফলে ইতিহাসের ধারায় সেগুলির পরিবর্তিত অবস্থা থেকে।

প্রাণী থেকে মানুষকে পৃথক করে দেখা যেতে পারে চেতনা দিয়ে, ধর্ম দিয়ে কিংবা ইচ্ছামতো অন্য যেকোন কিছু দিয়ে। তারা নিজেরা প্রাণী থেকে নিজেদের পৃথক করে দেখতে শুরু করে যেইমাত্র তারা তাদের জীবনধারণের উপকরণ **উৎপাদন করতে** শুরু করে — যে-পদক্ষেপটা নির্ধারিত হয় তাদের ভৌত সংগঠন দিয়ে। জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন ক'রে মানুষ পরোক্ষে উৎপন্ন করছে তাদের প্রকৃত বৈষয়িক জীবন।

মানুষ যে-উপায়ে তাদের জীবনধারণের উপকরণ উৎপন্ন করে সেটা সর্বপ্রথমে নির্ভর করে প্রকৃত যে জীবনধারণের উপকরণ তারা বিদ্যমান অবস্থায় পায় এবং যা তাদের পুনরুৎপাদন করতে হয় তার প্রকৃতির উপর।

[৫ পৃঃ] এই উৎপাদন-প্রণালীটাকে স্রেফ ব্যক্তির ভৌত অস্তিত্বের পুনরুৎপাদন বলে গণ্য করা চলবে না। এটা বরং এইসব ব্যক্তির একটা নির্দিষ্ট রূপের সক্রিয়তা, তাদের জীবনের অভিব্যক্তির একটা নির্দিষ্ট রূপ, তাদের দিক থেকে একটা নির্দিষ্ট **জীবনযাত্রার প্রণালী**। ব্যক্তিগণ যেভাবে জীবন অভিব্যক্ত করে, তারা তেমনই। কাজেই, তারা যা সেটা তাদের উৎপাদনের সঙ্গে মিলে যায় — তারা **কি উৎপাদন** করে, আর **কিভাবে** উৎপাদন করে উভয়ত। এইভাবে ব্যক্তির প্রকৃতি নির্ভর করে তার উৎপাদনের নির্ধারক বৈষয়িক পরিবেশের উপর।

---

* [পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত রচনাংশটা কেটে দেওয়া আছে:] এইসব পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষের আদি, স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠন, বিশেষত নৃকুলগত পার্থক্যই শুধু নয়, আরও নির্ভর করে বর্তমান কাল অবধি মানুষের সমগ্র পরবর্তী বিকাশ কিংবা বিকাশের ঊনতা।

এই উৎপাদন দেখা দেয় শুধু **জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে**। সেটা বলতে আবার বোঝায় তার আগে ব্যক্তিগণের মধ্যে **পারস্পরিক সংসর্গ** [Verkehr] (৭)। এই সংসর্গের ধরনটাও আবার নির্ধারিত হয় উৎপাদন দিয়ে।*

[৩। উৎপাদন এবং সংসর্গ। শ্রমবিভাগ এবং মালিকানার বিভিন্ন আকার: গোষ্ঠীগত, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক]

[৩ বিভাগ] বিভিন্ন জাতির মধ্যকার সম্পর্ক নির্ভর করে তাদের প্রত্যেকটার উৎপাদন-শক্তি, শ্রমবিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সংসর্গ বিকাশের পরিসরের উপর। এই উক্তিটা সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এক-জাতির সঙ্গে অন্যান্য জাতির সম্পর্কই শুধু নয়, খোদ জাতিটারই সমগ্র অভ্যন্তরীণ গঠনও নির্ভর করে সেটার উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ আর বহিস্থ সংসর্গের বিকাশ যে-পর্বে পৌঁছেছে তার উপর। কোন জাতির উৎপাদন-শক্তিসমূহ কতদূর বিকশিত সেটা সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকটিত হয় শ্রমবিভাগ যেখানে পৌঁছেছে তার মাত্রা দিয়ে। প্রত্যেকটা নতুন উৎপাদন-শক্তি, যে-পরিমাণে সেটা ইতঃপূর্বে জানা উৎপাদন-শক্তিসমূহের পরিমাণগত প্রসারমাত্র নয় (যেমন নতুন নতুন জমি আবাদ করা), শ্রমবিভাগের আরও বিকাশ ঘটায়।

কোন একটা জাতির অভ্যন্তরে শ্রমবিভাগ থেকে প্রথমে ঘটে কৃষি-শ্রম থেকে শিল্প আর বাণিজ্য ক্ষেত্রের শ্রমের বিচ্ছেদ, আর তার থেকে **শহর** আর **গ্রামাঞ্চলের** মধ্যে বিচ্ছেদ এবং এদের স্বার্থ-সংঘাত। সেটার আরও বিকাশের ফলে ঘটে শিল্প-শ্রম থেকে বাণিজ্য-শ্রমের বিচ্ছেদ। তার সঙ্গে সঙ্গে এইসব বিভিন্ন শাখার ভিতরে শ্রমবিভাগের ফলে বিভিন্ন নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমে সহযোগী ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে ওঠে বিভিন্ন বিভাগ। এইসব পৃথক পৃথক বর্গের আপেক্ষিক অবস্থান নির্ধারিত হয় কৃষি, শিল্প আর বাণিজ্যে প্রযুক্ত প্রণালী দিয়ে (গোষ্ঠীপতিতন্ত্র, দাসপ্রথা, বিভিন্ন সামাজিক বর্গ, বিভিন্ন

* পরিচ্ছন্ন কপির প্রথম আকার এখানে শেষ। পরে এই খণ্ডে রয়েছে পরিচ্ছন্ন কপির প্রধান আকারের বয়ান। — সম্পাঃ

শ্রেণী)। এইসব একই অবস্থা দেখা যায় (অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সংসর্গ থাকলে) বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

শ্রমবিভাগের বিকাশের বিভিন্ন পর্ব হল মালিকানার ততগুলো ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র, অর্থাৎ শ্রমবিভাগের বিদ্যমান পর্বটা আরও নির্ধারণ করে শ্রমের মালমশলা, সাধিত্র এবং উৎপাদের প্রসঙ্গে ব্যক্তিগণের সম্পর্ক।

প্রথম আকারের মালিকানা হল গোষ্ঠীগত [Stammeigentum] মালিকানা (৮)। এটা উৎপাদনের অবিকশিত পর্বের প্রতিষঙ্গী, সেই পর্বে কোন লোকসমষ্টি জীবনধারণ করে শিকার করে আর মাছ ধরে, পশুপালন করে কিংবা, সর্বোচ্চ পর্বে, কৃষিকাজে। বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি থাকে, এটা বোঝায় শেষোক্ত ক্ষেত্রে। এই পর্বে শ্রমবিভাগ তখনও নিতান্ত প্রাথমিক, সেটা পরিবারে বিদ্যমান স্বাভাবিক শ্রমবিভাগের আরও প্রসারে গণ্ডিবদ্ধ। কাজেই সামাজিক গঠনটা পরিবারের কিছু প্রসারে সীমাবদ্ধ; গোষ্ঠীগত পারিবারিক গোষ্ঠীপতিরা, তাদের নিচে গোষ্ঠীর সদস্যরা, শেষে দাসেরা। পরিবারে অন্তর্নিহিত দাসত্ব সম্প্রসারিত হয় শুধু ক্রমে ক্রমে, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এবং যুদ্ধ আর বিনিময় উভয় রকমের বহিঃসম্পর্ক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে।

দ্বিতীয় আকারটা হল প্রাচীন সম্প্রদায়গত এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা, যেটা আসে বিশেষত চুক্তি কিংবা যুদ্ধজয়ের ফলে কয়েকটা গোষ্ঠী সম্মিলিত হয়ে **নগরী** স্থাপন করা থেকে, তখনও সেটার সঙ্গে সঙ্গে থাকে দাসত্ব। সম্প্রদায়গত মালিকানার পাশাপাশি তখনই অস্থাবর এবং পরে স্থাবর ব্যক্তিগত সম্পত্তিও গড়ে উঠতে দেখা যায়, কিন্তু সেটা সম্প্রদায়গত মালিকানার অধীন একটা অস্বাভাবিক আকার হিসেবে। নাগরিকেরা তাদের মেহনতী দাসদের উপর আয়ত্তি খাটায় কেবল তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, কাজেই একমাত্র এইজন্যেই তারা সম্প্রদায়গত আকারের মালিকানার সঙ্গে আবদ্ধ। তাদের দাসদের বিপরীতে, সক্রিয় নাগরিকদের এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত আকারের পরিমেলে থেকে যেতে বাধ্য করে সম্প্রদায়গত ব্যক্তিগত মালিকানাই। এই কারণে, সম্প্রদায়গত মালিকানার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজের সমগ্র গঠন এবং তার সঙ্গে লোকসমষ্টির ক্ষমতা বিশেষত যে-পরিমাণে ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তি গড়ে ওঠে সেই একই পরিমাণে ক্ষয়ে যায়। শ্রমবিভাগ ইতোমধ্যে

অপেক্ষাকৃত প্রসারিত। ইতোমধ্যে তখনই দেখা যায় শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিরোধ; পরে, যেসব রাষ্ট্র শহরের স্বার্থের প্রতিনিধিস্বরূপ আর যেসব রাষ্ট্র গ্রামাঞ্চলের স্বার্থের প্রতিনিধিস্বরূপ সেগুলির মধ্যে বিরোধ, আর খাস শহরগুলিরই ভিতরে শিল্প এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের মধ্যে বিরোধ। নাগরিকদের এবং দাসদের মধ্যে শ্রেণীগত সম্পর্ক তখন পূর্ণবিকশিত।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে প্রথম বার দেখতে পাই সেই একই পরিবেশ, যা আমরা আবার দেখতে পাব — শুধু অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে — আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে। একদিকে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমাহরণ, যা শুরু হয়েছিল বহু প্রাচীনকালে রোমে [লিসিনাসের ভূমি-আইন (৯) যার প্রমাণ] এবং দ্রুত এগিয়ে চলেছিল গৃহযুদ্ধগুলোর সময় থেকে এবং বিশেষত সম্রাটদের আমলে; অন্যদিকে, প্লিবিয়ান ছোট কৃষকদের প্রলেতারিয়েতে রূপান্তর, সেটা অবশ্য সম্পত্তিবান নাগরিক আর দাসদের মধ্যবর্তী অবস্থানের দরুন কখনও স্বতন্ত্র বিকাশ লাভ করতে পারে নি।

তৃতীয় আকারের মালিকানা হল সামন্ততান্ত্রিক বা সামাজিক-বর্গগত মালিকানা। যেক্ষেত্রে প্রাচীন কালের যাত্রা শুরু হয়েছিল **শহর** এবং তার ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে, মধ্যযুগের যাত্রা শুরু হয়েছিল **গ্রামাঞ্চল** থেকে। এই ভিন্ন ভিন্ন যাত্রারম্ভস্থল নির্ধারিত হয়েছিল তখনকার জনসমষ্টির অনিবিড়তা দিয়ে, জনসমষ্টি তখন ছড়ান ছিল বিশাল এলাকায়, সেটা বিজেতাদের কাছ থেকে কোন বড়রকমের বৃদ্ধি লাভ করে নি। কাজেই, গ্রীস আর রোম থেকে খুবই ভিন্ন প্রকারে, সামন্ততান্ত্রিক বিকাশ শুরুতে থাকে ঢের বেশি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে, যেটার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় রোমক রাজ্যজয় এবং প্রথমে সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষির প্রসার দিয়ে। ক্ষীয়মাণ রোম-সাম্রাজ্যের শেষের শতাব্দীগুলি এবং বিজাতীয়দের [barbarians] রোম-সাম্রাজ্য জয় কতকগুলো উৎপাদন-শক্তি বিনষ্ট করেছিল; কৃষির অবনতি ঘটছিল, বাজারের অভাবে শিল্পের অধঃপাত ঘটছিল, বাণিজ্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল কিংবা জোর করে বন্ধ করা হচ্ছিল, গ্রামীণ আর শহুরে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। এইসব অবস্থা এবং সেগুলো দিয়ে নির্ধারিত রাজ্যজয়ের সংগঠন-প্রণালী থেকে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা গড়ে উঠেছিল জার্মানিক সামরিক সংবিধানের প্রভাবে। গোষ্ঠীগত এবং সম্প্রদায়গত

মালিকানার মতো এটার আবার ভিত্তি হল একটা সম্প্রদায়; কিন্তু এটার বিপরীতে স্থাপিত সরাসর উৎপাদক শ্রেণী নয় দাসেরা, যেমনটা ছিল প্রাচীন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, সেটা হল ভূমিদাসে পরিণত করা ছোট কৃষককুল। সামন্ততন্ত্র যেইমাত্র পূর্ণবিকশিত হল, অমনি আরও দেখা দিল শহরের প্রতি বৈরিতা। ভূমি-মালিকানার স্তরবিভক্ত গঠন এবং সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র অনুচরবর্গগুলো ভূমিদাসদের উপর অভিজাতকুলের আয়ত্তি যোগাল। প্রাচীন সম্প্রদায়গত মালিকানাটা যতখানি ঠিক সেই পরিমাণেই এই সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন হল একটা বশীভূত উৎপাদক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা পরিমেল; কিন্তু উৎপাদনের পৃথক পরিবেশের দরুন এটার পরিমেলের আকার এবং সরাসর উৎপাদকদের সঙ্গে সম্পর্ক অন্য রকম।

শহরগুলিতে, ভূমি-মালিকানার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্থানীয় হল নিগমবদ্ধ রূপের মালিকানা, বৃত্তিসমূহের সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন। এতে সম্পত্তি হল [৪ বিভাগ] প্রধানত প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষের শ্রম। সংগঠিত দস্যু-অভিজাতকুলের বিরুদ্ধে পরিমেলের আবশ্যকতা, যখন শিল্পপতি ছিল আবার ব্যাপারীও সেই যুগে সাধারণী রক্ষিত বাজারের প্রয়োজন, উঠতি শহরগুলিতে দলে-দলে চলে-আসা পলাতক ভূমিদাসদের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা, সমগ্র দেশের সামন্ততান্ত্রিক গঠন: এই সবকিছু গিল্ডগুলির উদ্ভব ঘটিয়েছিল। পৃথক পৃথক কারিগরদের ক্রমে-ক্রমে জমান ক্ষুদ্র পুঁজি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনায় তাদের সুস্থিত সংখ্যা থেকে উদ্ভূত হয় দিনমজুর [journeyman] আর শিক্ষানবিসের সম্পর্ক, যেটা শহরগুলিতে গ্রামাঞ্চলের অনুরূপ স্তরবিভক্ত ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়।

এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক যুগে সম্পত্তির প্রধান আকার হল একদিকে ভূমি-সম্পত্তি আর তার সঙ্গে শৃঙ্খলিত ভূমিদাস-শ্রম, আর অন্যদিকে দিনমজুরদের শ্রম নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্র পুঁজিওয়ালা ব্যক্তি-মানুষের শ্রম নিয়ে। উভয়ের সংগঠন নির্ধারিত হয়েছিল উৎপাদনের সীমাবদ্ধ পরিবেশ দিয়ে — ভূমিতে ক্ষুদ্রায়তনের এবং আদিম ধরনের চাষাবাদ, আর কারিগরি ধরনের শিল্প। সামন্ততন্ত্রের পরম শ্রীবৃদ্ধির সময়ে শ্রমবিভাগ ছিল যৎসামান্যই। প্রত্যেকটা দেশ নিজের মধ্যে ধারণ করত শহর আর গ্রামাঞ্চলের বিরোধ; বিভিন্ন সামাজিক বর্গে বিভাগ অবশ্যই ছিল প্রবলভাবে লক্ষণীয়;

কিন্তু গ্রামাঞ্চলে প্রিন্স, অভিজাত, যাজক এবং কৃষকেরা, আর শহরগুলিতে মনিব, দিনমজুর, শিক্ষানবিস এবং অচিরেই আরও ঠিকা মজুরের ভিড় ছেড়ে দিলে গুরুত্বসম্পন্ন কোন শ্রমবিভাগ ঘটে নি। কৃষিতে সেটাতে কঠিন করে ফেলেছিল ফালি ফালি জমিতে চাষাবাদ, তার পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল কৃষকদের নিজেদেরই কুটিরশিল্প। শিল্পক্ষেত্রে, খাস পৃথক পৃথক বৃত্তিতে আদৌ কোন শ্রমবিভাগ ছিল না, আর সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে ছিল যৎসামান্যই। অপেক্ষাকৃত পুরন শহরগুলিতে শিল্প আর বাণিজ্যের বিচ্ছেদ আগে থেকেই বিদ্যমান পাওয়া গিয়েছিল; অপেক্ষাকৃত নতুন শহরগুলিতে সেটা গড়ে উঠেছিল শুধু পরে, যখন শহরগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

অপেক্ষাকৃত বড় বড় অঞ্চল একত্রে মিলিয়ে বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য গড়াটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল ভূমিসম্পত্তিবান অভিজাতকুলের জন্যে, যেমন শহরগুলির জন্যে। শাসক শ্রেণী অভিজাতকুলের সংগঠনের শীর্ষে তাই সর্বত্রই ছিল একজন রাজা।*

[৪। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণার সারমর্ম। সামাজিক সত্তা এবং সামাজিক চেতনা]

[৫ বিভাগ] কাজেই প্রকৃত অবস্থাটা হল এই যে, কোন নির্দিষ্ট ধরনে উৎপাদনকরভাবে সক্রিয় বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষ** নির্দিষ্ট সামাজিক আর রাজনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণকে প্রত্যেকটা পৃথক ক্ষেত্রে প্রায়োগিক উপায়ে, কিছু রহস্যাচ্ছন্ন না করে এবং কোন দূরকল্পনা

* পাণ্ডুলিপিতে এর পরে পৃষ্ঠাটার বাদবাকি অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় আরম্ভ হয়েছে ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণার সংক্ষিপ্তসার। চতুর্থ, বুর্জোয়া আকারের মালিকানা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ২-৪ বিভাগ পরিচ্ছেদের ৪র্থ ভাগে। — সম্পাঃ

** [মূল পাঠ:] বিভিন্ন নির্দিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্কের অধীন বিভিন্ন নির্দিষ্ট ব্যক্তি।

ছাড়াই স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে উৎপাদনের সঙ্গে সামাজিক আর রাজনীতিক গঠনের সংযোগটাকে। সামাজিক গঠন আর রাষ্ট্র ক্রমাগত অভিব্যক্ত হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যক্তি-মনুষ্যগণের জীবন-প্রক্রিয়ার ভিতর থেকে, কিন্তু সেইসব ব্যক্তি তাদের নিজেদের কিংবা অন্যান্য জনের কল্পনায় যেমনটা প্রতীয়মান হতে পারে তেমনসব ব্যক্তির নয়, তারা **বাস্তবিকই** যা তেমনটা, অর্থাৎ যেভাবে তারা সক্রিয় হয়, বৈষয়িকভাবে উৎপাদন করে, এবং তাই তাদের ইচ্ছা থেকে স্বতন্ত্র যেসব নির্দিষ্ট বৈষয়িক সীমাবদ্ধতা, পূর্বস্বীকার্য আর পরিবেশে তারা যেভাবে কাজ করে তেমনি সব ব্যক্তির।*

বিভিন্ন ভাবের, ধারণার, চেতনার পয়দা হওয়াটা প্রথমে সরাসরি বিজড়িত থাকে মানুষের বৈষয়িক সক্রিয়তা এবং বৈষয়িক সংসর্গের সঙ্গে, যেটা হল বাস্তব জীবনের ভাষা। মানুষের ধারণা করা, চিন্তন, মানসিক সংসর্গ এই পর্বে তাদের বৈষয়িক আচরণের সরাসর নিঃসরণ বলে প্রতীয়মান হয়। কোন লোকসমষ্টির রাজনীতি, আইন, নৈতিকতা, ধর্ম, অধিবিদ্যা, ইত্যাদির ভাষায় যেমনটা প্রকাশ পায় সেই মানসিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মানুষ হল তাদের ধারণা, ভাব-ভাবনা, ইত্যাদির উৎপাদক — বাস্তব, সক্রিয় মানুষ, যেভাবে তারা রূপায়িত-অভ্যস্ত হয় তাদের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এবং সুদূরবর্তী আকারগুলি অবধি সেগুলির প্রতিষঙ্গী সংসর্গের

---

* [নিম্নলিখিত রচনাংশটা পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] এইসব ব্যক্তি যেসব ভাব-ভাবনা গড়ে তোলে সেগুলি হল হয় প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিষয়ে, নইলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে, নইলে তাদের নিজেদের প্রকৃতি বিষয়ে ভাব-ভাবনা। এটা স্পষ্টপ্রতীয়মান যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের ভাব-ভাবনা হল তাদের প্রকৃত সম্পর্ক আর ক্রিয়াকলাপের, তাদের উৎপাদন আর সংসর্গের এবং তাদের সামাজিক আর রাজনীতিক সংগঠনের সচেতন প্রকাশ — বাস্তব কিংবা অলীক। এর বিপরীত অঙ্গীকারটা সম্ভব একমাত্র যদি বাস্তব, বৈষয়িকভাবে অভিব্যক্ত ব্যক্তি-মনুষ্যগণের মননের উপর ধরে নেওয়া হয় একটা অতিরিক্ত পৃথক মনন। এইসব ব্যক্তির বাস্তব সম্পর্কগুলির সচেতন অভিব্যক্তি যদি হয় অলীক, কল্পনায় তারা যদি উলটে-পালটে দেয় বাস্তবতাকে, তাহলে সেটা হল আবার তাদের সীমাবদ্ধ বৈষয়িক সক্রিয়তা-প্রণালীর এবং সেই থেকে উদ্ভূত তাদের সীমাবদ্ধ সামাজিক সম্পর্কের ফল।

একটা নির্দিষ্ট বিকাশ দিয়ে।* চেতনা কখনও সচেতন অস্তিত্ব ছাড়া কিছু হতে পারে না, আর মানুষের অস্তিত্ব হল তাদের প্রকৃত জীবন-প্রক্রিয়া। সমস্ত ভাবাদর্শে মানুষ এবং তাদের পরিবেশ যে ক্যামেরা অবস্কিউরায় যেমন সেইভাবে উলটে-পালটে প্রতীয়মান হয়, এই ব্যাপারটা দেখা দেয় ঠিক সেই পরিমাণে তাদের ইতিহাসক্রমিক জীবন-প্রক্রিয়া থেকে যে-পরিমাণে অক্ষিপটে বিভিন্ন বস্তু ওলটান অবস্থায় দেখা দেয় সেগুলির ভৌত জীবন-প্রক্রিয়া থেকে।

জার্মান দর্শন অবতরণ করে আকাশ থেকে মাটিতে, স্বর্গ থেকে মর্তে, তার সরাসর বিপরীতে এক্ষেত্রে আমরা আরোহণ করছি মাটি থেকে আকাশে, মর্ত থেকে স্বর্গে। অর্থাৎ কিনা, বাস্তব রক্ত-মাংসের মানুষে পেঁছবার জন্যে আমরা মানুষ যা বলে, কল্পনা করে, ধারণা করে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করছি নে, কিংবা মানুষ সম্বন্ধে যেভাবে বর্ণনা করা, ভাবা, কল্পনা করা, ধারণা করা হয় সেখান থেকেও না। আমরা যাত্রা শুরু করছি বাস্তব, সক্রিয় মানুষ থেকে, আর তাদের বাস্তব জীবন-প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে আমরা প্রদর্শন করছি বিভিন্ন ভাবাদর্শগত প্রতিবর্তের বিকাশ এবং এই জীবন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রতিধ্বনি। মানুষের মস্তিষ্কে গঠিত অপচ্ছায়াগুলিও অবশ্যই সেগুলির ভৌত জীবন-প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত শোধিত রূপ, যে-জীবন-প্রক্রিয়াটার সত্যাখ্যান করা যায় প্রায়োগিক উপায়ে, যে-প্রক্রিয়াটা বিভিন্ন ভৌত সিদ্ধান্তসূত্রের সঙ্গে আবদ্ধ। এইভাবে নৈতিকতা, ধর্ম, অধিবিদ্যা, ভাবাদর্শের বাদবাকি সবটা এবং সেগুলির প্রতিষঙ্গী বিভিন্ন রূপের চেতনার স্বাতন্ত্র্যের চেহারাটা আর বজায় থাকে না। সেগুলির নেই কোন ইতিহাস, নেই বিকাশ; কিন্তু মানুষ তাদের বৈষয়িক উৎপাদন আর তাদের বৈষয়িক সংসর্গ সম্প্রসারিত ক'রে বদলে ফেলে এটার সঙ্গে তাদের আসল অস্তিত্ব, তাদের চিন্তন এবং তাদের চিন্তনের উৎপাদ। জীবন চেতনা দিয়ে নির্ধারিত নয়, চেতনাই নির্ধারিত হয় জীবন দিয়ে। সমীপবর্তী হবার প্রথম প্রণালীতে যাত্রারম্ভস্থলটা হল জীবন্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত চেতনা; বাস্তব জীবনের সঙ্গে যেটা মেলে সেই দ্বিতীয় প্রণালীতে সেটা

* [মূল পাঠে:] মানুষ তাদের বিভিন্ন ধারণা, ভাব-ভাবনা, ইত্যাদি পয়দা করে, আর সেটা ঠিক এমন মানুষ যারা তাদের বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-প্রণালী, তাদের বৈষয়িক সংসর্গ এবং সামাজিক আর রাজনীতিক গঠনে সেটার আরও বিকাশ দিয়ে রূপায়িত-অভ্যস্ত।

হল বাস্তব জীবন্ত ব্যক্তিগণ নিজেরাই, আর চেতনা কেবল তাদের চেতনা বলে বিবেচিত।

সমীপবর্তী হবার এই প্রণালীটা সিদ্ধান্তসূত্রবিহীন নয়। এটা যাত্রারম্ভ করে বিভিন্ন বাস্তব সিদ্ধান্তসূত্র থেকে এবং মুহূর্তের জন্যেও সেগুলিকে ছাড়ে না। এটার সিদ্ধান্তসূত্র হল মানুষ, কোন উদ্ভট বিচ্ছিন্নতা আর ধরাবাঁধার মাঝে মানুষ নয়, নির্দিষ্ট পরিবেশের আওতায় তাদের প্রকৃত, প্রায়োগিক উপায়ে জ্ঞাতব্য বিকাশ-প্রক্রিয়ার মাঝে মানুষ। যেইমাত্র এই সক্রিয় জীবন-প্রক্রিয়া বর্ণিত হয় অমনি ইতিহাস আর নয় বিভিন্ন নিষ্প্রাণ তথ্যের সংগ্রহ, যা সেটা প্রয়োগবাদীদের কাছে যারা নিজেরা তখনও বিমূর্ত, কিংবা আর নয় ভাববাদীদের কাছে যেমন সেইভাবের কল্পিত বিষয়ীদের কল্পিত সক্রিয়তা।

যেখানে দূরকল্পনা শেষ হয় — বাস্তব জীবনে — সেখানে বাস্তব, প্রয়োগজ বিজ্ঞানের শুরু: মানুষের ব্যবহারিক সক্রিয়তার, বিকাশের ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার প্রতিরূপায়ণ। চেতনা সম্বন্ধে ফাঁকা কথা ক্ষান্ত হয়, আর সেটার জায়গায় আসা চাই আদত জ্ঞান। বাস্তবতা চিত্রিত হলে জ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে দর্শন তার অস্তিত্বের মাধ্যম খুইয়ে বসে। বড়জোর, সেটার জায়গা নিতে পারে শুধু সবচেয়ে সাধারণ ফলাফলের একটা সংক্ষিপ্তসার, যে-ফলাফল হল মানুষের ইতিহাসক্রমিক বিকাশ পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত বিমূর্তন। আদত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এইসব বিমূর্তনের আপনাতে একেবারে কোন মূল্যই নেই। সেগুলো শুধু ঐতিহাসিক মালমশলার বিন্যাস সহজ করে দেবার, সেটার পৃথক পৃথক স্তরের পারম্পর্য নির্দেশ করার উপযোগী হতে পারে। কিন্তু দর্শন যেমনটা করে সেইভাবে ইতিহাসের যুগগুলিকে পরিপাটি করে সাজাবার কোন ব্যবস্থাপত্র কিংবা ছক সেটা যোগাতে পারে না কোনক্রমেই। বরং তার উলটোটা, কোন অতীত যুগই হোক কিংবা বর্তমান যুগই হোক, সেটা সম্বন্ধে আমাদের ঐতিহাসিক মালমশলার পর্যবেক্ষণ আর বিন্যাস — প্রকৃত চিত্রণ — করতে আমরা যখন আরম্ভ করি তখনই শুরু হয় আমাদের দুষ্করতা। এইসব দুষ্করতা দূরীকরণ নিয়ন্ত্রিত হয় এমনসব সিদ্ধান্তসূত্র দিয়ে যেগুলিকে এখানে বিবৃত করা একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু সেগুলিকে স্পষ্টপ্রতীয়মান করে তুলবে শুধু প্রত্যেকটা যুগের প্রকৃত জীবন-প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তি মনুষ্যগণের সক্রিয়তা

সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ। এইসব বিমূর্তনের কোন-কোনটাকে এখানে আমরা বেছে নেব, যেগুলিকে আমরা ব্যবহার করব ভাবাদর্শবিদদের থেকে বিষমবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, আর সেগুলিকে আমরা বিশদ করে তুলব বিভিন্ন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে।*

২

[১। মানুষের আদত মুক্তির পরিবেশ]

[১] দর্শন, ব্রহ্মবিদ্যা, সারমর্ম এবং তাবৎ বাজে জিনিসকে 'আত্মচেতনায়' পর্যবসিত করে এবং এই যেসব বুলি মানুষকে কখনও দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে নি সেগুলোর আধিপত্য থেকে তাকে মুক্ত করে 'মানুষের' 'মুক্তি' এক-পাও এগোয় না, এটা আমাদের বিজ্ঞ দার্শনিকদের কাছে ব্যাখ্যা করে তাঁদের বিদিত করার কষ্টস্বীকার আমরা অবশ্য এখানে করব না।** এটাও তাঁদের কাছে আমরা ব্যাখ্যা করব না যে, আদত মুক্তি লাভ করা সম্ভব একমাত্র বাস্তব জগতে এবং বাস্তব উপায় প্রয়োগ করে, স্টিম-ইঞ্জিন এবং মিউল আর স্পিনিং-জেনি ছাড়া দাসপ্রথা লোপ করা যায় না, উন্নীত কৃষিকাজ ছাড়া লোপ করা যায় না ভূমিদাসপ্রথা, সাধারণভাবে আর লোকে যতকাল গুণে আর পরিমাণে যথেষ্ট মাত্রায় খাদ্য আর পানীয়, বাসস্থান আর পোশাক পেতে অপারক ততকাল তারা মুক্ত হতে পারে না। 'মুক্তি' একটা ঐতিহাসিক কৃতি, মানসিক কৃতি নয়, আর সেটা ঘটে ঐতিহাসিক পরিবেশ দিয়ে, শিল্প, বাণিজ্য, [কৃষি] কৃষ্টি, [সংসর্গের পরিবেশ]-এর [বিকাশ] দিয়ে*** [২] তার পরে,

---

* পরিচ্ছন্ন কপির প্রধান (দ্বিতীয়) পাঠ এখানে শেষ। এর পরে এই খণ্ডে রয়েছে মূল পাণ্ডুলিপির তিনটে ভাগ। — সম্পাঃ

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] দার্শনিক মুক্তি এবং আদত মুক্তি; **মানুষ। অদ্বিতীয় জন। ব্যক্তি-মানুষ;** ভূতাত্ত্বিক, জলভাগ-সংক্রান্ত, ইত্যাদি পরিবেশ। মানব-দেহ। চাহিদা এবং শ্রম।

*** এখানে পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গেছে: পাতাটার নিচের অংশ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে; বয়ানের একটা ছত্র নেই। — সম্পাঃ

সেগুলোর বিকাশের বিভিন্ন পর্ব অনুসারে, ধর্মীয় আর ব্রহ্মবিদ্যাগত বাজে জিনিস যেমন তেমনি সারমর্ম, বিষয়ী, আত্মচেতনা সংক্রান্ত বাজে জিনিসগুলো, আর পরে সেটা অপসারিত হয় আবার যখন সেগুলোর বিকাশ যথেষ্ট দূর এগিয়ে গেছে।* যে-দেশটায় ঘটছে শুধু একটা নগণ্য ঐতিহাসিক বিকাশ সেই জার্মানিতে এইসব মানসিক ঘটন, এইসব মহিমান্বিত করা আর অকার্যকর তুচ্ছ বস্তুগুলো স্বভাবতই ঐতিহাসিক বিকাশের ঊনতার বদলি হিসেবে কাজ দেয়, আর সেগুলো শিকড় গাড়ে, সেগুলোর বিরুদ্ধে লড়া আবশ্যক। কিন্তু এই লড়াইটা স্থানীয় গুরুত্বসম্পন্ন।**

[২। ফয়েরবাখের পরিচিন্তনগত এবং সংগতিহীন বস্তুবাদের সমালোচনা]

[...]*** [৮] বাস্তবে এবং **কেজো** বস্তুবাদী অর্থাৎ **কমিউনিস্টদের** পক্ষে এটা হল বিদ্যমান জগৎটাকে আমূল পরিবর্তিত করার, বিদ্যমান অবস্থাগুলোকে কার্যক্ষেত্রে আক্রমণ করে বদলাবার প্রশ্ন। সময়ে-সময়ে আমরা যখন ফয়েরবাখের এমন অভিমত দেখতে পাই, সেটা কখনও বিচ্ছিন্ন আন্দাজের চেয়ে বেশি কিছু নয়, আর তাঁর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি উপর সেটার প্রভাব এতই যৎসামান্য যাতে এখানে সেটা বিকাশের যোগ্য ভ্রূণ ছাড়া কিছু বলে গণ্য নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে ফয়েরবাখের 'ধারণা' একদিকে সে-সম্বন্ধে নিছক পরিচিন্তনে এবং অন্যদিকে নিছক অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ; 'বাস্তব ঐতিহাসিক মানুষ'-এর বদলে তিনি বলেন 'মানুষ'। 'মানুষ' হল আসলে 'জার্মানরা'। প্রথম ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে **পরিচিন্তনে,** তিনি অবশ্যম্ভাবীভাবেই নেমে পড়েন এমনসব বস্তুর উপর যেগুলো তাঁর চেতনা আর অনুভূতির বিরুদ্ধে, যেগুলো তাঁর আগে থেকে ধরে নেওয়া সমন্বয়টাকে বিশৃঙ্খল করে দেয়, সেটা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্ত অংশের এবং বিশেষত মানুষ আর প্রকৃতির

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] বিভিন্ন উক্তি এবং বাস্তব বিচলন। জার্মানিতে উক্তিগুলোর গুরুত্ব।

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] ভাষা হল বাস্তবতার ভাষা।

*** পাণ্ডুলিপিতে এখানে পাঁচটা ছত্র নেই। — সম্পাঃ

সমন্বয়।* এই বিশৃঙ্খলাটাকে দূর করার জন্যে তাঁকে দ্বিগুণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকরণের শরণ নিতে হয়, একটা সাধারণ্য, তাতে প্রত্যক্ষ হয় শুধু যা 'একেবারেই স্পষ্টপ্রতীয়মান,' আর অন্যটা উচ্চতর, দার্শনিক, তাতে প্রত্যক্ষ হয় সবকিছুর 'আসল সারমর্ম'। তিনি এটা দেখতে পান না যে, তার চারদিককার জগৎটা কেমন সরাসর নিত্যকাল থেকে প্রদত্ত এমন বস্তু নয় যা চিরকাল একই থেকে যায়, সেটা হল শিল্প এবং সমাজের অবস্থা থেকে একটা উৎপাদ, আর বাস্তবিকই সেটা এই অর্থে যে, এটা ইতিহাসের উৎপাদ, সমগ্র পুরুষানুক্রমের সক্রিয়তার ফল, তার প্রত্যেকটা পুরুষপর্যায় পূর্ববর্তীটার কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে গড়ে তুলেছে তার শিল্প আর তার সংসর্গ, সমাজব্যবস্থার অদলবদল ঘটিয়েছে পরিবর্তিত প্রয়োজন অনুসারে। এমনকি সবচেয়ে সহজ-সরল 'ইন্দ্রিয়গত নিশ্চয়তা' আছে যেসব বস্তুর সেগুলিও তিনি পেয়েছেন কেবল সামাজিক বিকাশ, শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংসর্গের সাহায্যে। যা সুবিদিত, প্রায় সমস্ত ফলগাছের মতো, চেরিগাছ অল্প কয়েক শতাব্দী আগে আমাদের মণ্ডলে পরিবাহিত হয়েছিল **বাণিজ্যের** দ্বারা, কাজেই কেবল [৯] একটা নির্দিষ্ট যুগে একটা নির্দিষ্ট সমাজের এই কৃতি **দ্বারা** সেটা ফয়েরবাখের পক্ষে একটা 'ইন্দ্রিয়গত নিশ্চয়তা' হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত বলি, যখন আমরা সবকিছুকে এইভাবে ধারণা করি, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে যা এবং যেভাবে ঘটেছিল, তখন প্রত্যেকটা প্রগাঢ় দার্শনিক সমস্যা একেবারে সহজ-সরলভাবেই একটা প্রয়োগজ তথ্যে রূপান্তরিত হয়, যা আরও স্পষ্ট দেখা যাবে পরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন (ব্রুনো তো অনেকখানি এগিয়ে 'প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসে অ্যান্টিথিসিসের' কথা অবধি বলেছেন (১১০ পৃঃ) (১০), যেন এরা হল দুটো পৃথক 'বস্তু', আর মানুষের সামনে যেন সব সময়ে ছিল না

---

* দ্রষ্টব্য। ফয়েরবাখের ত্রুটিটা এই নয় যে, যা একেবারেই স্পষ্ট-প্রতীয়মান, ইন্দ্রিয়লব্ধ বাহ্যরূপ, সেটাকে তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলো সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত যথাযথ পরীক্ষা দিয়ে সাব্যস্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ বাস্তবতার সাপেক্ষ করেন, সেটা হল এই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের দিকে দার্শনিকের 'চোখ' দিয়ে, অর্থাৎ দার্শনিকের 'চশমার' ভিতর দিয়ে তাকানর শরণ নিয়ে ছাড়া তিনি শেষ পর্যন্ত সেটার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন না।

একটা ঐতিহাসিক প্রকৃতি এবং একটি প্রাকৃতিক ইতিহাস [জীববৃত্তান্ত]), যার থেকে পয়দা হয়েছে 'সারমর্ম' আর 'আত্মচেতনা' সম্বন্ধে তাবৎ 'অগাধীয় সমুন্নত রচনা'।* সেটা আপনা থেকেই টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে যখন আমরা বুঝতে পারি যে, প্রসিদ্ধ 'প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একত্ব' বরাবরই বিদ্যমান থেকেছে শিল্পে, আর শিল্পের অপেক্ষাকৃত কম কিংবা অপেক্ষাকৃত বেশি বিকাশ অনুসারে বিভিন্ন আকারে প্রত্যেকটা যুগে বিদ্যমান থেকেছে — ঠিক প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের 'সংগ্রামের'ই মতো — প্রতিযঙ্গী ভিত্তিতে মানুষের উৎপাদন-শক্তি গড়ে ওঠা অবধি একেবারে। শিল্প আর বাণিজ্য, উৎপাদন আর জীবনীয়-বিনিয়ম নিজেরাই নির্ধারণ করে বণ্টন, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর গঠন, আর সেগুলো আবার এটা দিয়ে নির্ধারিত হয় সেগুলো চালিয়ে যাবার প্রণালীর ব্যাপারে; এইভাবে এমনটা হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ম্যাঞ্চেস্টারে ফয়েরবাখ দেখেন শুধু কল-কারখানা আর যন্ত্রপাতি, সেখানে এক-শ' বছর আগে দেখা যেত কেবল চরকা আর বুনন-তাঁত, কিংবা রোমের চারদিককার কাম্পানিয়ায় [সমভূমিতে] তিনি দেখতে পান কেবল পশুচারণ ভূমি আর জলা, যেখানে অগস্তাসের আমলে হলে তিনি রোমক পুঁজিপতিদের ভিলাগুলো আর দ্রাক্ষাক্ষেত্রগুলো ছাড়া কিছুই দেখতে পেতেন না। বিশেষত প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষকরণগুলির কথা বলেন ফয়েরবাখ; যেসব রহস্য উদ্ঘাটিত হয় কেবল পদার্থবিজ্ঞানী আর রসায়নীদের দৃষ্টিতে সেগুলোর কথা তিনি উল্লেখ করেন; কিন্তু কোথায় থাকত প্রকৃতিবিজ্ঞান শিল্প আর বাণিজ্য ছাড়া? এমনকি এই 'বিশুদ্ধ' প্রকৃতিবিজ্ঞানেরও, সেটার মালমশলার ব্যাপারেও, একটা লক্ষ্য স্থাপিত হয় কেবল বাণিজ্য আর শিল্পের ভিতর দিয়ে, মানুষের ইন্দ্রিয়গত সক্রিয়তার ভিতর দিয়ে। এই কর্মবৃত্তি, এই অবিরাম ইন্দ্রিয়গত শ্রম আর সৃষ্টি, এই উৎপাদন এমনই পরিমাণে সমগ্র ইন্দ্রিয়গত জগৎ এখন যেমনটা বিদ্যমান সেটার ভিত্তি, যাতে মাত্র এক-বছরের ছেদ পড়লে ফয়েরবাখ প্রাকৃতিক জগতে একটা বিপুল পরিবর্তন দেখতে পেতেন শুধু তাই নয়, অধিকন্তু অচিরেই তিনি দেখতে পেতেন মানুষের সমগ্র কর্মক্ষেত্র এবং তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকরণ ক্ষমতা, না, তাঁর নিজ অস্তিত্বই খোয়া গেছে। অবশ্য এই সবকিছুতে বহিঃপ্রকৃতির পূর্বতা অক্ষুণ্ণই

* গ্যেটে, 'ফাউস্ট', 'Prolog im Himmel' ('স্বর্গে প্রস্তাবনা')। — সম্পাঃ

থেকে যায়, আর generatio aequivoca* থেকে জাত আদি মনুষ্যগণের ক্ষেত্রে এটা কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়; কিন্তু কেবল যে-পরিমাণে মানুষকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র বলে বিবেচনা করা হয় তাতে এই পৃথককরণের অর্থ আছে। সেদিক থেকে দেখলে, প্রকৃতি, যে-প্রকৃতি মানব-ইতিহাসের পূর্ববর্তী, সেটা কোনক্রমেই নয় সেই প্রকৃতি যেখানে ফয়েরবাখ জীবনযাপন করেন, সে প্রকৃতি আজ আর নেই কোথাও (হয়ত অস্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি উদ্ভূত অল্প কয়েকটা প্রবাল-দ্বীপে ছাড়া), কাজেই ফয়েরবাখের পক্ষে সেটার অস্তিত্ব নেই।

'বিশুদ্ধ' বস্তুবাদীদের সঙ্গে তুলনায় ফয়েরবাখের [১০] একটা মস্ত সুবিধে নিশ্চয়ই এই যে, মানুষও কেমন একটা 'ইন্দ্রিয়গ্রামের বিষয়' সেটা তিনি উপলব্ধি করেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে তিনি ধারণা করেন শুধু ইন্দ্রিয়গ্রামের বিষয় হিসেবে, 'ইন্দ্রিয়গম্য কর্মবৃত্তি' হিসেবে নয়, এটা ছেড়ে দিলে যেহেতু তিনি তবু থেকে যান তত্ত্বের রাজ্যে এবং মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করেন তাদের নির্দিষ্ট সামাজিক সংযোগের মাঝে নয়, তারা যা তেমনটা তাদের যেটা করেছে তাদের জীবনযাত্রার সেই বিদ্যমান পরিবেশে নয়, তাই তিনি যথার্থই বিদ্যমান সক্রিয় মানুষে পেঁছিতে পারেন না কখনও, তিনি বিমূর্ত 'মানুষে' থেমে যান, 'আসল, ব্যক্তি, দেহী' মানুষকে অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করার পরে আর এগোতে পারেন না, অর্থাৎ 'মানুষের সঙ্গে মানুষের' প্রেম আর বন্ধুত্ব ছাড়া কোন 'মানবীয় সম্পর্ক' তিনি জানেন না, আর সেটাও আদর্শরূপায়িত। জীবনযাত্রার বর্তমান পরিবেশের কোন সমালোচনা তিনি দেন না। এইভাবে, ইন্দ্রিয়গম্য জগৎটাকে তিনি কখনও সেটা যাদের নিয়ে গড়া সেই ব্যক্তি-মনুষ্যগণের জীবন্ত ইন্দ্রিয়গত **কর্মবৃত্তির** সাকল্য হিসেবে ধারণা করে উঠতে পারেন না; কাজেই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন তিনি সুস্থ লোকদের বদলে দেখতে পান গন্ডমালা-রোগগ্রস্ত, অতি-খাটা এবং ক্ষয়রোগগ্রস্ত অনাহারক্লিষ্ট লোকের ভিড় তখন তিনি 'উচ্চতর প্রত্যক্ষকরণে' আর 'প্রজাতির মধ্যে' আদর্শ 'ক্ষতিপূরণের' মাঝে আশ্রয় নিতে এবং এইভাবে ভাববাদে পুনঃপতিত হতে বাধ্য হন, ঠিক যে-সন্ধিক্ষণে কমিউনিস্ট বস্তুবাদী উপলব্ধি

* স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব। — সম্পাঃ

করেন শিল্প আর সামাজিক কাঠাম উভয়ের একটা রূপান্তরের এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেটার জন্যে আবশ্যক অবস্থার আবশ্যকতা।

ফয়েরবাখ যে-মাত্রায় বস্তুবাদী তাতে ইতিহাস তাঁর বিষয়ীভূত নয়, আর যে-মাত্রায় তিনি ইতিহাসে নিয়ে বিচার-বিবেচনা করেন তাতে তিনি বস্তুবাদী নন। তাঁর বিবেচনায় বস্তুবাদ আর ইতিহাস একেবারেই ভিন্নমুখী, যে-ব্যাপারটা, প্রসঙ্গত, যা বলা হয়েছে তার থেকে ইতোমধ্যেই স্পষ্টপ্রতীয়মান।*

[৩। প্রাথমিক ঐতিহাসিক সম্পর্কসমূহ, বা সামাজিক কর্মবৃত্তির বুনিয়াদী দিকগুলি: জীবনোপায় উৎপাদন, নতুন নতুন চাহিদা উৎপাদন, লোকসমষ্টির পুনরুৎপাদন (পরিবার), সামাজিক আদান-প্রদান, চেতনা]

[১১]** যেহেতু আমরা বিচার-বিবেচনা করছি জার্মানদের নিয়ে, যারা সিদ্ধান্তসূত্রবিহীন, তাই আমাদের শুরু করতে হচ্ছে মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের এবং কাজেই সমগ্র ইতিহাসের প্রথম সিদ্ধান্তসূত্রটা বিবৃত ক'রে, সেই সিদ্ধান্তসূত্রটা হল এই যে, 'ইতিহাস সৃষ্টি করতে'*** সমর্থ হতে হলে মানুষকে বেঁচে থাকার মতো অবস্থায় থাকা চাই। কিন্তু বেঁচে থাকা বলতে বোঝায় অন্য সবকিছুর আগে খাওয়া আর পান করা, বাসস্থান, কাপড়চোপড় এবং আরও অনেক কিছু।**** এইভাবে, প্রথম ঐতিহাসিক কৃতি হল এইসব চাহিদা মেটাবার উপকরণগুলি উৎপাদন, খাস বৈষয়িক জীবনেরই উৎপাদন। আর বাস্তবিকই এটা একটা ঐতিহাসিক কৃতি, সমগ্র ইতিহাসের জন্যে আবশ্যক একটা বুনিয়াদী শর্ত, যা হাজার হাজার বছর আগেকার মতো আজও

---

* [নিম্নলিখিত রচনাংশটা পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] তবু আমরা এখানে আরও বিস্তারিতভাবে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি তার কারণ এই যে, 'ইতিহাস' আর 'ঐতিহাসিক' এই শব্দ-দুটো জার্মানদের কাছে সাধারণত বাস্তবতা ছাড়া সম্ভাব্য সবকিছুই বোঝায়, এর একটা দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত হল বিশেষত তার 'প্রচারবেদীর বাকপটুতা' নিয়ে সেন্ট ব্রুনো।

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] **ইতিহাস।**

*** তু. এই খণ্ডের ৫৪ পৃঃ। — সম্পাঃ

**** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] **হেগেল** (১১)। ভূতাত্ত্বিক, জলভাগ-সংক্রান্ত, ইত্যাদি পরিবেশ। মানব-দেহ। চাহিদা এবং শ্রম।

প্রতিদিন প্রতি-ঘণ্টায় পূরণ হওয়া চাই শুধু মানুষের জীবন বজায় রাখার জন্যে। ইন্দ্রিয়গম্য জগৎটাকে এমনকি যখন লঘিষ্ঠ মাত্রায়, যেমন সেন্ট ব্রুনোর বেলায়, একখানা যষ্টিতে পরিণত করা হয় (১২), তখনও যষ্টিখানা উৎপন্ন করার কৃতি সেটার পূর্বশর্ত। কাজেই, ইতিহাসের যেকোন ব্যাখ্যায় সর্বপ্রথমে এই বুনিয়াদী সত্যটাকে তার সমগ্র তাৎপর্য এবং তার সমগ্র ভাবার্থের মাঝে লক্ষ্য করা এবং সেটাকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া চাই। এটা সুবিদিত যে, জার্মানরা কখনও এটা করে নি, কাজেই ইতিহাসের জন্যে কোন পার্থিব ভিত্তি তাদের ছিল না কখনও, ফলস্বরূপে তাদের কখনও ছিল না কোন ইতিহাসকার। ফরাসীরা আর ইংরেজরা বিশেষত যতকাল রাজনীতিক ভাবাদর্শের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তথাকথিত ইতিহাসের সঙ্গে এই অবস্থাটার সম্পর্কটাকে শুধু অতি একপেশেভাবে ধারণা করলেও, তা সত্ত্বেও নাগরিক সমাজের, বাণিজ্য আর শিল্পের ইতিহাস প্রথমে লিখে সেইভাবে ইতিহাস-লিখনকে বস্তুবাদী ভিত্তি দেবার প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছে তারাই।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়টা হল এই [১২] যে, প্রথম চাহিদাটা মেটান থেকে (মেটাবার কার্যকরণটা এবং মেটাবার হাতিয়ারটা যা আয়ত্ত হয়েছে) এসে পড়ে নতুন নতুন চাহিদা; আর এই নতুন নতুন চাহিদার উৎপাদনটা হল প্রথম ঐতিহাসিক কৃতি। এখানে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারি জার্মানদের মস্ত ঐতিহাসিক বিজ্ঞতার আধ্যাত্মিক কুলপরিচয়, যে-জার্মানরা যখন তাদের প্রয়োগজ মালমশলা ফুরিয়ে যায় এবং যখন তারা কি ব্রহ্মবিদ্যাগত, কি রাজনীতিক, কি সাহিত্যঘটিত কোন রাবিশই পরিবেশন করতে পারে না, তখন তারা দৃঢ়োক্তি করে যে, এটা আদৌ ইতিহাস নয়, এটা 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ'। এই অর্থহীন 'প্রাক্‌ইতিহাস' থেকে এগিয়ে খাস ইতিহাসে যেতে হবে কেমন করে, সে-বিষয়ে তারা কিন্তু আমাদের জ্ঞানালোকিত করে না; যদিও, অন্যদিকে, তাদের ইতিহাসঘটিত দূরকল্পনায় তারা এই 'প্রাক্‌ইতিহাস'টাকে আঁকড়ে ধরে সবিশেষ আগ্রহসহকারে, তার কারণ সেখানে তারা 'স্থূল তথ্যগুলোর' দিক থেকে হস্তক্ষেপ থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কারণ এই যে, সেখানে তারা তাদের দূরকল্পী আবেগের রাশ একেবারেই ঢিলা করে দিয়ে প্রকল্প গড়তে আর ভাঙতে পারে হাজারে-হাজারে।

তৃতীয় পরিস্থিতি, যা একেবারে শুরু থেকেই ঐতিহাসিক বিকাশের একটা অঙ্গ-উপাদান, সেটা হল এই যে, মানুষ, যারা নিজেদের জীবন নতুন করে গড়ে প্রতিদিন, তারা অন্যান্য মানুষ পয়দা করতে, নিজেদের বংশবিস্তার করতে শুরু করে: পুরুষ আর নারীর মধ্যে সম্পর্ক, মাতাপিতা আর সন্তানসন্ততি, **পরিবার**। শুরুতে যা একমাত্র সামাজিক সম্পর্ক সেই পরিবার পরে, যখন বর্ধিত চাহিদাগুলো নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে, আর বর্ধিত জনসংখ্যা সৃষ্টি করে নতুন নতুন চাহিদা, হয়ে দাঁড়ায় একটা অধস্তন সম্পর্ক (জার্মানিতে ছাড়া), তখন সেটাকে নিয়ে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা আবশ্যক বিদ্যমান প্রয়োগজ উপাত্ত অনুসারে, জার্মানিতে যা রীতি সেইভাবে 'পরিবার সংক্রান্ত ধারণা' অনুসারে নয়। সামাজিক কর্মবৃত্তির এই তিনটে দিককে অবশ্য তিনটে পৃথক পর্ব হিসেবে ধরা চলবে না, ধরতে হবে শুধু তিনটে দিক হিসেবেই কিংবা, জার্মানদের কাছে স্পষ্ট করে বলতে, 'অঙ্গ-উপাদান' তিনটে হিসেবে, যেগুলি ইতিহাস আর প্রথম প্রথম মনুষ্যগণের আরম্ভ থেকে যুগপৎ বিদ্যমান এবং অদ্যাবধি ইতিহাসে বলবৎ।

শ্রমের মাঝে কারও নিজ জীবন এবং জননক্রিয়ায় নতুন জীবন উভয়ত নতুন জীবনের উৎপাদন এখন প্রতীয়মান হয় দ্বিবিধ [১৩] সম্পর্ক হিসেবে: একদিকে স্বাভাবিক, অন্যদিকে সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে। সামাজিক বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন ব্যক্তি-মনুষ্যগণের সহযোগ, সেটা কোন্ পরিবেশে, কোন্ ধরনে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে, তাতে কিছু এসে যায় না। এর থেকে এটা আসে যে, কোন একটা উৎপাদন-প্রণালী কিংবা শিল্প-পর্ব সবসময়েই কোন একটা সহযোগ-প্রণালী কিংবা সামাজিক পর্বের সঙ্গে সংযুক্ত, আর এই সহযোগ-প্রণালীটা নিজেই একটা 'উৎপাদন-শক্তি'। অধিকন্তু, মানুষের প্রাপ্তিসাধ্য উৎপাদন-শক্তিসমূহের সাকল্য যে সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করে, তার থেকে এটা আসে যে, 'মানবজাতির ইতিহাস' নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ আর আলোচনা সবসময়ে করতে হবে শিল্প আর বিনিময়ের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে। কিন্তু জার্মানিতে এইরকমের ইতিহাস লেখা কিভাবে অসম্ভব সেটাও স্পষ্ট, তার কারণ আবশ্যক উপলব্ধির ক্ষমতা আর মালমশলারই শুধু নয়, 'তাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের নিদর্শনের'ও ঊনতা আছে জার্মানদের, কেননা রাইন্

নদীর পারে এইসব ব্যাপারের কোন অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় না যেহেতু ইতিহাসের ঘটন থেমে গেছে। এইভাবে শুরু থেকেই এটা একেবারেই স্পষ্টপ্রতীয়মান যে, মনুষ্যগণের পরস্পরের মধ্যে একটা বৈষয়িক সংযোগ আছে, যেটা নির্ধারিত হয় তাদের চাহিদাগুলো আর উৎপাদন-প্রণালী দিয়ে, এবং যেটা মানুষের নিজেদেরই সমান প্রাচীন। এই সংযোগটা ক্রমাগত নতুন নতুন রূপ ধরছে, আর এইভাবে সেটা কোন রাজনীতিক কিংবা ধর্মীয় প্রলাপ থেকে স্বতন্ত্রভাবে হাজির করে একটা 'ইতিহাস', যা বিশেষত একত্র করে রাখতে পারে মনুষ্যগণকে।

শুধু এখন, প্রাথমিক ঐতিহাসিক সম্পর্কের চারটে অঙ্গ-উপাদান, চারটে দিক নিয়ে বিবেচনা করার পরে আমরা দেখতে পাই মানুষের আছে 'চেতনা'ও*; কিন্তু যদিও সেটা নয় অধিষ্ঠিত, 'বিশুদ্ধ' চেতনা। শুরু থেকেই 'সত্ত্ব' ('spirit') ক্লিষ্ট [১৪] বস্তুর 'ভারাক্রান্ত' হবার অভিশাপ দিয়ে — বস্তু এখানে দেখা দেয় বিভিন্ন আলোড়িত বায়ু-স্তর, বিভিন্ন শব্দ রূপে, এককথায় ভাষা রূপে। ভাষা চেতনার সমান প্রাচীন, ভাষা **হল** ব্যবহারিক চেতনা, যেটা থাকে অন্যান্য মানুষের জন্যেও, আর শুধু সেই কারণেই এটা যথার্থই থাকে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্যেও; চেতনার মতো ভাষাও দেখা দেয় শুধু অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সংসর্গের চাহিদা, আবশ্যকতা থেকে।** যেখানে একটা সম্পর্ক বিদ্যমান, সেটা বিদ্যমান আমার জন্যে: প্রাণী কোনকিছুর সঙ্গে **'সম্পর্ক'** স্থাপন করে না, প্রাণী আদৌ কোন সম্পর্কই স্থাপন করে না। অন্যান্যের সঙ্গে প্রাণীর সম্পর্ক প্রাণীর পক্ষে সম্পর্ক হিসেবে থাকে না। কাজেই, একেবারে শুরু থেকেই চেতনা একটা সামাজিক উৎপাদ, আর তেমনই সেটা থেকে যায় যতকাল মানুষের অস্তিত্ব থাকে আদৌ। চেতনা অবশ্য প্রথমে নিছক **অব্যবহিত** ইন্দ্রিয়গম্য প্রতিবেশ সংক্রান্ত চেতনা এবং যে-ব্যক্তি-মানুষ আত্মসচেতন হয়ে

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] মানুষের ইতিহাস আছে তার কারণ তাদের জীবন তাদের **উৎপন্ন করা** চাই, আর কারণ এই যে, অধিকন্তু সেটা তাদের উৎপাদন করতে হয় **কোন-একটা ধরনে:** এটা নির্ধারিত হয় ভৌত সংগঠন দিয়ে, তাদের চেতনা নির্ধারিত হয় ঠিক ঐ একই ধরনে।

** [নিম্নলিখিত রচনাংশটা পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] আমার প্রতিবেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হল আমার চেতনা।

উঠছে তার বাইরেকার অন্যান্য ব্যক্তি আর বস্তুসমূহের সঙ্গে সীমাবদ্ধ সংযোগ সম্বন্ধে চেতনা। তার সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রকৃতি সম্বন্ধে চেতনা, যে প্রকৃতি মানুষের কাছে প্রথমে প্রতীয়মান হয় সম্পূর্ণভাবে পরক, সর্বশক্তিমান এবং অনাক্রম্য একটা শক্তি হিসেবে, যেটার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল একেবারেই পাশব, আর যেটা মানুষকে জন্তুর মতো ভয়ে অভিভূত করে; এইভাবে এটা হল প্রকৃতি সম্বন্ধে নিছক পাশব চেতনা (প্রকৃতি-ধর্ম)।

এখানে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাই: এই প্রকৃতি-ধর্ম বা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই বিশেষ সম্পর্ক নির্ধারিত হয় সমাজের আকার দিয়ে, আর তেমনি পালটাভাবে। যেমন সর্বত্র তেমনি এক্ষেত্রে প্রকৃতি আর মানুষের পরিচয় এমনভাবে প্রতীয়মান হয় যাতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সীমাবদ্ধ সম্পর্ক তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্কটাকে নির্ধারণ করে, আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্পর্ক নির্ধারণ করে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সীমাবদ্ধ সম্পর্কটাকে, সেটা ঠিক এই কারণে যে, প্রকৃতি তখনও ইতিহাসক্রমে বড় একটা পরিবর্তিত নয়; আর অন্যদিকে, চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তি-মনুষ্যগণের সঙ্গে মেলামেশা করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মানুষের চেতনা হল সে যে আদৌ সমাজে বাস করে সে-সম্বন্ধে তার চেতনার সূত্রপাত। এই পর্বে সামাজিক জীবন নিজেই যেমন তেমনই পাশব এই সূত্রপাতটা। এটা নিছক যূথ-চেতনা, আর এই সন্ধিক্ষণে ভেড়া থেকে মানুষকে আলাদা করে চেনা যায় শুধু এটা দিয়ে যে, মানুষের বেলায় চেতনা আসে সহজপ্রবৃত্তির জায়গায় কিংবা তার সহজপ্রবৃত্তিটা সচেতন। ভেড়ার ধরনের বা গোষ্ঠীগত চেতনার আরও বিকাশ এবং প্রসার ঘটে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা আর বর্ধিত চাহিদার ভিতর দিয়ে এবং এই দুইয়েরই বেলায় যা বুনিয়াদী [১৫] সেই জনসংখ্যাবৃদ্ধির ভিতর দিয়ে। এগুলির সঙ্গে ক্রমে গড়ে বেড়ে ওঠে শ্রমবিভাগ, যেটা গোড়ায় ছিল রতিক্রিয়ার শ্রমবিভাগ ছাড়া কিছু নয়, আর পরে হয়েছিল সেই শ্রমবিভাগ যা স্বাভাবিক অনুকূল অবস্থা (যেমন শারীরিক শক্তি), বিভিন্ন চাহিদা, আকস্মিক ঘটনা, ইত্যাদির দরুন গড়ে বেড়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা 'স্বভাবত'। ভৌত আর মানসিক শ্রমের মধ্যে বিভাগ যখন দেখা দেয় সেই ক্ষণ থেকে শ্রমবিভাগ হয়ে

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] ভাবাদর্শবিদদের, যাজকদের প্রথম ধরনটা এই একই কালের সংঘটন।

ওঠে সত্যিকারের শ্রমবিভাগ।* তখন থেকে চেতনা যথার্থই এই আত্মপ্রসাদ লাভ করতে **পারে** যে, সেটা বিদ্যমান চলিতকর্ম সম্বন্ধে চেতনা ছাড়া অন্যকিছু, সেটা বাস্তব কিছুর স্থানাপন্ন না হয়েও **বাস্তবিকই** একটাকিছুর স্থানাপন্ন হচ্ছে; তখন থেকে চেতনা এমন অবস্থায় আসে যাতে সেটা নিজেকে বহির্জগৎ থেকে মুক্ত করে নিয়ে 'বিশুদ্ধ' তত্ত্ব, ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন, নীতিবিদ্যা, ইত্যাদি গড়তে এগোতে পারে। কিন্তু এমনকি এই তত্ত্ব, ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন, নীতিবিদ্যা, ইত্যাদিরও বিরোধ বাধে বিদ্যমান সম্পর্কগুলির সঙ্গে, এটা ঘটতে পারে কেবল এই কারণে যে, বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কগুলো বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়; অধিকন্তু এটা ঘটতে পারে সম্পর্কসমূহের কোন নির্দিষ্ট জাতীয় ক্ষেত্রেও, সেটা দ্বন্দ্ব দেখা দেবার ফলে, সে-দ্বন্দ্ব জাতীয় চৌহদ্দির ভিতরে নয়, সে-দ্বন্দ্ব এই জাতীয় চেতনা এবং অন্যান্য জাতির চলিতকর্মের মধ্যে,* অর্থাৎ কোন একটা জাতির জাতীয় এবং সাধারণ চেতনার মধ্যে (যেমনটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি জার্মানিতে); কিন্তু যেহেতু মনে হয় এই দ্বন্দ্বটা রয়েছে শুধু জাতীয় চেতনার ভিতরকার একটা দ্বন্দ্ব হিসেবে, তাই তখন এই জাতির মনে হয় সংগ্রামটাও এই জাতীয় ময়লাতেই গণ্ডিবদ্ধ।

[১৬] তাছাড়া, চেতনা নিজে-নিজেই কী করতে শুরু করে সেটা একেবারেই অকিঞ্চিৎ: এইরকমের সমস্ত ময়লার মধ্য থেকে আমরা শুধু এই একটা অনুমানই করতে পারি যে, উৎপাদন-শক্তি, সমাজের হাল আর চেতনা, এই তিনটে অঙ্গ-উপাদানের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধতে পারে এবং বাধবেই, কেননা **শ্রমবিভাগ** বলতে মানসিক আর বৈষয়িক সক্রিয়তা** ভোগসুখ আর শ্রম, উৎপাদন আর পরিভোগ — বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষের উপর বর্তাবার সম্ভাবনা বোঝায়, কেবল সম্ভাবনাই নয়, বোঝায় সেই ঘটনাটাই; আরও এটা বোঝায় যে, শ্রমবিভাগ যদি বাতিল হয়ে যায়, একমাত্র সেক্ষেত্রেই সেগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব না-বাধার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু, এটা তো স্বতঃপ্রতীয়মান যে, বিভিন্ন 'অপচ্ছায়া', 'বন্ধন', 'উন্নততর সত্তা', 'ধারণা', 'বিবেকের তাড়না' হল

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] **ধর্ম**। জার্মানরা এবং আপনাতে **ভাবাদর্শ**।

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা, যা কেটে দেওয়া হয়েছে:] কর্মবৃত্তি আর চিন্তন, অর্থাৎ চিন্তাবর্জিত কর্মবৃত্তি এবং নিষ্ক্রিয় চিন্তন।

স্পষ্টতই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানুষের নিছক ভাববাদী, আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি, অতিশয় প্রয়োগজ বন্ধন আর সীমাবদ্ধতার ভাবমূর্তি, যার ভিতরে চলে জীবন উৎপাদনের প্রণালী এবং সেটার সঙ্গে সংযুক্ত সংসর্গের ধরন।

[৪। সামাজিক শ্রমবিভাগ এবং সেটার পরিণতি: ব্যক্তিগত মালিকানা, রাষ্ট্র, সামাজিক কর্মবৃত্তির 'পরকীকরণ']

শ্রমবিভাগে অন্তর্নিহিত থাকে এই সমস্ত দ্বন্দ্ব, শ্রমবিভাগের আবার ভিত্তি হল পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রমবিভাগ এবং পরস্পরের বিরুদ্ধ পৃথক পৃথক পরিবার দিয়ে সমাজের বিভাগ — এই শ্রমবিভাগের সঙ্গে যুগপৎ থাকে শ্রম আর শ্রমফলের **বণ্টন**, বাস্তবিকপক্ষে সেটা গুণ আর পরিমাণ উভয়ত **অসম** বণ্টন, তার থেকে মালিকানা: [১৭] কেন্দ্রী উপাদানটা, যেটার প্রথম আকারটা থাকে পরিবারে, যেখানে স্ত্রী আর সন্তানসন্ততি হল স্বামীর দাস-দাসী। পরিবারে অন্তর্নিহিত দাসপ্রথাটা তখনও খুবই কাঁচা ধরনের হলেও, সেটাই প্রথম মালিকানা, কিন্তু এমনকি এই গোড়ার পর্বেও সেটা আধুনিক অর্থনীতিবিদদের সংজ্ঞার্থের সঙ্গে ঠিকভাবে মেলে, তাঁরা এটাকে বলেন অন্যান্যের শ্রমশক্তির বিলিবন্দেজ করার ক্ষমতা। তাছাড়া, শ্রমবিভাগ আর ব্যক্তিগত মালিকানা হল একই কথা: একটাতে কর্মবৃত্তি প্রসঙ্গে সেই একই জিনিস স্পষ্টবিবৃত হয়, যা অন্যটাতে স্পষ্টবিবৃত হয় কর্মবৃত্তির উৎপাদ প্রসঙ্গে।

তারপরে, শ্রমবিভাগ বলতে বোঝায় আলাদা আলাদা ব্যক্তি কিংবা পৃথক পৃথক পরিবারের স্বার্থ এবং যাদের পরস্পরের মধ্যে সংসর্গ থাকে সেই সমস্ত ব্যক্তির সম্প্রদায়গত স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব। বাস্তবিকপক্ষে এই সাধারণ স্বার্থের অস্তিত্ব 'সাধারণী স্বার্থ' হিসেবে নিছক কল্পনায় নয়, যাদের মধ্যে শ্রম বিভক্ত হয় সেইসব ব্যক্তি-মানুষের পারস্পরিক নির্ভর হিসেবে সর্বপ্রথমে বাস্তবে।

ব্যক্তি-মানুষ আর সম্প্রদায়ের স্বার্থের মধ্যকার ঠিক এই দ্বন্দ্ব থেকেই সম্প্রদায়টা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে **রাষ্ট্র** হিসেবে, যেটা ব্যক্তি-মানুষ আর সম্প্রদায়ের আসল স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন, আর যেমন রাষ্ট্র হিসেবে, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিভ্রান্তিকর সাধারণী জীবন হিসেবে, তবু সবসময়েই সেটার ভিত্তি হল প্রত্যেকটা পরিবারে আর গোষ্ঠীগত সমবায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন বন্ধন — যেমন, জ্ঞাতিত্ব, ভাষা, বৃহত্তর পরিসরে শ্রমবিভাগ এবং অন্যান্য স্বার্থ, আর, যা আমরা পরে বিশদ করে দেখাব, সেটার ভিত্তি হল বিশেষত বিভিন্ন শ্রেণী, যা ইতঃপূর্বে শ্রেণীবিভাগ দিয়ে নির্ধারিত হয়ে যায়, এমন প্রত্যেকটা জনরাশিতে এইসব শ্রেণী পৃথক হয়ে যায়, এবং সেগুলোর মধ্যে একটা অন্য সবগুলোর উপর আধিপত্য করে। এর ফলস্বরূপ এটা আসে যে, রাষ্ট্রের ভিতরে সমস্ত সংগ্রাম — গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র আর রাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম, ভোটাধিকারের জন্যে সংগ্রাম, ইত্যাদি, ইত্যাদি — হল বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পরের মধ্যে নিষ্পত্তি অবধি যেসব আসল সংগ্রাম চালায় সেগুলোর নিছক বিভ্রান্তিকর আকার (এ সম্বন্ধে জর্মান তত্ত্ববিদদের ক্ষীণতম ধারণাও নেই, যদিও 'Deutsch-Französische Jahrbücher' (১৩) এবং 'Die heilige Familie'-তে তাঁরা এ বিষয়ে যথেষ্ট পূর্বাভাস পেয়েছেন)। এর ফলস্বরূপ আরও আসে এটা: কর্তৃত্বের জন্যে সংগ্রামরত প্রত্যেকটা শ্রেণীকে সর্বপ্রথমে রাজনীতিক ক্ষমতা জয় করা চাই, সেটা তার বেলায় নিজ স্বার্থটাকে সাধারণী স্বার্থ হিসেবে প্রকাশ করার জন্যে, যা সেটা প্রথম ক্ষণে করতে বাধ্য হয়, এই ব্যাপারটা এমনকি সেক্ষেত্রেও ঘটে যখন শ্রেণীটার আধিপত্যের জন্যে — যেমনটা প্রলেতারিয়েতের বেলায় — সমগ্র পুরন আকারের সমাজটার এবং খাস আধিপত্যেরই লুপ্তি আবশ্যক হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষ **শুধু** তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করতে চেষ্টা করে, সেটা তাদের দিক থেকে তাদের সম্প্রদায়গত স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায় না (প্রকৃতপক্ষে সাধারণটা হল সম্প্রদায়গত জীবনের বিভ্রান্তিকর আকার), ঠিক এই কারণে সম্প্রদায়গত স্বার্থটা তাদের উপর চেপে বসবে তাদের পক্ষে 'পরক' এবং তাদের থেকে [১৮] 'স্বতন্ত্র' একটা স্বার্থ হিসেবে, সেটার বেলায় আবার একটা নির্দিষ্ট, বিশেষ ধরনের 'সাধারণী' স্বার্থ হিসেবে; কিংবা তাদের নিজেদের থেকে যেতে হবে এই বৈসাদৃশ্যের ভিতরে, যেমনটা হয় গণতন্ত্রে।

তেমনি অন্যদিকেও, এই যেসব বিশেষ ধরনের স্বার্থ **বাস্তবিকই** সর্বক্ষণ চলে সম্প্রদায়গত এবং বিভ্রান্তিকর সম্প্রদায়গত স্বার্থের বিরুদ্ধে, এগুলোর **কার্যগত** সংগ্রামের ফলে রাষ্ট্রের আকারে বিভ্রান্তিকর 'সাধারণী' স্বার্থের মাধ্যমে **কার্যগত** হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয়ে ওঠে।*

[১৭] শেষে, মানুষ যতক্ষণ থাকে স্বাভাবিক সমাজে, অর্থাৎ বিশেষ আর সাধারণী স্বার্থের মধ্যে একটা ফাট যতক্ষণ থাকে, কাজেই যতক্ষণ কর্মবৃত্তি বিভক্ত থাকে ঐচ্ছিকভাবে নয়, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে, ততক্ষণ মানুষের নিজ কৃতি কিভাবে হয়ে ওঠে তার বিরুদ্ধ একটা পরক শক্তি, যেটা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার বদলে তাকে দাসে পরিণত করে, তার প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা পাই শ্রমবিভাগ। কেননা যেইমাত্র শ্রমের বণ্টন হয়ে যায়, অমনি প্রত্যেকটি মানুষের থাকে কর্মবৃত্তির একটা বিশেষ ধরনের একক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, যেটা তার উপর জোর করে চেপে বসে, যেটাকে সে এড়াতে পারে না। সে হতে পারে শিকারী, জেলে, মেষপালক কিংবা বৈচারিক সমালোচক, তাইই তার থেকে যেতে হবে, নইলে তার জীবিকানির্বাহের উপায় খোয়া যাবে; কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজে কারও কর্মবৃত্তির কোন একটামাত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্র থাকবে না, সেখানে প্রত্যেকে ইচ্ছামতো যেকোন শাখায় কুশলী হয়ে উঠতে পারবে, সমাজ সাধারণ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে, আমার পক্ষে আজ একটা এবং আগামী কাল অন্য একটা কিছু করা, সকালে শিকার করা, বিকেলে মাছধরা, সন্ধ্যায় পশুপালন করা, ডিনারের পরে সমালোচনা করা সম্ভব করে তোলে, ঠিক যেমনটা আমার মন চায়, তাতে আমার কখনও শিকারী, মেছুয়া, মেষপালক কিংবা সমালোচক হয়ে পড়া আবশ্যক নয়।

[১৮] সামাজিক কর্মবৃত্তির এই বাঁধাবাঁধি ঘটে, আমরা নিজেরাই যা উৎপন্ন করি সেটা আমাদের উপরে অবস্থিত একটা বাস্তব শক্তি রূপে সংহত হয়ে দাঁড়ায়, সেটা চলে যায় আমাদের আয়ত্তের বাইরে, আমাদের প্রত্যাশা ব্যাহত করে, আমাদের পরিকল্পন ব্যর্থ করে দেয়, সেটা হল এখন পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিকাশের একটা মুখ্য উপাদান। শ্রমবিভাগ দিয়ে যেভাবে নির্ধারিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষের সহযোগ, সেই সহযোগের ফলে উদ্ভূত

* এই দুটো অনুচ্ছেদ এঙ্গেলস ঢুকিয়েছেন মার্জিনে। — সম্পাঃ

সামাজিক ক্ষমতা, অর্থাৎ বহুলীকৃত উৎপাদন-শক্তি এইসব ব্যক্তি-মানুষের কাছে প্রতীয়মান হয় তাদের নিজেদের সম্মিলিত ক্ষমতা হিসেবে নয় — যেহেতু তাদের সহযোগ ঐচ্ছিক নয়, সেটা ঘটে স্বাভাবিকভাবে — সেটা প্রতীয়মান হয় তাদের বহিস্থ একটা পরক শক্তি হিসেবে, সেটার উৎপত্তি আর গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে তারা কিছু জানে না, তাই সেটাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বরং তার উলটো — সেটা চলে মানুষের ইচ্ছা আর কার্যকরণ থেকে স্বতন্ত্র বিশেষ ধরনের একগুচ্ছ ধাপ আর পর্বের ভিতর দিয়ে, না, শুধু তাই নয়, সেটা এমনকি হয়ে ওঠে এইসব ইচ্ছা আর কার্যকরণের মুখ্য নিয়ামক!* নইলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, মালিকানার আদৌ কোন ইতিহাস থাকতে পারত কিভাবে, মালিকানার বিভিন্ন আকার আসতে পারত কিভাবে? নইলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভূমি-সম্পত্তি কিভাবে, বিবৃত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসূত্র অনুসারে, ফ্রান্সে অংশন থেকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীকরণে পরিণত হতে পারত, আর কিভাবেই-বা সেটা ইংলন্ডে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীকরণ থেকে অংশনে পরিণত হতে পারত, যেমনটা এখন প্রকৃতপক্ষে রয়েছে? যা-ই হোক, বাণিজ্য তো বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষ এবং বিভিন্ন দেশের জাতদ্রব্যের বিনিময়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়, সেই বাণিজ্য সারা পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করে যোগান আর চাহিদার সম্পর্ক দিয়ে, এমনটাই-বা ঘটে কেমন করে? — একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ বলেছেন, এই সম্পর্কটা পৃথিবীর উপর ভেসে চলছে প্রাচীনকালের মনুষ্যগণের নিয়তির মতো, এই সম্পর্ক সেটার অদৃশ্য হাত দিয়ে মানুষের বরাতে বরাদ্দ করে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য, বিভিন্ন সাম্রাজ্য স্থাপন করে [১৯] এবং উলটে ফেলে দেয় বিভিন্ন সাম্রাজ্য, ঘটায় বিভিন্ন জাতির উদ্ভব আর বিলোপ — যদিও ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তি লোপ করা হলে, উৎপাদনের কমিউনিস্ট ধাঁচের নিয়মন চালু হলে (এতে অন্তর্নিহিত থাকে মানুষ এবং তারা নিজেরা যা উৎপন্ন করে সেগুলোর

---

* এই অনুচ্ছেদটার ঠিক পরেই যে-বিভাগটা সেটার প্রথম দুটো অনুচ্ছেদ হিসেবে এই খণ্ডে যে বয়ান ছাপা হল সেটা মার্কস মার্জিনে লিখেছিলেন এই রচনাংশটার জন্যে। — সম্পাঃ

মধ্যকার পরক সম্পর্কের লুপ্তি) যোগান আর চাহিদার সম্পর্কের ক্ষমতাটা কিছু-নাতে পর্যবসিত হয়, তখন মানুষ বিনিময়, উৎপাদন, তাদের পরস্পর সম্পর্কের প্রণালীটাকে আবার পায় নিজেদের আয়ত্তে।

[৫। কমিউনিজমের একটা বৈষয়িক পত্তন হিসেবে উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ]

[১৮] দুটো **কার্যগত** পত্তন থাকলে, অবশ্য একমাত্র তবেই লোপ করা যেতে পারে এই **'পরকীকরণটাকে'** (দার্শনিকদের কাছে যা বোধগম্য হবে এমন একটা পদ ব্যবহার করা হল)। এটা তখনই হয়ে ওঠে একটা 'অসহনীয়' ক্ষমতা, অর্থাৎ যে-ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষ বিপ্লব করে, যখন সেটা অনিবার্যভাবেই মানবজাতির বিপুল ভাগকে 'নাস্তিমান' করে ফেলে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পয়দা করে ধনদৌলত আর সংস্কৃতির বিদ্যমান জগতের দ্বন্দ্ব-বিরোধ, এই উভয় পরিবেশের জন্যে পূর্বশর্ত হল উৎপাদন-ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি, উচ্চ মাত্রায় সেটার বিকাশ। আর অন্যদিকে, উৎপাদন-শক্তিসমূহের এই বিকাশ (যেটা আপনাতে বোঝায় মানুষের স্থানীয় সত্তা নয়, তার জায়গায় **বিশ্ব-ঐতিহাসিক** সত্তা হিসেবে মানুষের বাস্তবিক প্রায়োগিক অস্তিত্ব) হল একেবারেই অপরিহার্য একটা কার্যগত পত্তন, তার কারণ এটা না থাকলে **অভাব** শুধু হয়ে ওঠে সার্ব, আর **নিঃস্বতার দশার** সঙ্গে অনিবার্যভাবেই নতুন করে পয়দা হত জীবনীয়ের জন্যে সংগ্রাম এবং অন্যান্য যাবতীয় পুরন নোংরা ব্যাপার; আরও কারণ হল এই যে, উৎপাদন-শক্তিসমূহের কেবল এই বিশ্বজনীন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষে-মানুষে **বিশ্বজনীন** সংসর্গ স্থাপিত হয়, যেটা সমস্ত জাতির মধ্যে যুগপৎ পয়দা করে 'নাস্তিমান' জনরাশির ব্যাপারটা (বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতা), প্রত্যেকটা জাতিকে নির্ভরশীল করে তোলে অন্যান্য জাতির বিভিন্ন বিপ্লবের উপর, আর শেষপর্যন্ত স্থানীয় ব্যক্তি-মনুষ্যগণের জায়গায় স্থাপন করেছে **বিশ্ব-ঐতিহাসিক**, প্রায়োগিকভাবে বিশ্বজনীন ব্যক্তি-মনুষ্যগণকে। এটা না হলে, (১) কমিউনিজমের অস্তিত্ব হতে পারত কেবল স্থানীয় ঘটন হিসেবে, (২) সংসর্গের **শক্তিগুলো** নিজেরাই

হয়ে উঠতে পারত না **বিশ্বজনীন** ক্ষমতা, কাজেই অসহনীয় ক্ষমতা : কুসংস্কারে ঘেরা দেশী পরিবেশ হয়েই থেকে যেত সেগুলো; আর (৩) সংসর্গের প্রত্যেকটা প্রসার স্থানীয় কমিউনিজমকে লোপ করত। প্রায়োগিক ধরনে দেখলে, কমিউনিজম সম্ভব একমাত্র সমস্ত প্রাধান্যশালী জাতির 'সহসা' এবং যুগপৎ (১৪) কৃতি হিসেবে, যাতে ধরেই নিতে হয় যে, উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিশ্বজনীন বিকাশ এবং কমিউনিজমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট পৃথিবীব্যাপী সংসর্গ ঘটে গেছে আগেই।*

[১৯] অধিকন্তু, **নাস্তিমান** শ্রমিক জনরাশি — শ্রমশক্তির ব্যাপক পরিসরে চূড়ান্ত অনিশ্চিত অবস্থা, যে-শ্রমশক্তি পুঁজি থেকে কিংবা এমনকি সীমাবদ্ধ চাহিদা মেটান থেকেও বিচ্ছিন্ন, কাজেই জীবনের নিশ্চিত উৎস হিসেবে একেবারে কাজ থেকেই সাময়িকভাবে বঞ্চিতই শুধু নয় — বলতে বোঝায় প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে **বিশ্ব-বাজার** গড়ে ওঠে ইতঃপূর্বে। এইভাবে, ঠিক কমিউনিজমেরই মতো প্রলেতারিয়ানের অস্তিত্ব কেবল **বিশ্ব-ঐতিহাসিক**, প্রলেতারিয়ানের কর্মবৃত্তির অস্তিত্ব হতে পারে কেবল 'বিশ্ব-ঐতিহাসিক'। ব্যক্তি-মনুষ্যগণের বিশ্ব-ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, অর্থাৎ ব্যক্তি-মনুষ্যগণের যে-অস্তিত্ব বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট।

[১৮] আমাদের পক্ষে, কমিউনিজম নয় এমন একটা **পরিস্থিতি-হাল** যা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কমিউনিজম নয় এমন একটা **আদর্শ** যেটার সঙ্গে বাস্তবতাকে মানিয়ে নিতে হবে। কমিউনিজমকে আমরা বলি **আসল** আন্দোলন যা বর্তমান পরিস্থিতি-হালটাকে লোপ করে। এখন বিদ্যমান বিভিন্ন পত্তনের ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয় এই আন্দোলনের পরিবেশ।**

* * *

[১৯] পূর্ববর্তী সমস্ত ঐতিহাসিক পর্বে বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তি-সমূহের দ্বারা নির্ধারিত রূপের সংসর্গ, যেটা আবার উৎপাদন-শক্তিসমূহকে

---

* [বয়ানটা প্রসারিত করে পাণ্ডুলিপির পরবর্তী পৃষ্ঠার মাথায় মার্কসের মন্তব্য:] **কমিউনিজম।**

** পাণ্ডুলিপিতে মার্কস এই অনুচ্ছেদটাকে ঢুকিয়েছেন এই বিভাগের প্রথম অনুচ্ছেদের উপরে। — সম্পাঃ

নির্ধারণ করে, সেটা হল **নাগরিক সমাজ।** উপরে আমরা যা বলেছি তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, নাগরিক সমাজের পত্তন আর ভিত্তি হল অযৌগিক পরিবার এবং যৌগিক সংগঠন, যেটাকে বলা হয় গোষ্ঠী; এই সমাজের অপেক্ষাকৃত যথাযথ নির্ধারকগুলিকে উল্লিখিত মন্তব্যে বিবৃত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এখানে আমরা দেখতে পাই কিভাবে এই নাগরিক সমাজ হল সমস্ত ইতিহাসের আসল উৎস আর রঙ্গভূমি, আর ইতিহাস সম্বন্ধে এযাবত পোষিত ধারণা কতখানি আজগবি, সেই ধারণায় যথার্থ সম্পর্কগুলিকে অবহেলা করা হয়, সেই ধারণা গণ্ডিবদ্ধ থাকে রাজ-রাজড়া আর বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্বন্ধে বাগাড়ম্বরপূর্ণ চমকপ্রদ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে।

এযাবত আমরা বিচার-বিবেচনা করেছি মানুষের কর্মবৃত্তির প্রধানত কেবল একটা দিক নিয়ে, সেটা হল মানুষের দ্বারা **প্রকৃতির নতুন আকার দেবার দিকটা।** অন্য দিকটা — **মানুষের দ্বারা মানুষের নতুন আকার দান...***

রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক।**

[৬। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণা থেকে সিদ্ধান্তসমূহ: ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা, ইতিহাসের রূপান্তর বিশ্ব-ইতিহাসে, কমিউনিস্ট বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা]

[২০] পৃথক পৃথক পুরুষ-পর্যায়গুলির প্রত্যেকটা সমস্ত পূর্ববর্তী পুরুষ-পর্যায় থেকে রেখে-যাওয়া মালমশলা, পুঁজি তহবিল, উৎপাদন-শক্তিসমূহ কাজে লাগায়, এইভাবে প্রত্যেকটা পুরুষ-পর্যায় একদিকে রেওয়াজী কর্মবৃত্তি চালিয়ে যায় সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, আর অন্যদিকে, সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত কর্মবৃত্তি দিয়ে পরিবর্তন ঘটায় পুরন পরিস্থিতিতে, এইসব পৃথক পৃথক পুরুষ-পর্যায়ের পারম্পর্য ছাড়া কিছু নয় ইতিহাস। এটার এমন দূরকল্পী বিকৃতি ঘটান যেতে পারে, যাতে

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] সংসর্গ এবং উৎপাদন-ক্ষমতা।

** পাণ্ডুলিপিতে এই পৃষ্ঠার শেষাংশটা ফাঁকা রাখা হয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় শুরু হয়েছে ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণা থেকে করা বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যান দিয়ে। — সম্পাঃ

পরবর্তী ইতিহাসকে করা হয় পূর্ববর্তী ইতিহাসের লক্ষ্য — যেমন, এমনটা আরোপ করা হয় যে, আমেরিকা আবিষ্কারের লক্ষ্য যেন ফরাসী বিপ্লবের বিস্ফোরণটার আনুকূল্য করা। তার ফলে ইতিহাস পায় সেটার নিজস্ব বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য, ইতিহাস হয়ে ওঠে 'অন্যান্য চরিত্রের পর্যায়ের একটি চরিত্র' (অর্থাৎ কিনা: 'আত্মচেতনা, সমালোচনা, সেই অদ্বিতীয়', ইত্যাদি), যদিও পূর্ববর্তী ইতিহাসের 'নিয়তি,' 'লক্ষ্য', 'বীজ', বা 'ভাব' এইসব শব্দ দিয়ে যা নির্দেশ করা হয় সেটা পরবর্তী ইতিহাস থেকে, পরবর্তী ইতিহাসের উপর পূর্ববর্তী ইতিহাস যে-সক্রিয় প্রভাব খাটায় তার থেকে গড়া একটা বিমূর্তনের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

পৃথক পৃথক ক্ষেত্রগুলোর ক্রিয়া ঘটে পরস্পরের উপর, সেইসব ক্ষেত্র এই বিকাশের ধারায় যত বেশি মাত্রায় প্রসারিত হয়, অগ্রসর উৎপাদন-প্রণালী আর সংসর্গ দিয়ে এবং সেগুলো বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পয়দা করে যে-শ্রমবিভাগ সেটা দিয়ে পৃথক পৃথক জাতিসত্তার গোড়ার বিচ্ছেদ যত বেশি পরিমাণে বিনষ্ট হয়, ততই বেশি পরিমাণে ইতিহাস হয়ে ওঠে বিশ্ব-ইতিহাস। এইভাবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডে যদি এমন একটা যন্ত্র উদ্ভাবিত হয় যেটা ভারতে আর চীনে অসংখ্য শ্রমিকের অন্ন কেড়ে নেয় এবং এইসব সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সমগ্র ধরনটাকে উলটে ফেলে দেয়, সেক্ষেত্রে এই উদ্ভাবনটা হয়ে ওঠে একটা বিশ্ব-ঐতিহাসিক তথ্য। কিংবা পক্ষান্তরে ধরা যাক চিনি আর কফির ব্যাপারটা, উনিশ শতকে এই দুটো জিনিসের বিশ্ব-ঐতিহাসিক গুরুত্ব সপ্রমাণ হয়েছে এই ঘটনাটা দিয়ে: 'নেপোলিয়নীয় মহাদেশীয় ব্যবস্থার' (১৫) দরুন এই জিনিস-দুটোর অভাব ঘটেছিল, তার ফলে জার্মানদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এবং এইভাবে সেটা হয়ে উঠেছিল ১৮১৩ সালের গৌরবান্বিত মুক্তিযুদ্ধগুলির আসল ভিত্তি। তার থেকে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, ইতিহাসের এই বিশ্ব-ইতিহাসে রূপান্তরিত হওয়াটা বাস্তবিকপক্ষে 'আত্মচেতনা', বিশ্ব-জীবাত্মা কিংবা অন্য কোন আধ্যাত্মিক অপচ্ছায়ার দিক থেকে একটা নিছক বিমূর্ত কৃতি নয়, এটা হল সম্পূর্ণভাবে বৈষয়িক এবং যা প্রায়োগিক উপায়ে যাচাই করা যায় এমন একটা কৃতি, যেটার প্রমাণ প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষ তার যাওয়া-আসা, খাওয়া, পান করা এবং কাপড়-জামা পরার ভিতর দিয়ে যোগায়।

বর্তমান সময় অবধি ইতিহাসে প্রায়োগিক উপায়ে লব্ধ একটা তথ্য নিশ্চয়ই এই যে, পৃথক পৃথক ব্যক্তি-মানুষের কর্মবৃত্তি বিস্তারিত হয়ে বিশ্ব-ঐতিহাসিক কর্মবৃত্তিতে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে তাদের দিক থেকে পরক একটা শক্তির দাসে পরিণত হয়েছে (সেই শক্তিটা হল একটা চাপ, যেটাকে তারা ধারণা করেছে তথাকথিত সর্বব্যাপী জীবাত্মা, ইত্যাদির পক্ষ থেকে একটা নোংরা ছলনা বলে), সেই শক্তিটা হয়ে উঠেছে ক্রমাগত বেশি বিপুল, আর শেষপর্যন্ত দেখা যায় সেটা হল **বিশ্ব-বাজার**। কিন্তু সমানই প্রায়োগিক উপায়ে এটা সপ্রমাণ হয়েছে যে, কমিউনিস্ট বিপ্লবে (সে-সম্বন্ধে আরও বলা হবে পরে) সমাজের বিদ্যমান অবস্থা উচ্ছেদ হলে, এবং এই অবস্থার সঙ্গে যা অভিন্ন সেই ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ হলে, জার্মান তত্ত্ববিদদের এত হতবুদ্ধি করে এই যে-শক্তিটা এটা মিলিয়ে যাবে; আরও সপ্রমাণ হয়েছে যে, ইতিহাস যে-পরিমাণে বিশ্ব-ইতিহাসে রূপান্তরিত হবে সেই পরিমাণেই তখন হাসিল হবে প্রত্যেকটি একক ব্যক্তি-মানুষের মুক্তি।* উপরে যা বলা হল তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, ব্যক্তি-মানুষের সত্যিকারের মনোজাগতিক সম্পদ সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে তার সত্যিকারের সংযোগ সম্পদের উপর। একমাত্র তখনই পৃথক পৃথক ব্যক্তি-মনুষ্যগণ বিভিন্ন জাতীয় আর স্থানীয় প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত হবে, সারা পৃথিবীর বৈষয়িক আর মনোজাগতিক উৎপাদের সঙ্গে তাদের ব্যবহারিক সংযোগ স্থাপিত হবে, আর তারা এমন অবস্থায় আসবে যাতে তারা সারা পৃথিবীর এই সর্বতোমুখী উৎপাদগুলির (মানুষের সমস্ত সৃষ্টির) অধিকারী হতে সমর্থ হবে। **সর্বাঙ্গীণ** নির্ভর হল ব্যক্তি-মনুষ্যগণের **বিশ্ব-ঐতিহাসিক** সহযোগের স্বাভাবিক আকার, এটা এই [২২] কমিউনিস্ট বিপ্লব দিয়ে রূপান্তরিত হবে এইসব শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সচেতন কর্তৃত্বে, এই যেসব শক্তি মানুষের পরস্পরের উপর ক্রিয়া থেকে পয়দা হয়ে এযাবত তাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই পরক শক্তি হিসেবে তাদের অভিভূত করে এসেছে, তাদের উপর কর্তৃত্ব করে এসেছে। এই অভিমতটাকে আবার দূরকল্পী-ভাববাদী অর্থাৎ উদ্ভট পরিভাষায় 'প্রজাতির স্বয়ং-উদ্ভব' ('বিষয়ী

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] **চেতনা পয়দা হওয়া সম্বন্ধে।**

হিসেবে সমাজ') বলে প্রকাশ করা যেতে পারে, আর পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন পরস্পর-সম্পর্কিত ব্যক্তি-মনুষ্যগণের ধারাবাহিক শ্রেণীটাকে সেইভাবে ধারণা করা যেতে পারে একক ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে, যেটা নিজের উদ্ভব ঘটাবার অলৌকিক কান্ডটা করে ফেলে। এখানে এটা স্পষ্ট যে, ব্যক্তি-মনুষ্যগণ নিশ্চয়ই **পরস্পরকে** গড়ে তোলে — শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে — কিন্তু তারা নিজেদের গড়ে তোলে সেন্ট ব্রুনোর প্রলাপ অনুসারেও নয়, কিংবা 'সেই অদ্বিতীয়, 'গড়া' মানুষের অর্থেও না।

শেষে, ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণাটার যে-নকশাটা আমরা দিলাম তার থেকে আমরা পাই আরও এইসব সিদ্ধান্ত: (১) উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের ধারায় একটা পর্ব আসে যখন এমনসব উৎপাদন-শক্তি আর সংসর্গের উপকরণ পয়দা হয় যেগুলো বিদ্যমান সম্পর্কের অবস্থায় ঘটায় শুধু অনিষ্ট, সেগুলো আর উৎপাদনকর নয়, সেগুলো ধ্বংসকর শক্তি (যন্ত্রপাতি এবং অর্থ); এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে দেখা দেয় একটা শ্রেণী, সেটা সমাজের সমস্ত বোঝা বয়, কিন্তু সমাজের সুবিধেগুলো পায় না, সমাজ থেকে উচ্ছেদ করে সেটাকে [২৩] অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে অতি নিশ্চিত বৈরী অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়; সেই শ্রেণীটা হয় সমাজের সমস্ত মানুষের সংখ্যাধিক অংশ, সেই শ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয় একটা মূলগত বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে চেতনা, কমিউনিস্ট চেতনা, এই শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তার ফলে অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও অবশ্য দেখা দিতে পারে এই চেতনা। (২) যে-পরিবেশে বিভিন্ন নির্দিষ্ট উৎপাদন-শক্তি প্রযুক্ত হতে পারে সেটা হল সমাজের একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর শাসনের পরিবেশ, সেই শ্রেণীর মালিকানা থেকে উদ্ভূত সামাজিক ক্ষমতার **ব্যবহারিক**-আদর্শগত অভিব্যক্তি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ঘটে রাষ্ট্রের আকারে: কাজেই তখন অবধি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লক্ষ্য করে চালিত হয় প্রত্যেকটা বৈপ্লবিক সংগ্রাম।* (৩) এখন অবধি সংঘটিত সমস্ত বিপ্লবে কর্মবৃত্তি-প্রণালী সবসময়ে অক্ষত থেকে গেছে, সেগুলো ছিল এই কর্মবৃত্তির শুধু ভিন্ন রকমের বণ্টনের প্রশ্ন,

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] জনসাধারণ উৎপাদনের বিদ্যমান অবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহান্বিত।

অন্যান্য লোকের কাছে নতুন করে শ্রম-বণ্টনের প্রশ্ন, যদিও কমিউনিস্ট বিপ্লব চালিত হয় পূর্ববর্তী কর্মবৃত্তি-**প্রণালীর** বিরুদ্ধে, কমিউনিস্ট বিপ্লব রেহাই দেয় **শ্রমকে**,* আর শ্রেণীগুলোকেই সমেত সমস্ত শ্রেণীর শাসন লোপ করে, কেননা যে-শ্রেণী এই বিপ্লব সম্পাদন করে সেটা সমাজে আর শ্রেণী হিসেবে গণ্য নয়, শ্রেণী হিসেবে পরিচিত নয়, সেটা আপনাতেই বর্তমান সমাজের ভিতরকার সমস্ত শ্রেণী, জাতিসত্তা, ইত্যাদির অবসানের অভিব্যক্তি; তাছাড়া, (৪) এই কমিউনিস্ট চেতনা ব্যাপক পরিসরে পয়দা হবার জন্যে, আর কর্মব্রতটার আপনারই সাফল্যের জন্যে, উভয় প্রয়োজনে আবশ্যক গণ পরিসরে মানুষের পরিবর্তনসাধন, যে-পরিবর্তন ঘটতে পারে কেবল কার্যগত আন্দোলনে, **বিপ্লবে**; কাজেই এই বিপ্লব আবশ্যক, সেটা **শাসক** শ্রেণীকে অন্য কোন উপায়ে উচ্ছেদ করা যায় না এই কারণেই শুধু নয়, সেটা আরও এই কারণে যে, শাসক শ্রেণীটাকে **উচ্ছেদ করে** যে-শ্রেণী সেটা যুগযুগান্তরের যাবতীয় জঞ্জালের ভারমুক্ত হতে কৃতকার্য হতে পারে এবং সমাজটাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্ত হতে পারে কেবল বিপ্লবেই।**

---

* [নিম্নলিখিত কথাগুলি পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] ...যে-ধরনের কর্মবৃত্তির অবস্থায় [অমুকের] শাসন...

** [নিম্নলিখিত রচনাংশটা পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] যখন যেমন ইংলন্ডে আর জার্মানিতে তেমনি ফ্রান্সে সমস্ত কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল হল বিপ্লবটার অবশ্যম্ভাবিতার কথা মেনে নিয়েছেন, সেন্ট ব্রুনো অচঞ্চল থেকে স্বপ্ন দেখেই চলেছেন, আর তিনি মনে করেন, 'আদত মানবতাবাদ' অর্থাৎ কমিউনিজম 'আত্মিকবাদের স্থান' (সেটার কোন স্থান নেই) নেবে শুধু যাতে সেটা শ্রদ্ধাস্পদ হতে পারে। তিনি স্বপ্নে আরও বলে চলেছেন, তখন নিঃসন্দেহে 'মোক্ষলাভ হবে, মর্ত হয়ে উঠবে স্বর্গ, স্বর্গ হবে মর্ত'। (ব্রহ্মবিদ্যাবিদটি এখনও স্বর্গের কথা ভুলতে অপারক।) 'তখন অনন্ত কালের আনন্দ আর পরম সুখ অনুরণিত হবে স্বর্গীয় সমতানের মাঝে' (১৪০ পৃঃ)। চার্চের এই ধার্মিক ফাদারটি মহা-বিস্মিত হবেন যখন তাঁকে পাকড়াও করবে রোজ কেয়ামত, যেদিন এই সবকিছু ঘটে যাবার কথা — যেদিন আকাশে জ্বলন্ত নগরীগুলির প্রতিবিম্ব উষার সূচনা করবে, যখন 'স্বর্গীয় সমতানের' সঙ্গে একত্রে তাঁর কানে অনুরণিত হবে 'মার্সেলেজ' আর 'কার্মেনিওল'-এর সুর, তাতে সংগত করবে কামানের অপরিহার্য গর্জন, তাল ঠুকবে গিলোটিন; দুষ্ট 'জনগণ' যখন উচ্চঃস্বরে গাইবে সা ইরা, সা ইরা, আর 'আত্মচেতনাকে' ঝুলিয়ে দেবে ল্যাম্প-পোস্টে (১৬)। 'অনন্ত কালের আনন্দ আর পরম সুখের' নৈতিক-

[৭। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণার সংক্ষিপ্তসার]

[২৪] ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণাটা নির্ভর করে কয়েকটা ব্যাপারে আমাদের সামর্থ্যের উপর, সেগুলি হল: জীবনের আপনারই ভৌত উৎপাদন থেকে শুরু করে আসল উৎপাদন-প্রক্রিয়াটাকে বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা; সমগ্র ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে এই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এই প্রক্রিয়া দিয়ে সৃষ্ট সংসর্গ-রূপটাকে (অর্থাৎ, বিভিন্ন পর্বে নাগরিক সমাজ) উপলব্ধি করা; রাষ্ট্র হিসেবে এটার কর্মের মাঝে এটাকে দেখান, চেতনার সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্বগত উৎপাদ আর আকারগুলির — ধর্ম, দর্শন, নীতিবিদ্যা, ইত্যাদি, ইত্যাদির — ব্যাখ্যা করা এবং সেই ভিত্তি থেকে সেগুলির উৎপত্তি আর ক্রমবৃদ্ধি নির্ধারণ করা, সেই উপায়ে অবশ্য গোটা ব্যাপারটার বর্ণনা করা যায় সেটার সাকল্যের মাঝে (কাজেই এইসব বিভিন্ন দিকের পারস্পরিক ক্রিয়াটাকেও)। ইতিহাস সম্বন্ধে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যা হয় সেইভাবে এটাকে প্রত্যেকটা কালপর্যায়ে একটা ধারণামৌলের সন্ধান করতে হয় না, এটা সর্বদা থাকে ইতিহাসের আসল **জমিনে;** এটা ভাব থেকে চালিতকর্মের ব্যাখ্যা করে না, বিভিন্ন ভাব গড়ে ওঠার ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করে বৈষয়িক চালিতকর্ম থেকে; তদনুসারে এটা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, মানসিক সমালোচনা দিয়ে, 'আত্মচেতনায়' পরিণত করে কিংবা বিভিন্ন 'অপচ্ছায়া', 'অশরীরী মূর্তি', 'কল্পনা' (১৭), ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করে চেতনার সমস্ত রূপ আর উৎপাদগুলিকে মিলিয়ে দেওয়া যায় না, সেটা করা যায় শুধু যেসব প্রকৃত সামাজিক সম্পর্ক এই ভাববাদী দমবাজি পয়দা করেছে সেগুলোকে কার্যক্ষেত্রে উচ্ছেদ করে; ইতিহাসের, আর ধর্ম, দর্শন এবং অন্যান্য সমস্ত ধরনের তত্ত্বেরও চালিকাশক্তি সমালোচনা নয়, সেটা হল বিপ্লব। এটা দেখিয়ে দেয়

উন্নতিসাধক চিত্র অঙ্কনের আদৌ কোন কারণই নেই সেন্ট ব্রুনোর। রোজ কেয়ামতে সেন্ট ব্রুনোর আচরণটার ধারণাগত বর্ণনা দিয়ে পুলকিত হবার বাসনাটা আমরা ছেড়েই দিলাম। Prolétaires en révolution-কে ধারণা করতে হবে সমালোচনাকে উচ্ছেদ করতে অভিলাষী 'সারমর্ম', 'জনগণ' হিসেবে, কিংবা যে-জীবাত্মার এখনও কিছু বাউয়েরের ধ্যান-ধারণা হজম করার জন্যে আবশ্যক সংগতির ঊনতা আছে সেটার একটা 'নিঃসরণ' হিসেবে, সেটাও আবার স্থির করা দুষ্কর।

যে, 'জীবাত্মার জীবাত্মা'* হিসেবে 'আত্মচেতনায়' পরিণত হয়ে ইতিহাসের অবসান ঘটে না, এতে প্রত্যেকটা পর্বে পাওয়া যায় বৈষয়িক ফল: উৎপাদন-শক্তিসমূহের সমষ্টি, প্রকৃতির সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তি-মনুষ্যগণের ইতিহাসক্রমে গড়ে-ওঠা সম্পর্ক, যা প্রত্যেকটা পুরুষ-পর্যায় পায় পূর্বপুরুষের কাছ থেকে; উৎপাদন-শক্তিসমূহ, পুঁজিতহবিল এবং পরিবেশের পুঞ্জ, যাতে একদিকে বাস্তবিকই অদলবদল ঘটায় নতুন পুরুষ-পর্যায়, কিন্তু অন্যদিকে আবার এর জীবনের পরিবেশ নির্দিষ্ট করে এবং এতে প্রদান করে একটা নির্দিষ্ট বিকাশ, বিশেষ চরিত্র। এটা দেখিয়ে দেয় যে, পরিস্থিতি মানুষকে গড়ে [২৫] ঠিক যে পরিমাণে মানুষ গড়ে পরিস্থিতিটাকে।

উৎপাদন-শক্তিসমূহ, পুঁজিতহবিল এবং সংসর্গের সামাজিক রূপগুলির এই সমষ্টি, যা প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষ আর পুরুষ-পর্যায় বিদ্যমান অবস্থায় পায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া একটাকিছু হিসেবে, সেটা হল, যাকে দার্শনিকেরা ধারণা করেছেন 'সত্ত্ব' এবং 'মানুষের সারমর্ম' হিসেবে, আর যেটাকে তাঁরা দেবতুল্য করেছেন এবং আক্রমণ করেছেন, তার বাস্তব ভিত্তি: একটা বাস্তব ভিত্তি, যেটাকে 'আত্মচেতনা' আর 'অদ্বিতীয়' হিসেবে ধরে এইসব দার্শনিক সেটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, এর দরুন মানুষের বিকাশের উপর সেটার ক্রিয়াফল আর প্রভাবের দিক থেকে সেটা একটুও বিপর্যস্ত হয় না। বিভিন্ন পুরুষ-পর্যায় বিদ্যমান অবস্থায় পায় জীবনের এই যেসব পরিবেশ এগুলি এটারও নিষ্পত্তি করে যে, মাঝে-মাঝে সংঘটিত বৈপ্লবিক আলোড়ন বিদ্যমান সমগ্র ব্যবস্থাটাকে উচ্ছেদ করার মতো যথেষ্ট প্রবল হবে কিনা। একটা পরিপূর্ণ বিপ্লবের এইসব উপাদান যদি বর্তমান না থাকে (যথা, একদিকে বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তিসমূহ, এবং অন্যদিকে বৈপ্লবিক জনগণ গঠন, যে-জনগণ বিদ্রোহ করে তখন অবধি সমাজের পৃথক পৃথক পরিবেশের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, আরও বিদ্রোহ করে তখন অবধি 'জীবন উৎপাদনের'ই বিরুদ্ধে, সমাজটার যা ভিত্তি ছিল সেই 'সমগ্র কর্মবৃত্তির' বিরুদ্ধে), সেক্ষেত্রে, কার্যক্ষেত্রের বিকাশ যতখানি সংশ্লিষ্ট সেদিক থেকে, এই বিপ্লবের **ভাব-ধারণাটা** ইতঃপূর্বে এক-শ' বার প্রকাশ করা হয়েছে কিনা সেটা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর, যা প্রমাণ করছে কমিউনিজমের ইতিহাস।

* কথাটা ব্রুনো বাউয়েরের। — সম্পাঃ

[৮। ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ববর্তী, ভাববাদী ধারণার, বিশেষত হেগেলোত্তর জার্মান দর্শনের ভিত্তিহীনতা]

বর্তমান সময় অবধি ইতিহাস সম্বন্ধে সমগ্র ধারণাটায় ইতিহাসের এই বাস্তব ভিত্তিটাকে হয় একেবারেই তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, নইলে সেটাকে বিবেচনা করা হয়েছে ইতিহাসের ধারার পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই অবান্তর একটা গৌণ বিষয় হিসেবে। কাজেই ইতিহাস সবসময়ে লিখিত হওয়া চাই একটা বহিস্থ মানদণ্ড অনুসারে; যথার্থ জীবন উৎপাদন মনে হয় যেন আদিযুগীয় ইতিহাস, আর যা যথার্থ ঐতিহাসিক সেটা সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, অধিপার্থিব-বহির্ভূত একটাকিছু বলে প্রতীয়মান হয়। এই মতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিষয়টাকে ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয়, আর তার থেকে সৃষ্টি করা হয় প্রকৃতি আর ইতিহাসের বিরুদ্ধতা (antithesis)। ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণার প্রবক্তারা কাজে কাজেই ইতিহাসে দেখতে পেরে উঠেছেন শুধু রাজ-রাজড়া আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতিক কৃতিগুলো, ধর্মীয় এবং সবরকমের তত্ত্বগত সংগ্রামগুলো, আর বিশেষত প্রত্যেকটা ইতিহাসক্রমিক যুগে তাঁদের **সেই যুগের বিভ্রান্তিতে শরিক হতে হয়েছে।** যেমন, কোন-একটা যুগের যদি এমন ধারণা থাকে যে, সেটা চালিত হয়েছে নিছক 'রাজনীতিক' কিংবা 'ধর্মীয়' প্রেরণা অনুসারে যদিও 'ধর্ম' আর 'রাজনীতি' হল সেটার প্রকৃত প্রেরণার বিভিন্ন আকারমাত্র, তাহলে ইতিহাসকার এই মত মেনে নেন। 'ভাবটা' — বিষয়ীভূত লোকসমষ্টির প্রকৃত চালিতকর্ম সম্বন্ধে তাদের 'ধারণাটা' — একমাত্র নির্ধারক, সক্রিয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যেটা তাদের চালিতকর্মকে নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ধারণ করে। ভারতীয় আর মিসরীদের মধ্যে অপরিণত আকারে শ্রমবিভাগ দেখা দিলে সেটা থেকে যখন তাদের রাষ্ট্রে আর ধর্মে বর্ণভেদ প্রথা উদ্ভূত হয়, ইতিহাসকার মনে করেন বর্ণভেদপ্রথাটাই [২৬] সেই শক্তি যেটা পয়দা করেছে এই অপরিণত সামাজিক আকারটাকে।

ফরাসীরা আর ইংরেজরা ধরে থাকে অন্তত রাজনীতিক বিভ্রান্তি, যেটা মাঝারি ধরনে বাস্তবতার কাছাকাছি, কিন্তু জার্মানরা চলে যায় 'বিশুদ্ধ জীবাত্মার' রাজ্যে, আর ধর্মীয় বিভ্রান্তিকে করে তোলে ইতিহাসের চালিকাশক্তি। ইতিহাস সম্বন্ধে হেগেলীয় দর্শন 'সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তিতে' যা দাঁড়ায় সেটা

হল এই **সমগ্র** জার্মান ইতিহাস-লিখনের আখেরি পরিণতি; এই জার্মান ইতিহাস-লিখনের বিবেচনায় বিষয়টা বাস্তব আগ্রহের, এমনকি রাজনীতিক আগ্রহেরও প্রশ্ন নয়, এটা হল বিভিন্ন বিশুদ্ধ চিন্তার প্রশ্ন, সেগুলো কাজেকাজেই সেন্ট ব্রুনোর কাছে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় একগুচ্ছ 'চিন্তা' হিসেবে, যেগুলো পরস্পরকে গিলে যায় এবং শেষে যায় 'আত্মচেতনার' গ্রাসে*; ইতিহাসের ধারাটা 'নাইট্', দস্যু আর প্রেতাত্মাদের কাহিনী হিসেবে আরও সংগতিপূর্ণ হয়ে প্রতীয়মান হয় 'মহিমান্বিত' মাক্স স্টির্নারের কাছে, যিনি সাচ্চা ইতিহাস সম্বন্ধে জানেন না একেবারে কিছুই, যিনি ঐসব অপচ্ছায়া থেকে রক্ষা পান অবশ্য শুধু 'অপবিত্রতা' দিয়ে। এই ধারণাটা খাঁটি ধর্মীয়: এতে আদিম মানুষ হিসেবে স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্য ধর্মবিশ্বাসী মানুষ হল ইতিহাসের আরম্ভস্থল; জীবনোপায়ের এবং জীবন আপনারই প্রকৃত উৎপাদনের জায়গায় নানা অসার কল্পনার ধর্মীয় উৎপাদন স্থাপন করা হয় এটার অলীক কল্পনায়।

ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণাটার অবসান এবং এর ফলস্বরূপ উদ্ভূত বিভিন্ন বিবেকগত সংকোচ আর বিবেকের তাড়নার সঙ্গে একত্রে এই সমগ্র ধারণাটা জার্মানদের নিছক **জাতিগত** ব্যাপার, এটা জার্মানদের পক্ষে শুধু **স্থানীয়** আগ্রহজনক; দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইদানীং কয়েক বার আলোচিত হয়েছে এই যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা: আমরা যথার্থই কিভাবে 'উত্তীর্ণ হই ঈশ্বরের রাজ্য থেকে মানুষের রাজ্যে' — ভঙ্গিটা এই যে, এই 'ঈশ্বরের রাজ্য' যেন অলীক কল্পনায় ছাড়া কোথাও ছিল কখনও, আর এই পণ্ডিত ভদ্রলোকেরা যেন সর্বক্ষণ বাস করছিলেন না 'মানুষের রাজ্যে', যেখানে যাবার পথ তাঁরা এখন খুঁজছেন; আর ভঙ্গিটা এই যে, এই তত্ত্বগত ভুড়ভুড়ি-ফাটাবার রহস্যটার ব্যাখ্যা করার পণ্ডিতী আমোদপ্রমোদটা (এটা তার চেয়ে বেশি কিছু নয়) যেন, বিপরীতে, প্রকৃত পার্থিব পরিবেশে এটার উৎপত্তি প্রদর্শন করার ব্যাপার নয়। এই জার্মানদের বেলায় এটা সবসময়েই পূর্ববর্তী লেখকদের প্রলাপকে

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] ঐতিহাসিক পরিবেশকে কর্মবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র করে ধরে সেটা নিয়ে আলোচনা করাটাই তথাকথিত **বিষয়গত** ইতিহাস-লিখন। প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি।

[২৭] স্রেফ অন্য কোন উদ্ভট্টকিছুতে পরিণত করার ব্যাপার, অর্থাৎ এই যাবতীয় প্রলাপের একটা বিশেষ **অর্থ** আছে, যা আবিষ্কার করা যায়, এমনটা আগেই ধরে নেবার ব্যাপার; যখন প্রকৃতপক্ষে এটা শুধু হল এই তত্ত্বগত প্রসঙ্গকে বাস্তবিক বিদ্যমান পরিবেশ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রশ্ন। এইসব উক্তির সত্যিকারের, ব্যবহারিক অবসান ঘটবে, মানুষের চেতনা থেকে এইসব ধারণা দূর হবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি দিয়ে, কিন্তু কোন তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত দিয়ে নয়, যা আমরা আগেই বলেছি। জনগণের বেলায়, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের বেলায় এইসব তত্ত্বগত ধারণার অস্তিত্ব নেই, কাজেই তার অবসান ঘটাবার আবশ্যকতা নেই, আর যদি এই জনগণের কখনও কোন তত্ত্বগত ধারণা — যেমন, ধর্ম ইত্যাদি থেকে থাকে, সেগুলোর অবসান বহুকাল আগে ঘটে গেছে পরিস্থিতি দিয়ে।

'ঈশ্বর-মানুষ' (খৃষ্ট), 'মানুষ', ইত্যাদির মতো অলীক কল্পনা ইতিহাসের পৃথক পৃথক যুগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে এইসব তত্ত্ববিদ যেভাবে পুরোপুরি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বাস করেন (সেন্ট ব্রুনো তো এমনটা পর্যন্ত বলেছেন যে, 'ইতিহাস হয়েছে কেবল সমালোচনা আর সমালোচকদের কৃতি') (১৮), তার থেকেও আবার দেখা যায় এইসব প্রশ্ন আর মীমাংসার জাতিগত প্রকৃতি, আর তাঁরা নিজেরা বিভিন্ন ইতিহাসতন্ত্র গড়ে তোলার সময়ে পূর্ববর্তী সমস্ত কালপর্যায়কে ঝটিতি ডিঙ্গিয়ে যান এবং তৎক্ষণাৎ চলে যান 'মঙ্গোলিজ্‌ম' (১৯) থেকে 'অর্থপূর্ণ মর্মবস্তুযুক্ত' ইতিহাসে, অর্থাৎ কিনা, 'Hallische' আর 'Deutsche Jahrbücher'-এর (২০) ইতিহাসে, আর হেগেলীয় মত-সম্প্রদায়টাকে একটা সর্বাত্মক কোঁদলে পর্যবসিত করেন। তাঁরা ভুলে যান অন্যান্য সমস্ত জাতিকে, সমস্ত প্রকৃত ঘটনা তাঁরা ভুলে যান, আর theatrum mundi-টা গণ্ডিবদ্ধ থাকে 'লাইপজিগ পুস্তক মেলায়', এবং 'সমালোচনা', 'মানুষ' আর 'অদ্বিতীয়'-এর পারস্পরিক ঝগড়াঝাঁটিতে।* এইসব তত্ত্ববিদ যদি কোন যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আঠার শতক নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরা দেন শুধু সেই যুগের ভাব-ধারণার ইতিহাস, যেসব ভাব-ধারণাকে তাঁরা তথ্যাদি এবং ঐসব ভাব-ধারণার পক্ষে মূলগত বাস্তব

---

* অর্থাৎ, ব্রুনো বাউয়ের, ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ এবং মাক্স স্টির্নার। — সম্পাঃ

বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন; এমনকি সেটাও তাঁরা করেন সেই কালপর্যায়টাকে একটা অসম্পূর্ণ প্রাথমিক পর্ব হিসেবে, আসল ঐতিহাসিক যুগের, অর্থাৎ ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালে জার্মানির দার্শনিক সংগ্রামের কালপর্যায়ের তখনও সীমাবদ্ধ পূর্ববর্তী পর্ব হিসেবে চিত্রিত করার জন্যে। যেমনটা অনুমান করা যেতে পারে, কোন অনৈতিহাসিক ব্যাক্তি এবং তার খোশ-খেয়ালগুলোর জমক বিশিষ্ট করে দেখাবার উদ্দেশ্যে কোন একটা পূর্ববর্তী কালপর্যায়ের ইতিহাস লেখার সময়ে সমস্ত যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনার, এমনকি ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাজনীতির বাস্তবিক অনধিকার প্রবেশের ঘটনার উল্লেখ করা হয় না। তার বদলে আমরা পাই কোন আখ্যান, যেটার ভিত্তি নয় গবেষণা, ভিত্তি হল কোন খামখেয়ালী ব্যাখ্যা এবং জল্পনা সাহিত্য, যেমন আখ্যান সেন্ট ব্রুনো যুগিয়েছেন আঠার শতক সম্বন্ধে তাঁর অধুনা-বিস্মৃত ইতিহাসে (২১)। ভাব-ধারণার এইসব গালভরা বাক্যবাগীশ অহঙ্কারী ফেরিওয়ালারা, যাঁরা সমস্ত জাতিগত বদ্ধধারণার বহু ঊর্ধ্বে উন্নীত বলে নিজেদের সম্বন্ধে কল্পনা করেন, তাঁরা এইভাবে বাস্তবে ঢকঢক করে বীয়ার-গেলা যে-কূপমণ্ডূকেরা সংযুক্ত জার্মানির স্বপ্ন দেখে তাদের চেয়ে ঢের বেশি জাতীয়। অন্যান্য জাতির কীর্তিগুলিকে ঐতিহাসিক বলে তাঁরা স্বীকার করেন না: তাঁরা বেঁচে থাকেন জার্মানিতে, জার্মানির উদ্দেশে [২৮], এবং জার্মানির জন্যে: তাঁরা রাইন-গীতটাকে (২২) একটা ধর্মীয় স্তোত্রে পরিণত করেন, তাঁরা অ্যালসেস-লরেন জয় করেন ফরাসী রাষ্ট্রের বদলে ফরাসী দর্শনের ক্ষেত্রে ডাকাতি ক'রে, কোন কোন ফরাসী প্রদেশের বদলে ফরাসী ভাব-ধারণাকে জার্মানায়িত ক'রে। সেন্টদ্বয় ব্রুনো আর মাক্স তত্ত্বের সর্বব্যাপী প্রাধান্যের ভিতর দিয়ে জার্মানির সর্বব্যাপী প্রাধান্যের ঘোষণা করেন — তাঁদের সঙ্গে তুলনায় হের ভেনেডে জাতীয়-সংস্কারমুক্ত মানুষ।

[৯। ফয়েরবাখ সম্বন্ধে, ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁর ভাববাদী ধারণা সম্বন্ধে বাড়তি সমালোচনা]

ফয়েরবাখ যখন ('Wigand's Vierteljahrsschrift', 1845, Band 2) 'সাধারণ মানুষ' এই পরিমিতকরণের কারণে নিজেকে কমিউনিস্ট বলে

ঘোষণা করেছেন, (২৩) শেষোক্ত কথাটাকে 'মানুষের' একটা গুণে রূপান্তরিত করেছেন, আর সেটা দিয়ে তিনি ভেবেছেন বাস্তবে যে 'কমিউনিস্ট' শব্দটার অর্থ হল একটা নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক পার্টির অনুগামী সেটাকে একটা নিছক ধারণামৌলে পরিবর্তিত করা সম্ভব তাতে তিনি স্পষ্টতই আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন। মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ব্যাপারে ফয়েরবাখের গোটা সিদ্ধান্তটা শুধু এইটুকু প্রমাণ করে যে, মানুষ পরস্পরের পক্ষে আবশ্যক এবং **বরাবরই আবশ্যক ছিল**। তিনি চান এই তথ্যটা সম্বন্ধে চেতনা প্রবর্তন করতে, অর্থাৎ কিনা, একটা **বিদ্যমান** তথ্য সম্বন্ধে শুধু একটা সঠিক চেতনা পয়দা করতে — অন্যান্য তত্ত্ববিদদেরই মতো; যেক্ষেত্রে সাচ্চা কমিউনিস্টের বেলায় এটা হল বিদ্যমান পরিস্থিতি-হাল উচ্ছেদ করার প্রশ্ন। অধিকন্তু, আমরা পুরোপুরিই উপলব্ধি করি যে, স্রেফ **এই** তথ্যটা সম্বন্ধে চেতনা পয়দা করার চেষ্টায় ফয়েরবাখ এগোচ্ছেন ততদূর যার পরে কোন তত্ত্ববিদের পক্ষে আর তত্ত্ববিদ এবং দার্শনিক থাকা সম্ভব নয়। তবে এটা একটা বিশেষক উপাদান যে, সেন্ট ব্রুনো আর সেন্ট মাক্স কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে ফয়েরবাখের ধারণাটাকে লুফে নিয়ে সেটা স্থাপন করেন আসল কমিউনিস্টের জায়গায় — এটা ঘটে, অংশত, যাতে তাঁরা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারেন সেটাকে 'জীবাত্মার জীবাত্মা' হিসেবে, একটা দার্শনিক ধারণামৌল হিসেবে, একটা সমান প্রতিপক্ষ হিসেবে ধরে, আর, সেন্ট ব্রুনোর বেলায়, অংশত প্রায়োগিক কারণেও।

বিদ্যমান বাস্তবতাটাকে মেনে নেওয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ভুল বোঝায় যে-ব্যাপারটায় ফয়েরবাখ এখনও আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের শরিক, তার একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা স্মরণ করছি 'Philosophie der Zukunft'-এর সেই রচনাংশটা, যাতে তিনি প্রসারিত করেছেন এই বিবেচনাধারাটাকে: একটা জিনিস কিংবা একজন মানুষের অস্তিত্বটা হল একই সঙ্গে সেটার কিংবা তার সারমর্ম (২৪), একটা প্রাণীর কিংবা ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বের পরিবেশ, জীবনযাত্রা আর কর্মবৃত্তির প্রণালী হল তেমনটা যেমনটাতে সেটার কিংবা তার 'সারমর্ম' পরিতৃপ্ত বোধ করে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্যতিক্রমকে বিবেচনা করা হয় স্পষ্টতই দুর্ভাগ্যজনক আকস্মিক ঘটনা হিসেবে, অস্বাভাবিকতা হিসেবে, যা বদলান যায় না। এইভাবে, লক্ষ লক্ষ প্রলেতারিয়ান যদি তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ সম্বন্ধে কোনক্রমেই পরিতৃপ্তি বোধ না করে,

তাদের 'অস্তিত্ব' যদি [২৯] তাদের 'সারমর্মের' সঙ্গে মোটেই মানানসই না হয়, তাহলে, উদ্ধৃতিটা অনুসারে, সেটা হল একটা অপরিহার্য দুর্ভাগ্য, যেটাকে শান্তভাবে সয়ে চলতে হবে। লক্ষ লক্ষ প্রলেতারিয়ান আর কমিউনিস্টরা কিন্তু ভাবে অন্যভাবে, সেটা তারা প্রমাণ করবে যথাসময়ে, যখন তারা কার্যগত উপায়ে, বিপ্লবের সাহায্যে তাদের 'অস্তিত্বটাকে' তাদের 'সারমর্মের' সঙ্গে মিলিয়ে-মানিয়ে নেবে। কাজেই ফয়েরবাখ এমনসব ক্ষেত্রে মানুষের জগৎটার কথা বলেন না কখনও, সবসময়েই তিনি আশ্রয় নেন বহিঃপ্রকৃতিতে, তাও আবার **সেই** প্রকৃতি যেটাকে মানুষ এখনও বশে আনে নি। কিন্তু প্রত্যেকটা নতুন উদ্ভাবন, শিল্পের প্রত্যেকটা অগ্রগতি এই রাজ্য থেকে আর-একটা টুকরো খসিয়ে দেয়, যার ফলে যেখানে এমনসব ফয়েরবাখীয় উপস্থাপনা বিশদ করার দৃষ্টান্ত পয়দা হয় সেই জমিনটা সমানে সংকুচিত হয়ে আসছে। মাছের 'সারমর্ম' হল সেটার 'অস্তিত্ব', জল — এই একটামাত্র উপস্থাপনা ছাড়িয়ে না গেলে। মিঠে জলের মাছের 'সারমর্ম' হল নদীর জল। কিন্তু যেইমাত্র শিল্পের কাজে নদী ব্যবহৃত হতে থাকে, যেইমাত্র নদী নোংরা হয় রঞ্জক পদার্থ দিয়ে, আর নদীতে স্টীম-পোত চলাচল শুরু হয়, কিংবা যেইমাত্র নদীর জল ভিন্নমুখ করে বইয়ে দেওয়া হয় খালে, যেখানে মামুলি জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা মাছের অস্তিত্বের মাধ্যম কেড়ে নিতে পারে, অমনি নদীর জল আর মাছের 'সারমর্ম' থাকে না, সেটা আর মাছের অস্তিত্বের উপযোগী মাধ্যম নয়। এইরকমের সমস্ত দ্বন্দ্ব-অসংগতি হল অবশ্যম্ভাবী অস্বাভাবিকতা এই মর্মে ব্যাখ্যাটা 'মহিমান্বিত' মাক্স স্টির্নার অসন্তুষ্ট মানুষকে যে-সান্ত্বনা দেন তার থেকে মূলত পৃথক নয়, ঐ সান্ত্বনাবাক্যে তিনি বলেন, এই দ্বন্দ্ব-অসংগতি তাদের নিজেদেরই দ্বন্দ্ব-অসংগতি, এই দুর্গতি তাদের নিজেদেরই দুর্গতি, যার ফলে হয় তাদের মন খারাপ করা চলবে না, তাদের বিরাগ চেপে রাখতে হবে, নইলে সেটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে কোন একটা উদ্ভট উপায়ে। সেন্ট ব্রুনো যা বলে দেন সেটা থেকেও উল্লিখিত ব্যাখ্যার পার্থক্য তেমনিই সামান্য -- তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট লোকেরা 'সত্ত্বের' কাদায় আটকে গেছে, তারা এগিয়ে 'পরম আত্মচেতনায়' পৌঁছয় নি, এইসব প্রতিকূল পরিবেশ হল তাদের জীবাত্মার জীবাত্মা এটা তারা উপলব্ধি করে না, তার দরুনই এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি।

[৩]

[১। শাসক শ্রেণী এবং কর্তৃত্বশালী চেতনা। ইতিহাসে জীবাত্মার আধিপত্য সংক্রান্ত হেগেলীয় ধারণা গঠন]

[৩০] প্রত্যেকটা যুগে শাসক শ্রেণীর ভাব-ধারণাই কতৃত্বশালী ভাব-ধারণা, অর্থাৎ কিনা, যে-শ্রেণীটা সমাজে শাসনকারী **বৈষয়িক** শক্তি, সেটা একই সঙ্গে কর্তৃত্বকর **বুদ্ধিবৃত্তিগত** শক্তিও বটে। বৈষয়িক উৎপাদনের উপকরণে যে-শ্রেণীর আয়ত্তি থাকে সেটাই একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, মোটামুটি বলা যায়, এইভাবে, মানসিক উৎপাদনের উপায়-উপকরণ যাদের নেই তাদের ভাব-ধারণা ঐ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন। কর্তৃত্বশীল ভাব-ধারণা প্রাধান্যশালী বৈষয়িক সম্পর্কতন্ত্রের ভাবগত অভিব্যক্তির চেয়ে, ভাব-ধারণা হিসেবে উপলব্ধ প্রাধান্যশালী বৈষয়িক সম্পর্কতন্ত্রের চেয়ে, আর তার থেকে, যেসব সম্পর্ক একটা শ্রেণীকে করে তোলে শাসক সেগুলোর চেয়ে বেশি কিছু নয়, কাজেই এই শ্রেণীর প্রাধান্যের ভাব-ধারণা। যেসব ব্যক্তি-মানুষকে নিয়ে শাসক শ্রেণী তাদের অন্যান্য জিনিসের মধ্যে থাকে চেতনা, কাজেই তারা চিন্তা করে। কাজেই যে-পরিমাণে তারা শাসন করে একটা শ্রেণী হিসেবে, আর কোন একটা যুগের প্রসার আর পরিধি নির্ধারণ করে, তাতে এটা স্বতঃপ্রতীয়মান যে, তারা সেটা করে গোটা পাল্লা জুড়ে, এই কারণে তারা শাসন করে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ভাবুক হিসেবেও, ভাব-ধারণা সৃষ্টিকারী হিসেবেও, আর তাদের যুগের ভাব-ধারণার উৎপত্তি আর বণ্টন তারা নিয়মিত করে: এইভাবে তাদের ভাব-ধারণা হয় সংশ্লিষ্ট যুগের কর্তৃত্বশালী ভাব-ধারণা। যেমন, কোন একটা যুগে এবং কোন একটা দেশে যেখানে রাজকীয় ক্ষমতা, অভিজাতকুল আর বুর্জোয়ারা প্রভুত্বের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কাজেই যেখানে প্রভুত্ব অংশবিভক্ত, সেখানে বিভিন্ন ক্ষমতার পৃথকীকরণের মতবাদটা প্রাধান্যশালী ভাব বলে প্রতিপন্ন হয়, সেটা প্রকাশ পায় একটা 'চিরন্তন বিধানের' আকারে।

আমরা আগেই দেখেছি (পৃঃ [১৫-১৮])* শ্রমবিভাগ হল এখন

* এই খণ্ডের ৩৭-৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অবধি ইতিহাসের একটা মুখ্য শক্তি, সেটা শাসক শ্রেণীতেও প্রকাশ পায় মানসিক আর [৩১] বৈষয়িক শ্রমের বিভাগ হিসেবে, তার ফলে এই শ্রেণীর ভিতরে একাংশ দেখা দেয় শ্রেণীটার ভাবুক হিসেবে (শ্রেণীটার সক্রিয়, কল্পনাশক্তিসম্পন্ন ভাবাদর্শবিদেরা, যারা শ্রেণীটার নিজের সম্বন্ধে বিভ্রান্তিটাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার কাজটাকে ধরে জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হিসেবে), আর এইসব ভাব-ধারণা আর বিভ্রান্তির প্রতি অন্যান্যের মনোভাবটা হয় অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় আর ভাবগ্রাহী, তার কারণ তারা হল বাস্তব ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর সক্রিয় সদস্যারা, নিজেদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাব-ধারণা আর বিভ্রান্তি গড়ে তোলার জন্যে সময় তাদের অপেক্ষাকৃত কম। এই শ্রেণীটার ভিতরে অংশ-দুটোর মধ্যকার ফাট এমনকি একটাকিছু বিরুদ্ধতা আর বৈরিতায়ও পরিণত হতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সংঘর্ষ বাধলে শ্রেণীটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ঐ বিরুদ্ধতা আর বৈরিতা আপনা থেকেই উবে যায়, আর সেক্ষেত্রে আরও একটা জিনিস ঘটে: কর্তৃত্বশালী ভাব-ধারণা যেন শাসক শ্রেণীর ভাব-ধারণা নয়, সেগুলোর যেন এই শ্রেণীটা থেকে স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা থাকে, এমন আপাতদৃষ্ট ছাপটাও মিলিয়ে যায়। বিশেষ কোন কালপর্যায়ে বৈপ্লবিক ভাব-ধারণার অস্তিত্ব বলতে বোঝায় সেখানে আগে থেকে একটা বৈপ্লবিক শ্রেণীর অস্তিত্ব; বৈপ্লবিক শ্রেণীর বিভিন্ন পত্তন সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে যথেষ্টই (পৃঃ [১৮-১৯, ২২-২৩])।*

ইতিহাসের ধারা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা যদি শাসক শ্রেণীর ভাব-ধারণাকে খাস শাসক শ্রেণীটা থেকেই বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেগুলোতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করি, অমুক কিংবা তমুক ভাব-ধারণা পয়দা হবার পরিবেশ এবং সেগুলোর পয়দাকারীদের সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি সেগুলো কোন একটা নির্দিষ্ট কালপর্যায়ে প্রাধান্যশালী ছিল এই কথা বলেই ক্ষান্ত হই, তাহলে আমরা বলতে পারি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অভিজাতকুলের প্রাধান্যের কালে প্রাধান্যশালী ছিল সম্মান, বিশ্বস্ততা, ইত্যাদি ধারণা, বুর্জোয়াদের প্রাধান্যের কালে — মুক্তি, সমতা, ইত্যাদি ধারণা। শাসক শ্রেণী মোটের উপর মনে করে, এমনটাই

* এই খণ্ডের ৪৩-৪৪ এবং ৪৭-৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

বটে। ইতিহাস সম্বন্ধে এই যে-ধারণাটা সমস্ত ইতিহাসকারের বেলায় অভিন্ন, বিশেষত আঠার শতক থেকে, সেটা অনিবার্যভাবেই এই ব্যাপারটার বিপরীতে [৩২] এসে পড়বে: ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় বিমূর্ত ভাব-ধারণাই আধিপত্য করে, অর্থাৎ সেইসব ভাব-ধারণা যেগুলো সর্বজনীনতার আকার ধারণ করে। কেননা প্রত্যেকটা শাসক শ্রেণী পূর্ববর্তী শাসক শ্রেণীর স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে শুধু নিজ লক্ষ্য হাসিল করার জন্যেই নিজ স্বার্থটাকে সমাজের সমস্ত মানুষের সাধারণী স্বার্থ হিসেবে তুলে ধরতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ কিনা, ভাবগত আকারে প্রকাশ করলে কথাটা এই যে, ঐ শাসক শ্রেণীকে সেটার ভাব-ধারণাকে সর্বজনীনতার আকার দিতে হয়, আর সেগুলোকে একমাত্র যুক্তিসম্মত, সর্বব্যাপী বলবৎ ভাব-ধারণা হিসেবে চিত্রিত করতে হয়। যে-শ্রেণী বিপ্লব করে সেটা, অন্যান্য দিক ছাড়াও, একটা **শ্রেণীর** বিরুদ্ধতা করে শুধু এই কারণেই সেটা একেবারে শুরু থেকেই একটা শ্রেণী হিসেবে নয়, সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতীয়মান হয়; একক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান সমগ্র সমাজ হিসেবে সেটা প্রতীয়মান হয়।* সেটা এমনটা করতে পারে তার কারণ হল এই যে, শুরুতে সেটার স্বার্থ বাস্তবিকই যেগুলি শাসক নয় এমন সমস্ত শ্রেণীর সাধারণী স্বার্থের সঙ্গেই বেশি পরিমাণে সংশ্লিষ্ট, তার কারণ এই যে, তদবধি বিদ্যমান পরিবেশের চাপে সেটার স্বার্থ তখনও একটা বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ একটা স্বার্থ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে নি। কাজেই, অন্যান্য শ্রেণীর যেসব ব্যক্তি-মানুষ প্রাধান্যের অবস্থান লাভ করছে না এমন অনেকে লাভবান হয় সেটার জয়ের ফলে, কিন্তু তা শুধু এই পরিমাণে যাতে সেটা ঐসব ব্যক্তিকে শাসক শ্রেণীর মধ্যে উন্নীত হবার অবস্থায় স্থাপন করে। ফরাসী বুর্জোয়ারা যখন অভিজাতকুলের ক্ষমতা উচ্ছেদ করেছিল, তার ভিতর দিয়ে তারা বহু প্রলেতারিয়ানের প্রলেতারিয়েতের উপরে উঠে যাওয়া সম্ভব করেছিল, কিন্তু সেটা শুধু এই পরিমাণে যে, ঐসব প্রলেতারিয়ান হয়ে

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] সর্বজনীনতা নিম্নলিখিত উপাদানগুলির প্রতিষঙ্গী হয়: (১) শ্রেণী বনাম রাষ্ট্র, (২) প্রতিযোগিতা, পৃথিবীজোড়া সংসর্গ, ইত্যাদি, (৩) শাসক শ্রেণীর বিপুল সংখ্যাশক্তি, (৪) সাধারণী স্বার্থের বিভ্রম (গোড়ায় বিভ্রান্তিটা যথার্থভিহিত), (৫) ভাবাদর্শবিদদের আত্মপ্রবঞ্চনা এবং শ্রমবিভাগ।

গিয়েছিল বুর্জোয়া। কাজেই, প্রত্যেকটা নতুন শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে পূর্ববর্তী শাসক শ্রেণীর চেয়ে শুধু বিস্তৃততর ভিত্তিতে, কিন্তু পক্ষান্তরে, নতুন শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে-শ্রেণী শাসক নয় সেটার প্রতিযোগ পরে আরও তীব্র এবং প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। উভয় ব্যাপার থেকে এমনটা দাঁড়ায় যে, এই নতুন শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম পরিচালিত হয় সেটার বেলায় লক্ষ্যটা হয় [৩৩] পূর্ববর্তী সমস্ত শ্রেণী যারা শাসক হবার চেষ্টা করেছিল তারা যতটা পেরেছিল তার চেয়ে বেশি নিশ্চিত এবং মূলগতভাবে সমাজের পূর্ববর্তী পরিবেশের নাস্তিকরণ।

কোন একটা শ্রেণীর শাসন যেন শুধু কোন কোন ভাব-ধারণার শাসন, এই গোটা ঢঙটা স্বাভাবিকভাবে খতম হয় অবশ্য যেইমাত্র যে-রূপে সমাজটা সংগঠিত সেটা সাধারণভাবে আর শ্রেণীগত শাসন থাকে না, অর্থাৎ কিনা, যেইমাত্র বিশেষ একটা স্বার্থকে সাধারণ হিসেবে কিংবা 'সাধারণী স্বার্থকে' শাসক হিসেবে জাহির করার আবশ্যকতা আর থাকে না।

শাসক ব্যক্তিদের থেকে এবং, সর্বোপরি, উৎপাদন-প্রণালীর কোন একটা নির্দিষ্ট পর্ব থেকে উদ্ভূত সম্পর্কতন্ত্র থেকে শাসক ভাব-ধারণাকে যেইমাত্র পৃথক করে ধরা হয়, আর এইভাবে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ইতিহাস সবসময়েই ভাব-ধারণার প্রভাবাধীন, তখন এইসব বিভিন্ন ভাব-ধারণা থেকে 'অনন্য ভাব', ধারণা, ইত্যাদিকে ইতিহাসে প্রাধান্যশালী শক্তি হিসেবে পৃথক করে নেওয়া, এবং এইভাবে এই সমস্ত পৃথক পৃথক ভাব আর ধারণাকে ইতিহাসে উদ্ভূত-হতে-থাকা অনন্য ধারণার পক্ষে 'আত্মনির্ধারণের বিভিন্ন রূপ' হিসেবে ধরা খুবই সহজ। তখন স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তটাও আসে যে, মানুষের সমস্ত সম্পর্কের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় মানুষ সংক্রান্ত ধারণা থেকে — সে মানুষ হল যেমনটা কল্পিত, মানুষের সারমর্ম, **মানুষ**। এটা করেছেন দূরকল্পী দার্শনিকেরা। 'Geschichtsphilosophie'-এর শেষে হেগেল নিজেই কবুল করেছেন, 'বিবেচনা করেছি কেবল **ধারণার** অগ্রগতি', তিনি ইতিহাসে তুলে ধরেছেন 'সাচ্চা theodicy'* (৪৪৬ পৃঃ)। এই অবস্থায় ফেরা যায় 'ধারণা'

* [গ্রীক theos, ঈশ্বর + dikē, ন্যায়] অমঙ্গলের অস্তিত্ব থেকে ঐশ ন্যায়পরতা প্রতিপাদন। — অনুঃ

যারা পয়দা করে তাদের কাছে তত্ত্ববিদ, ভাবাদর্শবিদ আর দার্শনিকদের কাছে — আর তখন এই সিদ্ধান্ত হয় যে, দার্শনিকেরা, ভাবুকেরা সর্বকালে ইতিহাসে প্রাধান্যশালী: যে-সিদ্ধান্তটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতঃপূর্বে ব্যক্ত করেছেন হেগেল (২৫)।

ইতিহাসে জীবাত্মার প্রাধান্য (স্টির্নার এটাকে বলেন ক্রমবিভাগতন্ত্র, hierarchy) প্রমাণ করার গোটা কৌশলটা এইভাবে নিম্নলিখিত তিনটে প্রচেষ্টায় গণ্ডিবদ্ধ।

[৩৪] ১ নং। প্রায়োগিক কারণে, প্রায়োগিক পরিবেশে এবং প্রায়োগিক ব্যক্তি হিসেবে যারা শাসন করে তাদের ভাব-ধারণাকে পৃথক করে নিতে হবে এইসব বাস্তবিক শাসকদের থেকে, আর এইভাবে মেনে নিতে হবে ইতিহাসে ভাব-ধারণার বা বিভিন্ন বিভ্রান্তির শাসন।

২ নং। ভাব-ধারণার এই শাসনের মধ্যে একটা অনুযায়িতা স্থাপন করতে হবে, পরম্পরাগত শাসক ভাব-ধারণাগুলির মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় সংযোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে, সেটা হাসিল করা হয় সেগুলিকে 'ধারণার পক্ষে আত্মনির্ধারণের কৃতি' হিসেবে উপলব্ধি ক'রে (এটা সম্ভব, তার কারণ এইসব ভাব-ধারণার প্রায়োগিক ভিত্তি থাকার দরুন সেগুলি বাস্তবিকই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, আরও কারণ এই যে, **নিছক** ভাব-ধারণা হিসেবে কল্পিত হওয়ায় সেগুলি হয়ে ওঠে বিভিন্ন আত্ম-স্বাতন্ত্র্য, চিন্তনের সাহায্যে সৃষ্টি-করা স্বাতন্ত্র্য।

৩ নং। এই 'আত্মনির্ধারক ধারণাটার' অতীন্দ্রিয় চেহারাটা দূর করার জন্যে সেটাকে একটা সত্তায় — 'আত্মচেতনায়' — রূপান্তরিত করা হয়, কিংবা সম্যক ভৌতিক রূপ দেবার জন্যে সেটাকে রূপান্তরিত করা হয় একটা সত্তাশ্রেণীতে, যারা ইতিহাসে 'ধারণার' স্থানাপন্ন হয়, রূপান্তরিত করা হয় বিভিন্ন 'ভাবুকে', 'দার্শনিকে', ভাবাদর্শবিদে, যাদের আবার ধরা হয় ইতিহাসের কারিগর হিসেবে, 'অভিভাবক পরিষদ' হিসেবে, শাসকগণ হিসেবে।* এইভাবে ভৌতিক উপাদানগুলির সাকল্যটাকে ইতিহাস থেকে অপসারিত করা হয়, তখন দূরকল্পী ঘোড়াটার রাশ ঢিলে করে দেওয়া যায় পুরোপুরি।

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] মানুষ= 'বিচারশক্তিসম্পন্ন মানব-জীবাত্মা'।

জার্মানিতে আধিপত্য করছিল এই যে ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী সেটাকে এবং বিশেষত সেটার কারণটাকে বুঝতে হবে সাধারণভাবে ভাবাদর্শবিদদের বিভ্রান্তির সঙ্গে, অর্থাৎ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, রাজনীতিকদের (তাদের মধ্যে কার্যক্ষেত্রের রাষ্ট্রনায়কদেরও) বিভ্রান্তিগুলোর সঙ্গে সেটার সংযোগ থেকে, এইসব লোকের মতান্ধ স্বপ্নচারণা আর বিকৃতিগুলো থেকে; জীবনে তাদের বাস্তব অবস্থান, তাদের কাজ এবং শ্রমবিভাগ থেকে এটার ব্যাখ্যা মেলে অতি সহজেই।

[৩৫] যেখানে গতানুগতিক জীবনে কেউ যেমনটা ব'লে ভান করে, আর সে আসলে যা, তার মধ্যে পার্থক্যটা প্রত্যেকটি দোকানদার বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারে, আমাদের ইতিহাসকারেরা এমনকি এই মামুলি অন্তর্দৃষ্টিটাও এখনও লাভ করেন নি। প্রত্যেকটা যুগের বক্তব্যটাকে তাঁরা আক্ষরিক অর্থেই মেনে নেন, আর সেটা যা বলে এবং কল্পনা করে নিজের সম্বন্ধে সেটাকে তাঁরা যথার্থ বলে বিশ্বাস করেন।

[৪]

[১। উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহ এবং মালিকানার বিভিন্ন রূপ]

...|* [৪০] প্রথমটা থেকে উদ্ভূত হয় উঁচু মাত্রায় গড়ে-ওঠা শ্রমবিভাগ এবং ব্যাপক বাণিজ্যের পত্তন; দ্বিতীয়টা থেকে উদ্ভূত হয় স্থানীয়তা। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মনুষ্যগণকে একত্রে জড়ো করা চাই, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — তারা উৎপাদনের নির্দিষ্ট হাতিয়ারখানার পাশাপাশি পড়ে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোরই মতো।

এখানে তাহলে উৎপাদনের স্বাভাবিক হাতিয়ারগুলো এবং সভ্যতার সৃষ্টি করা হাতিয়ারগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখা দিচ্ছে। খেতকে (জল, ইত্যাদি) উৎপাদনের একটা স্বাভাবিক হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে, উৎপাদনের স্বাভাবিক হাতিয়ারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মনুষ্যগণ প্রকৃতির

* এখানে পাণ্ডুলিপির চারটে পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। — সম্পাঃ

অধীন; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — কোন একটা শ্রমফলের অধীন। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রে মালিকানা (ভূমি-সম্পত্তি) দেখা দেয় সরাসর প্রাকৃতিক আধিপত্য হিসেবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — শ্রমের, বিশেষত পুঞ্জিত শ্রমের, পুঁজির আধিপত্য হিসেবে। প্রথম ক্ষেত্রটায় ধরেই নিতে হয় যে, ব্যক্তি-মনুষ্যগণ সম্মিলিত থাকে কোন বন্ধনী দিয়ে: পরিবার, গোষ্ঠী, ভূমি আপনিই, ইত্যাদি; দ্বিতীয় ক্ষেত্রটায় ধরেই নিতে হয় যে, তারা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র, তারা একত্র থাকে শুধু বিনিময় দিয়ে। প্রথম ক্ষেত্রে — প্রধানত যা সংশ্লিষ্ট সেটা হল মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে বিনিময়, যাতে মানুষের শ্রমের বিনিময় হয় প্রকৃতির উৎপাদের বাবত; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হল প্রধানত মানুষের নিজেদের মধ্যে বিনিময়। প্রথম ক্ষেত্রে গড়, মানবীয় কান্ডজ্ঞানই যথাপ্রয়োজনীয় — কায়িক কর্মবৃত্তি তখনও মানসিক কর্মবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কায়িক আর মানসিক শ্রমের মধ্যে বিভাগ ইতঃপূর্বে কার্যত নিষ্পন্ন। প্রথম ক্ষেত্রে — নাস্তিমানদের উপর অস্তিমানদের আধিপত্যের ভিত্তি হতে পারে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সম্প্রদায় গোছের কিছু; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেটা নিশ্চয়ই একটা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ভৌত আকার ধারণ করে, সেটা হল অর্থ। প্রথম ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প থাকে, কিন্তু উৎপাদনের স্বাভাবিক হাতিয়ার কাজে লাগান দিয়ে সেটা নির্ধারিত হয়, কাজেই বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে শ্রম-বণ্টন ছাড়াই; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিল্প থাকে কেবল শ্রমবিভাগের মাঝে এবং সেটার মারফত।

[৪১] এযাবত আমাদের পরীক্ষা-অনুসন্ধান শুরু হয়েছে উৎপাদনের হাতিয়ার থেকে, আর ইতোমধ্যে দেখান হয়েছে যে, কোন কোন শিল্প-পর্বে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল অপরিহার্য। Industrie extractive-এ এখনও ব্যক্তিগত মালিকানা হল শ্রমের সমস্থানিক; ক্ষুদ্র শিল্পে এবং এখন অবধি সমস্ত কৃষিকাজে মালিকানা হল উৎপাদনের বিদ্যমান হাতিয়ারগুলির অপরিহার্য পরিণতি; বৃহৎ শিল্পে উৎপাদনের হাতিয়ার এবং ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতি দেখা দেয় প্রথম, আর সেটা হল বৃহৎ শিল্পের উৎপাদ; অধিকন্তু, এই দ্বন্দ্ব-অসংগতিটাকে পয়দা করতে হলে বৃহৎ শিল্প অগ্রসর হওয়া চাই উঁচু মাত্রায়। এইভাবে, বৃহৎ শিল্প হলে, একমাত্র তবেই ব্যক্তিগত মালিকানার লুপ্তি সম্ভব হয়ে ওঠে।

[২। ভৌত আর মানসিক শ্রমের বিভাগ। শহর আর গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছেদ। গিল্ড-ব্যবস্থা]

ভৌত আর মানসিক শ্রমের সবচেয়ে মস্ত বিভাগ হল শহর আর গ্রামাঞ্চলের বিভাগ। শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিরোধ শুরু হয় আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতায়, গোষ্ঠী থেকে রাষ্ট্রে, স্থানীয়তা থেকে জাতিতে উত্তরণ দিয়ে, আর সেটা চলে আসছে এখনকার দিন অবধি সভ্যতার সমগ্র ইতিহাসের ভিতর দিয়ে [শস্য-আইনবিরোধী লীগ (২৬)]।

শহর থাকলে একই সঙ্গে বোঝায় সেটার বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অপরিহার্য উপাদান — প্রশাসন, পুলিস, কর, ইত্যাদি, এককথায়, পৌরসংঘ, এবং তার থেকে সাধারণভাবে রাজনীতি। এখানে প্রথম স্পষ্টপ্রতীয়মান হয় দুটো মস্ত শ্রেণীতে জনসমষ্টির বিভাগ, যেটার সরাসর ভিত্তি হল শ্রমবিভাগ এবং উৎপাদনের হাতিয়ার। শহর হল ইতোমধ্যে বাস্তবিকপক্ষে জনসমষ্টি, উৎপাদনের হাতিয়ার, পুঁজি, আমোদপ্রমোদ, চাহিদার সমাহরণকেন্দ্র, আর গ্রামাঞ্চলে প্রকটিত হয় সেটার বিপরীত অবস্থাটা — বিচ্ছিন্নতা আর পৃথকীকরণ। শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার বিরোধ থাকতে পারে কেবল ব্যক্তিগত মালিকানার কাঠামের ভিতরে। এটা হল শ্রমবিভাগের কাছে, ব্যক্তি-মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া একটা ধরা-বাঁধা কর্মবৃত্তির কাছে তার অধীনতার অতি উৎকট অভিব্যক্তি — এই অধীনতা একজনকে গণ্ডিবদ্ধ শহুরে প্রাণীতে পরিণত করে, অন্য জনকে পরিণত করে গণ্ডিবদ্ধ গ্রামীণ প্রাণীতে, আর প্রতিদিন নতুন করে পয়দা করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের সংঘাত। শ্রমই এখানেও আবার মুখ্য বস্তুটা, ব্যক্তি-মানুষের **উপর** ক্ষমতা, শেষোক্তটা যতকাল বিদ্যমান ততকাল নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকবে ব্যক্তিগত মালিকানা। শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার বিরোধের লুপ্তি হল [৪২] সাধারণী জীবনের প্রথম পূর্বশর্তগুলোর একটা, যে-পূর্বশর্তটা আবার নির্ভর করে একগাদা ভৌত পত্তনের উপর, সেটা মিটতে পারে না স্রেফ ইচ্ছা দিয়ে, যা যে-কেউ দেখতে পারে প্রথম নজরেই। (এইসব পূর্বশর্তের দফাওয়ারী বিবরণ এখনও দেওয়া হয় নি।) শহর আর গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছেদটাকে আরও ধরা যেতে পারে পুঁজি আর ভূমি-সম্পত্তির বিচ্ছেদ হিসেবে,

ভূমি-সম্পত্তি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পুঁজির অস্তিত্ব আর সম্প্রসারণের সূচনা হিসেবে — কেবল শ্রম আর বিনিময় যেটার ভিত্তি সেই মালিকানার সূচনা।

মধ্যযুগের শহরগুলি কোন পূর্ববর্তী কালপর্যায় থেকে তৈরি অবস্থায় আসে নি, সেগুলিকে নতুন করে গড়েছিল মুক্তি-পাওয়া ভূমিদাসেরা, সেইসব শহরে প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষ ধরনের শ্রম ছিল তার একমাত্র সম্পত্তি, আর তাছাড়া ছিল তার সঙ্গে আনা সামান্য পুঁজি, যেটা প্রায় সম্পূর্ণতই ছিল তার বৃত্তির অত্যাবশ্যক হাতিয়ার। অবিরাম শহরে পালিয়ে আসা ভূমিদাসদের প্রতিযোগিতা, শহরগুলোর বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের অবিরাম যুদ্ধ এবং তার থেকে পৌরসংঘাধীন সংগঠিত সামরিক শক্তির আবশ্যকতা, কোন বিশেষ ধরনের শ্রমের ক্ষেত্রে এজমালি মালিকানার বন্ধনী, যখন কারিগররা ছিল আবার ব্যাপারীও সেই অবস্থায় তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্যে সাধারণী ঘর-বাড়ির আবশ্যকতা, আর তার ফলস্বরূপে এইসব ঘর-বাড়ি থেকে অনধিকারীদের বাদ দেওয়া, বিভিন্ন বৃত্তির স্বার্থের মধ্যে সংঘাত, তাদের কষ্টার্জিত দক্ষতা নিরাপদ করার আবশ্যকতা, এবং গোটা দেশের সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন: এইগুলি ছিল প্রত্যেকটা বৃত্তির শ্রমিকদের গিল্ডে সম্মিলিত হবার কারণ। পরবর্তী ইতিহাসক্রমিক ঘটনাবলির ভিতর দিয়ে গিল্ড-ব্যবস্থায় যে বহুবিধ অদলবদল দেখা দেয় তা নিয়ে আমাদের এখানে আর আলোচনা করা আবশ্যক নয়। ভূমিদাসদের পালিয়ে শহরে চলে যাওয়াটা অবিরাম চলেছিল গোটা মধ্যযুগ জুড়ে। গ্রামাঞ্চলে মনিবদের হাতে নির্যাতিত এইসব ভূমিদাস শহরে গিয়েছিল আলাদা-আলাদা, শহরে তারা দেখতে পেয়েছিল সংগঠিত সম্প্রদায়, তার বিরুদ্ধে তারা ছিল ক্ষমতাহীন সেখানে তাদের শ্রমের জন্যে চাহিদা এবং তাদের সংগঠিত শহুরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্বার্থ অনুসারে যে-বৃত্তি নির্দেশ করা হয়েছিল সেটায় তাদের অধীন হতে হয়েছিল। আলাদা-আলাদা এসে এইসব শ্রমিক কখনও কোন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে নি, কেননা যা শিখে নিতে হয় এমন গিল্ড ধরনের যদি হত তাদের কাজ, সেক্ষেত্রে গিল্ডের কর্তারা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে তাদের বশ্যতা স্বীকার করাত এবং তাদের সংগঠিত করত নিজেদের স্বার্থ অনুসারে; নইলে, যা শিখে নিতে হয় এমন যদি না হত তাদের কাজ, কাজেই তাদের কাজ যদি না হত গিল্ড ধরনের, তাহলে তারা হয়ে যেত দিনমজুর, তারা কখনও সংগঠিত হয়ে উঠতে

পারে নি, অসংগঠিত জনতা হয়েই থেকে গেছে। শহরগুলিতে দিনমজুরের প্রয়োজন ছিল, সেটাই সৃষ্টি করেছিল এই জনতা।

এইসব শহর ছিল যথাভিহিত 'পারিমেল' (২৭), সেগুলো পয়দা হয়েছিল সরাসর [৪৩] প্রয়োজন অনুসারে — সম্পত্তি নিরাপদ করার ব্যবস্থার জন্যে, আর উৎপাদনের উপকরণ বহুলীকরণ এবং পৃথক পৃথক সদস্যদের রক্ষাব্যবস্থার জন্যে উৎকণ্ঠা থেকে। এইসব শহরের এই জনতার কোন ক্ষমতা ছিল না; তারা ছিল পরস্পরের অচেনা, শহরে গিয়েছিল আলাদা-আলাদা; যুদ্ধের জন্যে সশস্ত্র এবং তাদের উপর সন্দিগ্ধভাবে নজর-রাখা একটা সংগঠিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে তারা ছিল অসংগঠিত। জার্নিম্যান এবং শিক্ষানবিসরা প্রত্যেকটা বৃত্তিতে সংগঠিত হত যেমনটা কর্তাদের স্বার্থের দিক থেকে সবচেয়ে উপযোগী। তাদের এবং তাদের কর্তাদের মধ্যকার গোষ্ঠীপতিতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে ঐ কর্তারা পেত দ্বিবিধ ক্ষমতা — একদিকে, জার্নিম্যানদের সমগ্র জীবনের উপর তাদের প্রভাবের কারণে, আর অন্যদিকে এই কারণে যে, একই কর্তার অধীনে কাজ করত যেসব জার্নিম্যান, তাদের পক্ষে সেটা ছিল একটা যথার্থ বন্ধনী, যেটা অন্যান্য কর্তাদের জার্নিম্যানদের বিরুদ্ধে তাদের একত্র করে রাখতে এবং এদের থেকে তাদের পৃথক করে ফেলত। শেষে, নিজেরাই কর্তা হয়ে উঠবে, স্রেফ এই আগ্রহটা দিয়ে জার্নিম্যানরা বাঁধা থাকত বিদ্যমান ব্যবস্থাটার সঙ্গে। কাজেই, সমগ্র পৌরসংঘ ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে জনতা অন্তত বিভিন্ন বিদ্রোহ করেছিল, তাদের ক্ষমতাহীনতার দরুন সেসব বিদ্রোহ একেবারেই অকার্যকর থেকে গিয়েছিল, জার্নিম্যানরা কিন্তু পৃথক পৃথক গিল্ডের ভিতরে বিভিন্ন ছোটখাটো অবাধ্যতার চেয়ে বেশি কিছু করে নি, তেমন অবাধ্যতা গিল্ড-ব্যবস্থার একেবারে প্রকৃতিরই অঙ্গ-উপাদান। মধ্যযুগের মস্ত মস্ত সমস্ত অভ্যুত্থানেরই উদ্ভবকেন্দ্র ছিল গ্রামাঞ্চল, কিন্তু কৃষকদের বিচ্ছিন্নতা এবং সেটা থেকে পয়দা-হওয়া তাদের আনাড়িপনার দরুন সেগুলি সমানই একেবারেই অকার্যকর থেকে গিয়েছিল।

এইসব শহরে পুঁজি ছিল স্বাভাবিকভাবে পাওয়া পুঁজি — একটা বাসস্থান, সংশ্লিষ্ট বৃত্তির হাতিয়ারগুলো আর স্বাভাবিক, বংশগত খদ্দেরদের নিয়ে ছিল সেই পুঁজি; বাণিজ্যের অনগ্রসরতা এবং প্রচলনের ঊনতার দরুন সেটাকে নগদ টাকায় পরিণত করা যেত না বলে সেটা বাপ থেকে বেটার

কাছে হস্তান্তরিত হত। আধুনিক পুঁজির মূল্য স্থির করা যায় টাকায়, সেটাকে বিনিয়োগ করা যায় এখানে কিংবা সেখানে, তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু ঐ পুঁজি তেমন নয়, ঐ পুঁজি সরাসরি সংযুক্ত ছিল মালিকের বিশেষ ধরনের কাজের সঙ্গে, ছিল সেটা থেকে অবিচ্ছেদ্য, আর সেই পরিমাণে সেটা ছিল **স্থাবর** পুঁজি।

শহরগুলিতে পৃথক পৃথক গিল্ডের মধ্যে [৪৪] শ্রমবিভাগ তখন অবধি ছিল [একেবারে স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভূত],* আর গিল্ডগুলিতে সেটা পৃথক পৃথক শ্রমিকদের মধ্যে আদৌ গড়ে ওঠে নি। প্রত্যেকটি কারিগরকে গোটা একগুচ্ছ কাজে সুদক্ষ হতে হত, যাকিছু তৈরি করা দরকার ছিল সেইসবই তাকে তার হাতিয়ারগুলির দিয়ে তৈরি করতে সক্ষম হতে হত। গণ্ডিবদ্ধ বাণিজ্য এবং পৃথক পৃথক শহরের মধ্যে যৎসামান্য যোগাযোগ, জনসংখ্যার স্বল্পতা এবং সীমিবদ্ধ চাহিদার দরুন উচ্চতর মাত্রায় শ্রমবিভাগ গড়ে উঠতে পারে নি, কাজেই যারা কর্তা হয়ে উঠতে চাইত তাদের প্রত্যেককে নিজ গোটা বৃত্তিতে সুদক্ষ হতে হত। এইভাবে, মধ্যযুগীয় কারিগরদের মধ্যে দেখা যায় তাদের বিশেষ ধরনের কাজ এবং তাতে সুদক্ষতার প্রতি আগ্রহ, যেটা একটা সীমাবদ্ধ কলাবিদ্যাবোধে উন্নীত হতে পারত। ঠিক এই কারণেই কিন্তু মধ্যযুগের প্রত্যেকটি কারিগর একেবারেই ডুবে থাকত নিজের কাজে, এই কাজের সঙ্গে তার ছিল একটা বশংবদ দাসসুলভ সম্পর্ক, সেই কাজের অধীন থাকত আধুনিক শ্রমিকের চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে, আধুনিক শ্রমিকের কাজটা কী তাতে তার বড় একটা এসে যায় না।

[৩। আরও শ্রমবিভাগ। বাণিজ্য আর শিল্পের বিচ্ছেদ। বিভিন্ন শহরের মধ্যে শ্রমবিভাগ। ম্যানুফ্যাকচার**]

শ্রমবিভাগের পরবর্তী সম্প্রসারণ হল উৎপাদন আর বাণিজ্যের বিচ্ছেদ, একটা বিশেষ ব্যাপারী শ্রেণী গঠন; কোন পূর্ববর্তী কালপর্যায় থেকে চলে-

* এখানে পাণ্ডুলিপি খারাপ। — সম্পাঃ

** ম্যানুফ্যাকচার — শ্রমবিভাগ আর হাতে কাজের ভিত্তিতে সংগঠিত পুঁজিতান্ত্রিক কর্পোরেশন। পুঁজিতন্ত্রের আমলে বৃহদায়তন শিল্পের প্রাথমিক রূপ। — সম্পাঃ

আসা শহরগুলিতে এই বিচ্ছেদ এসেছিল উত্তরাধিকারসূত্রে (অন্যান্যের মধ্যে ইহুদিদের ক্ষেত্রে), আর সেটা শিগগিরই দেখা দিয়েছিল নতুন গড়া শহরগুলিতে। লাগাও অঞ্চলগুলি ছাড়িয়ে বাণিজ্যিক যোগাযোগের সম্ভাবনা দেখা দিল তার সঙ্গে সঙ্গে; এই সম্ভাবনাটাকে বাস্তবে পরিণত করা নির্ভর করত কয়েকটা বিষয়ের উপর: যোগাযোগের উপায়াদি যা ছিল; গ্রামাঞ্চলে জন-নিরাপত্তার অবস্থা, সেটা কতখানি তা নির্ভর করত রাজনৈতিক পরিবেশের উপর (এটা তো সুবিদিত যে, সমগ্র মধ্যযুগে ব্যাপারীরা যাতায়াত করত সশস্ত্র দলবদ্ধ হয়ে, ক্যারাভ্যানে); সংসর্গের পক্ষে অধিগম্য অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত স্থূল কিংবা অপেক্ষাকৃত মার্জিত চাহিদা (তা নির্ভর করত সেখানকার সাংস্কৃতিক মানের উপর)।

বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি হয়, শহরের লাগাও অঞ্চলগুলো ছাড়িয়ে ব্যাপারীদের মারফত বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় উৎপাদন আর বাণিজ্যের মধ্যে একটা পারস্পরিক ক্রিয়া। শহরগুলোর **পরস্পরের মধ্যে** সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এক শহর থেকে অন্য শহরে যায় নতুন নতুন হাতিয়ার, আর উৎপাদন এবং বাণিজ্যের মধ্যে বিচ্ছেদের ফলে অচিরেই নতুন উৎপাদন-বিভাগ পয়দা হয় [৪৫] পৃথক পৃথক শহরগুলির মধ্যে, তার প্রত্যেকটা শহর শিগগিরই শিল্পের একটা প্রাধান্যশালী শাখা কাজে লাগাতে থাকে। পূর্ববর্তী কালপর্যায়গুলির স্থানীয় বাধানিষেধগুলো ক্রমে ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

কোন একটা এলাকার উৎপাদন-শক্তিগুলো, বিশেষত উদ্ভাবনগুলো পরবর্তী বিকাশের বেলায় খোয়া যাবে কিনা সেটা নির্ভর করে স্রেফ বাণিজ্যের প্রসারের উপর। লাগাও অঞ্চলগুলো ছাড়িয়ে বাণিজ্য যতকাল থাকে না, প্রত্যেকটা উদ্ভাবন প্রত্যেকটা এলাকায় করতে হয় আলাদা-আলাদা, কোন অসভ্য জাতির অতর্কিত আক্রমণ, এমনকি মামুলি যুদ্ধবিগ্রহের মতো স্রেফ আকস্মিক ঘটনার ফলেই অগ্রসর উৎপাদন-শক্তি আর চাহিদা যার আছে এমন একটা দেশকে আবার নতুন করে শুরু করতে হয় একেবারে শুরু থেকেই। আদিম ইতিহাসে প্রত্যেকটা এলাকাকে প্রত্যেকটা উদ্ভাবন নতুন করে করতে হয়েছিল প্রতিদিন এবং স্বতন্ত্রভাবে। এমনকি অপেক্ষাকৃতভাবে খুবই ব্যাপক বাণিজ্য থাকলেও, উঁচু মাত্রায় উন্নীত উৎপাদন-শক্তিসমূহ একেবারে

ধ্বংস হয়ে যাবার বিপদ থেকে কত সামান্যই নিরাপদ তার প্রমাণ হল ফিনিশীয়রা*, — বাণিজ্য থেকে এই জাতিটা উচ্ছেদ হবার ফলে, আলেক্‌জান্ডরের দখল এবং তার পরিণতিতে জাতিটার অবনতির দরুন তাদের উদ্ভাবনগুলোর বেশির ভাগই দীর্ঘকাল যাবত লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তেমনি, দৃষ্টান্তস্বরূপ মধ্যযুগে কাচ-চিত্রণ। শুধু যখন বাণিজ্য হয়ে ওঠে বিশ্ব-বাণিজ্য এবং সেটার ভিত্তি হয় বৃহদায়তনের শিল্প, সমস্ত জাতি যখন গিয়ে পড়ে প্রতিযোগিতার সংগ্রামের মধ্যে, তখন আয়ত্ত-করা উৎপাদন-শক্তির স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

বিভিন্ন শহরের মধ্যে শ্রমবিভাগের সরাসর ফল হল ম্যানুফ্যাকচার জাতদ্রব্যসমূহের উদ্ভব, গিল্ড-ব্যবস্থার পরিধি ছাপিয়ে বেড়ে-ওঠা উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা। বৈদেশিক জাতিগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের ঐতিহাসিক পত্তনের আওতায় এইসব জাতদ্রব্যের ব্যাপক উৎপাদন হয়েছিল ইতালিতে এবং পরে ফ্ল্যান্ডার্সে। অন্যান্য দেশে, যেমন ইংলন্ডে আর ফ্রান্সে এইসব জাতদ্রব্য প্রথমে গণ্ডিবদ্ধ ছিল দেশীয় বাজারে। আগেই যা উল্লেখ করা হয়েছে সেইসব পত্তন ছাড়াও, এইসব জাতদ্রব্য নির্ভর করে জনসমষ্টির ইতোমধ্যে বর্ধিত সমাবেশের উপর, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, আর পুঁজি পুঞ্জিত হবার উপর, সেটা শুরু হয়েছিল বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে — গিল্ডের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও অংশত গিল্ডগুলিতে, আর অংশত ব্যাপারীদের মধ্যে।

[৪৬] যে-শ্রমে প্রথম থেকেই বোঝায় অতি আনাড়ি ধরনের হলেও যন্ত্রের আবশ্যকতা, সেটা অচিরেই দেখা গেল বিকশিত হবার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। আগে কৃষকেরা গ্রামাঞ্চলে কাপড় বুনত নিজেদের পোশাক জোটাবার জন্যে একটা আনুষঙ্গিক বৃত্তি হিসেবে — বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সর্বপ্রথমে তৎপরতা সৃষ্টি হল সেই শ্রমে, সেটা আরও সম্প্রসারিত হল। কাপড়বোনা ছিল এবং রয়ে গেল প্রধান ম্যানুফ্যাকচার। জনসংখ্যা বাড়ল; ত্বরিত প্রচলনের ফলে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে পুঞ্জিত এবং চলিত হল স্বাভাবিক পুঁজি; তার থেকে পয়দা হল বিলাসদ্রব্যের চাহিদা, সাধারণভাবে বাণিজ্যের ক্রমপ্রসার হল সেই চাহিদার পক্ষে অনুকূল — এই সবকিছুর ফলে পোশাক-পরিচ্ছেদের জন্যে কাপড়ের চাহিদা বেড়ে চলল, সেটা কাপড়বোনাতে জোগাল

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] মধ্যযুগে কাচ ম্যানুফ্যাকচার।

পরিমাণগত এবং গুণগত প্রোৎসাহন, যেটা কাপড়বোনার কাজটাকে সেটার তদবধি প্রচলিত ধরন থেকে টেনে বের করে নিল। কৃষকেরা কাপড় বুনত নিজেদের ব্যবহারের জন্যে, তারা সেই ধরনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, এখনও চালায়, শহরগুলিতে তাদের পাশাপাশি দেখা দিল একটা নতুন শ্রেণীর তাঁতিরা, তাদের বোনা কাপড় হল গোটা দেশীয় বাজারের জন্যে, আর সাধারণত বৈদেশিক বাজারের জন্যেও।

কাপড়বোনার কাজটায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দক্ষতা আবশ্যক হয় সামান্যই, এই বৃত্তিটা অচিরেই অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার সমগ্র প্রকৃতিটাই যা তাতে গিল্ডের বাধা-নিষেধগুলো এক্ষেত্রে ঢুকতে পারে নি। কাজেই কাপড়বোনা বেশির ভাগই চলত বিভিন্ন গ্রামে এবং বাজার-কেন্দ্রে, গিল্ড সংগঠন ছাড়াই, আর ঐসব গ্রাম আর বাজার-কেন্দ্র ক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছিল শহর — বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেকটা দেশে সবচেয়ে বাড়-বাড়ন্তের শহর।

গিল্ড থেকে মুক্ত ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে সঙ্গে মালিকানার সম্পর্কও দ্রুত বদলে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত স্থাবর পুঁজির পরিধি ছাড়িয়ে প্রথম অগ্রগতিটা ছিল এই যে, এমনসব ব্যাপারীরা দেখা দিল যাদের পুঁজি শুরু থেকেই ছিল অস্থাবর, আধুনিক অর্থের পুঁজি — অবশ্য তখনকার কালের পরিস্থিতি অনুসারে যতখানি বলা যেতে পারে সেই পরিমাণে আধুনিক অর্থের পুঁজি। দ্বিতীয় অগ্রগতি ঘটল ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে সঙ্গে, তাতেও আবার এক-রাশ পুঁজি চলতি হয়ে উঠল, আর সব মিলিয়ে অস্থাবর পুঁজির রাশিটা হয়ে দাঁড়াল স্বাভাবিক পুঁজিরাশির চেয়ে বেশি।

সেই একসঙ্গেই ম্যানুফ্যাকচার হল গিল্ড থেকে বাদ-পড়া কিংবা অল্প পারিশ্রমিক-পাওয়া কৃষকদের আশ্রয়স্থল, ঠিক যেমন আগে গিল্ড শহরগুলি আশ্রয়স্থল [হয়েছিল] [৪৭] [ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতকুলের পীড়ন থেকে পলাতক]* কৃষকদের জন্যে।

ম্যানুফ্যাকচারের সূত্রপাতের একসঙ্গেই এসেছিল একটা ভবঘুরেমির কালপর্যায়, সেটা ঘটেছিল এইসব কারণে: সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার চাকর-

---

* এখানে পাণ্ডুলিপি খারাপ। — সম্পাঃ

বাকর-পোষ্যদের দলগুলোকে লোপ করা হয়েছিল; ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে রাজাদের পক্ষে লড়ার যে-বাহিনীগুলো দলে-দলে লোকের ভিড়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল সেগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল; কৃষির উন্নতি ঘটেছিল, মস্ত মস্ত চাষের জমিকে করে ফেলা হয়েছিল পশুচারণভূমি। এই ভবঘুরেমি যে কতখানি নির্দিষ্টভাবেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেবল এই ব্যাপারটা থেকেও। অনেক আগে, সেই তের শতকেই দেখা যায় এইরকমের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন যুগ, তবে এই ভবঘুরেমি বহুবিস্তৃত এবং স্থায়ী হয়ে দেখা দিয়েছিল শুধু পনর শতকের শেষ আর ষোল শতকের গোড়ার দিকে। ভবঘুরেরা সংখ্যায় এতই বেশি ছিল যাতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডের ৮ম হেনরি তাদের ৭২০০০ জনকে ফাঁসি দিয়েছিল, তাদের কাজ করতে রাজি করানটা ছিল অত্যন্ত কঠিন, তা করা হত যখন সেটা ছাড়া কিছুতেই চলত না, আর সেক্ষেত্রেও তারা গোঁ ধরে বেয়াড়াপনা করত বিস্তর, তবে রাজি হত। ম্যানুফ্যাকচারের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে, বিশেষত ইংলন্ডে তারা ক্রমে কাজের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল।

ম্যানুফ্যাকচার জাতদ্রব্য দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা দিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক — বাণিজ্যের জন্যে কাড়াকাড়ি, যার নিষ্পত্তি হত যুদ্ধে এবং বিভিন্ন রক্ষণ-শুল্ক আর বাধা-নিষেধ দিয়ে — কিন্তু পক্ষান্তরে, আগে বিভিন্ন জাতি, যে-পরিমাণে তারা আদৌ সংশ্লিষ্ট ছিল তাতে, পরস্পরের সঙ্গে চালাত নিরীহ বিনিময়। তখন থেকে বাণিজ্যের একটা রাজনীতিক তাৎপর্য দেখা দিল।

ম্যানুফ্যাকচার দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আর মালিকের মধ্যকার সম্পর্ক বদলে গেল। গিল্ডগুলোতে জার্নিম্যান আর কর্তার মধ্যে গোষ্ঠীগত ধরনের সম্পর্ক বজায় রইল; ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে সেটার জায়গায় এল শ্রমিক আর পুঁজিপতির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক — গ্রামাঞ্চলে আর ছোট ছোট শহরে সেই সম্পর্কে গোষ্ঠীগত ধরনের একটা ছোপ বজায় রইল, কিন্তু বড়, আসল ম্যানুফ্যাকচারের শহরগুলিতে বেশ গোড়ার দিকেই সেটাতে গোষ্ঠীগত ধাঁচের প্রায় সবটাই ঘুচে গিয়েছিল।

বাণিজ্যের প্রসার বিপুল বেগ সঞ্চারিত করল ম্যানুফ্যাকচারে এবং সাধারণভাবে উৎপাদনের ধারায় — বাণিজ্যের এই প্রসার ঘটেছিল আমেরিকা

আবিষ্কার এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। সেখান থেকে আমদানি-করা নতুন নতুন জিনিস, বিশেষত রাশি-রাশি সোনা আর রুপো চলতি হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই বদলে গেল, একটা প্রচণ্ড আঘাত পড়ল সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পত্তি-মালিকানা এবং শ্রমিকদের উপর; এল ভাগ্যান্বেষীদের অভিযানগুলো, উপনিবেশ করা; আর, সর্বোপরি, বাজারগুলো সম্প্রসারিত হয়ে বিশ্ব-বাজারে পরিণত হওয়া তখন সম্ভব হয়ে উঠল এবং প্রতিদিনই সেটা অধিকতর পরিমাণে বাস্তব অবস্থা হয়ে উঠতে থাকল, পয়দা হল ইতিহাসক্রমিক বিকাশের [৪৮] একটা নতুন পর্ব, যেটা নিয়ে এখানে আমরা সাধারণভাবে আরও আলোচনা করতে পারি নে। সদ্য-আবিষ্কৃত দেশগুলিকে উপনিবেশে পরিণত করা হল, সেটা জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে কাড়াকাড়িতে নতুন ইন্ধন যোগাল, তদনুসারে সেই কাড়াকাড়ি আরও সম্প্রসারিত হল, সেক্ষেত্রে শত্রুতা বাড়ল।

বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচার সম্প্রসারিত হবার ফলে অস্থাবর পুঁজির সঞ্চয়ন ত্বরিত হল, কিন্তু পক্ষান্তরে, গিল্ডগুলিতে উৎপাদন প্রসারের প্রোৎসাহন ছিল না, সেগুলিতে স্বাভাবিক পুঁজি অপরিবর্তিত থেকে গেল কিংবা কমেই গেল। বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচার পয়দা করল বৃহৎ বুর্জোয়াদের; গিল্ডগুলিতে জড়ো হয়েছিল পেটি বুর্জোয়ারা, তারা শহরগুলিতে আগের মতো আর প্রাধান্যশালী রইল না, মস্ত মস্ত ব্যাপারী আর ম্যানুফ্যাকচারারদের প্রবল ক্ষমতার কাছে তাদের নতিস্বীকার করতে হল।* এইভাবে, ম্যানুফ্যাকচারের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে গিল্ডগুলির অবনতি ঘটল।

যে-যুগের কথা আমরা বলছি তখন জাতিগুলির মধ্যে সংসর্গের দুটো ধরন দেখা দিয়েছিল। প্রথমে চলতি সোনা আর রুপোর পরিমাণ কম ছিল বলে এই দুটো ধাতুর রপ্তানি নিষিদ্ধ হয়েছিল; আর শিল্প ছিল প্রধানত আমদানি-করা, শহরের জনসংখ্যা বেড়ে চলছিল, তাদের কাজ দেবার জন্যে শিল্প হয়ে পড়েছিল অত্যাবশ্যক, সেটা অবশ্য কেবল দেশীয় প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধেই নয়, প্রধানত বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে যেসব বিশেষ

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] পেটি বুর্জোয়ারা — মধ্য শ্রেণী — বৃহৎ বুর্জোয়ারা।

সুবিধা মঞ্জুর করা চলত সেগুলো ছাড়া শিল্পের চলছিল না। গিল্ডের স্থানীয় বিশেষ সুবিধাগুলো এইসব মৌলিক নিষেধাজ্ঞা হিসেবে প্রসারিত সারা দেশ জুড়ে। সামন্ততান্ত্রিক মনিবদের রাজ্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যেত যেসব ব্যাপারী তাদের কাছ থেকে ডাকাতির বিরুদ্ধে রক্ষণ-লেভি হিসেবে আদায়-করা নজরানা, যা পরে শহরগুলিতেও ধার্য হয়েছিল, সেটা থেকে কাস্টম্‌স শুল্কের উৎপত্তি — আধুনিক রাষ্ট্রগুলির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো হল কোষাগারে অর্থাগমের সবচেয়ে সিধে-সহজ উপায়।

ইউরোপীয় বাজারগুলিতে মার্কিন সোনা আর রুপো উঠল, শিল্পের ক্রমপ্রসার ঘটল, বাণিজ্য সম্প্রসারিত হল দ্রুত, তার ফলে দেখা দিল গিল্ডের বাইরেকার বুর্জোয়ারা আর অর্থ — এই সবকিছুর ফলে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলির অন্য একটা তাৎপর্য দেখা দিল। অর্থ ছাড়া রাজকার্য চালান প্রতিদিনই আরও দুষ্কর হয়ে উঠছিল — রাষ্ট্র তখন রাজস্বঘটিত বিবেচনা অনুসারে সোনা আর রুপো রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখল; এই যে অর্থরাশি বাজারে ছাড়া হল বুর্জোয়াদের পক্ষে ফটকায় খরিদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু — তারা পরম তুষ্ট হল এতে; আরও আগে চালু করা বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা হয়ে উঠল সরকারের আয়ের একটা উপায়, সেগুলোকে বিক্রি করে টাকা করা হতে থাকল; কাস্টম্‌সের আইন-কানুনের মধ্যে দেখা দিল রপ্তানি শুল্ক — সেটা শিল্পের পক্ষে শুধু বাধাদায়ক [হল] — সেটার [৪৯] উদ্দেশ্য ছিল নিছক রাজস্বঘটিত।

দ্বিতীয় কালপর্যায়টা সতর শতকের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়ে চলেছিল আঠার শতকের প্রায় শেষ অবধি। বাণিজ্য আর নৌচালনের প্রসার ঘটল ম্যানুফ্যাকচারের চেয়ে বেশি, ম্যানুফ্যাকচারের ভূমিকাটা হল গৌণ; ব্যবহারক হিসেবে উপনিবেশগুলি নগণ্য ছিল না; তখন বিশ্ব-বাজারের সূত্রপাত হচ্ছিল — সেটা বিভিন্ন দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। নৌচালনের নিয়ম-কানুন আর ঔপনিবেশিক একচেটেগুলো দিয়ে এই কালপর্যায়ের শুরু। বিভিন্ন শুল্ক, নিষেধ আর সন্ধিচুক্তি দিয়ে জাতিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা রহিত করা হল যতখানি সম্ভব; প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর কাড়াকাড়ি চালান হত এবং সেগুলোর ফয়সালা হত শেষ উপায় হিসেবে যুদ্ধ (বিশেষত নৌযুদ্ধ) দিয়ে। বাণিজ্যে আর

ম্যানুফ্যাকচারে প্রাধান্য বজায় রইল সবচেয়ে পরাক্রমশালী সামুদ্র জাতি ইংরেজদের। এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে একটা দেশে সমাহরণ দেখা যায়।

দেশীয় বাজারে বিভিন্ন রক্ষণ-শুল্ক দিয়ে, একচেটেগুলো দিয়ে ঔপনিবেশিক বাজারে, আর বিদেশে যথাসম্ভব বিভিন্ন প্রভেদক শুল্ক দিয়ে ম্যানুফ্যাকচারকে সবসময়ে নিরাপদ রাখা হত। দেশী মালমশলার আকারণে উৎসাহ দেওয়া হত (ইংলন্ডে পশম আর শণ, ফ্রান্সে রেশম), দেশী কাঁচামাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হত (ইংলন্ডে পশম), আর আমদানি-করা মালমশলার [আকারণ] অযত্ন করা হত কিংবা ঠেকান হত (ইংলন্ডে তুলো)। সাগরপথে বাণিজ্যে এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতায় প্রাধান্যশালী জাতিটার স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি পরিমাণগত আর গুণগত প্রসার ঘটেছিল ম্যানুফ্যাকচারেও। রক্ষণ-ব্যবস্থা ছাড়া ম্যানুফ্যাকচার চালান যেত না, কেননা অন্যান্য দেশে অতি সামান্য পরিবর্তন ঘটলেও সেটার বাজার খোয়া যেতে পারত, সেটা জেরবার হতে পারত; মোটামুটি অনুকূল পরিবেশে সেটাকে কোন দেশে চালু করা যেত, কিন্তু ঠিক এই কারণেই সেটা ধ্বংসও হয়ে যেতে পারত সহজেই। তার সঙ্গে সঙ্গে, গ্রামাঞ্চলে সেটাকে যে-প্রণালীতে চালান হত, বিশেষত আঠার শতকে, তাতে সেটা বিপুল ব্যক্তিসমষ্টির অত্যাবশ্যক সম্পর্কতন্ত্রের সঙ্গে এতই পরিমাণে বিজড়িত যে, কোন দেশ অবাধ প্রতিযোগিতা চলতে দিয়ে নিজ অস্তিত্ব বিপন্ন করতে সাহস করত না। যে-পরিমাণে সেটা রপ্তানি করে উঠতে পারত তাতে কাজেই সেটা ষোল-আনাই নির্ভর করত বাণিজ্যের প্রসার কিংবা গন্ডিবদ্ধতার উপর, আর অপেক্ষাকৃত সামান্য প্রতিক্রিয়াই খাটাত [বাণিজ্যের উপর]। আঠার শতকে তার থেকে আসে এটার গৌণ [গুরুত্ব] এবং [ব্যাপারীদের] প্রভাব। [৫০] রাষ্ট্রীয় রক্ষণ আর একেচেটের জন্যে অন্য কারও চেয়ে বেশি জিদ করত ব্যাপারীরা এবং বিশেষত জাহাজে চালানের কারবারীরাই; ম্যানুফ্যাকচার মালিকেরাও রক্ষণ দাবি করত এবং তা পেতও বটে, কিন্তু রাজনীতিক গুরুত্বে তারা সবসময়েই ব্যাপারীদের চেয়ে খাটো ছিল। বাণিজ্যিক শহরগুলি, বিশেষত উপকূলবর্তী শহরগুলি কিছু পরিমাণে সভ্য হয়ে উঠেছিল, সেগুলি পেয়েছিল বৃহৎ বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু কারখানা শহরগুলিতে চালু ছিল চূড়ান্ত পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি। তু. আইকিন (২৮) ইত্যাদি। আঠার

শতকটা ছিল বাণিজ্যের শতক। পিন্টো সেটা বলেছেন স্পষ্ট-নির্দিষ্টভাবে: 'Le commerce fait la marotte du siècle'*; আর: 'Depuis quelque temps il n'est plus question que de commerce, de navigation et de marine.'** (২৯)

পুঁজির চলন বেশকিছু পরিমাণে ত্বরিত হলেও সেটা তখনও কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধীর থেকে গিয়েছিল। বিশ্ব-বাজার পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এক-একটা ভাগকে কাজে লাগাচ্ছিল এক-একটা জাতি; জাতিগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা রহিত করা হয়েছিল; খাস উৎপাদনই ছিল আনাড়ি ধরনের, আর অর্থব্যবস্থা গোড়ার পর্বগুলো থেকে উদ্ভূত সবেমাত্র — এই সবকিছুর দরুন চলন ব্যাহত হচ্ছিল খুবই। সমস্ত ব্যাপারীদের আচরণে এবং বাণিজ্য চালাবার গোটা প্রণালীটাতে তখনও জড়িয়ে থাকা দরকষাকষি, ইতরামি আর ব্যয়কুণ্ঠা হল সেটার পরিণতি। ম্যানুফ্যাকচার মালিকদের সঙ্গে তুলনায়, এবং সর্বোপরি কারিগরদের সঙ্গে তুলনায় তারাই নিঃসন্দেহে ছিল বৃহৎ বুর্জোয়া; পরবর্তী কালপর্যায়ের ব্যাপারী আর শিল্পপতিদের সঙ্গে তুলনায় তারা পেটি বুর্জোয়া। তু. অ্যাডাম স্মিথ (৩০)।

এই কালপর্যায়ের আরও কয়েকটা বিশেষত্ব হল: সোনা আর রুপো রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা রদ এবং অর্থের মাধ্যমে বাণিজ্যের সূত্রপাত; ব্যাঙ্ক, জাতীয় ঋণ, কাগজী মুদ্রা; স্টক আর শেয়ারের ফাটকাবাজি এবং সমস্ত জিনিসে ফাটকা-ব্যবসা; সাধারণভাবে অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন। পুঁজিতে তখনও এঁটে ছিল যে স্বাভাবিক প্রকৃতি তার অনেকটা আবার নষ্ট হল।

[৪। সবচেয়ে জটিল শ্রমবিভাগ। বৃহৎ শিল্প]

একটা দেশে, ইংলন্ডে বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচারের সমাহরণ সতর শতকে দুর্নিবারভাবে সম্প্রসারিত হয়ে এই দেশটির জন্যে ক্রমে সৃষ্টি হল

---

* 'বাণিজ্য হল এই শতাব্দীর প্রচণ্ড বাতিক।' — সম্পাঃ

** 'কিছুকাল হল লোকে বলছে শুধু বাণিজ্য, নৌচলন আর নৌবাহিনী সম্বন্ধে।' — সম্পাঃ

একটা অপেক্ষাকৃত বিশ্ব-বাজার এবং তার ফলে এই দেশের ম্যান্যুফ্যাকচার জাতদ্রব্যের জন্যে এমন চাহিদা যা তখন অবধি বর্তমান শিল্পোৎপাদন-শক্তি দিয়ে আর মেটান যায় না। উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি ছাপিয়ে এই চাহিদাবৃদ্ধির ফলে পয়দা হল বৃহৎ শিল্প — শিল্পের কাজে কোন কোন প্রাকৃতিক শক্তির প্রয়োগ, যন্ত্রপাতি এবং অতি জটিল শ্রমবিভাগ — আর দেখা দিল মধ্যযুগের পরে [৫১] ব্যক্তিগত মালিকানার তৃতীয় কালপর্যায়। এই নতুন পর্বের অন্যান্য পূর্বশর্ত ইংলন্ডে ছিল আগে থেকেই: জাতীয় পরিধির ভিতরে অবাধ প্রতিযোগিতা, তত্ত্বগত বলবিদ্যার উন্নয়ন, ইত্যাদি। (প্রকৃতপক্ষে, নিউটনের পূর্ণাঙ্গ করা বলবিদ্যা ছিল আঠার শতকের ফ্রান্সে আর ইংলন্ডে জনসাধারণ্যে একেবারে সবচেয়ে প্রচলিত বিজ্ঞান।) (জাতীয় পরিধির ভিতরে অবাধ প্রতিযোগিতা জিতে নিতে হয়েছিল বিপ্লবের সাহায্যে — ১৬৪০ আর ১৬৮৮ সালে ইংলন্ডে, ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে।)

যারা নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকা বজায় রাখতে চেয়েছিল এমন প্রত্যেকটা দেশ প্রতিযোগিতার ফলে ম্যান্যুফ্যাকচার জাতদ্রব্য রক্ষণের জন্যে নতুন নতুন কাস্টম্‌সের নিয়ম-কানুন চালু করতে (বৃহৎ শিল্পের বিরুদ্ধে পুরন শুল্কগুলো আর কার্যকর ছিল না) এবং একটু পরেই বিভিন্ন রক্ষণ-শুল্কের আওতায় বৃহৎ শিল্প চালু করতে বাধ্য হয়েছিল। বৃহৎ শিল্প প্রতিযোগিতাকে পৃথিবীব্যাপী করে তুলল এইসব রক্ষণ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও (এটা হল কার্যক্ষেত্রের অবাধ বাণিজ্য; রক্ষণ-শুল্ক হল একটা উপশমক-মাত্র, অবাধ বাণিজ্যের **ভিতরে** একটা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা), স্থাপন করল যোগাযোগের উপায়াদি এবং আধুনিক বিশ্ব-বাজার, বাণিজ্যকে করল সেই বাজারের অধীন, সমস্ত পুঁজিকে শিল্পগত পুঁজিতে রূপান্তরিত করল, আর এইভাবে ঘটাল পুঁজির দ্রুত চলন (আর্থ ব্যবস্থার উন্নয়ন) এবং কেন্দ্রীকরণ। পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতা দিয়ে বৃহৎ শিল্প সমস্ত ব্যক্তিকে তাদের কর্মশক্তি চরম মাত্রায় খাটাতে বাধ্য করল। বৃহৎ শিল্প যতখানি সম্ভব বিনষ্ট করল ভাবাদর্শ, ধর্ম, নৈতিকতা, ইত্যাদি, আর যেসব ক্ষেত্রে তা করতে পারল না সেগুলোকে করে তুলল প্রতীয়মান মিথ্যাধারণা। সমস্ত সভ্য জাতি এবং সেগুলির প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষকে তাদের চাহিদাগুলো মেটাবার জন্যে সারা পৃথিবীর মুখাপেক্ষী করে তুলল বৃহৎ শিল্প, এইভাবে খতম করল পৃথক পৃথক

জাতির আগেকার স্বাভাবিক একক-স্বাতন্ত্র্যটাকে — সেই পরিসরে সেটা বিশ্ব-ইতিহাস পয়দা করল সেই প্রথম। বৃহৎ পুঁজি প্রকৃতিবিজ্ঞানকে করল পুঁজির সেবক, আর শ্রমবিভাগের স্বাভাবিক প্রকৃতির শেষ ধাঁচটাকে ঘুচিয়ে দিল। শ্রমের অস্তিত্ব থাকতে যতখানি সম্ভব সেই পরিমাণে বৃহৎ শিল্প সাধারণভাবে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি খতম করে দিল, আর সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক সম্পর্ককে আর্থিক সম্পর্কে পরিণত করল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা শহরগুলির জায়গায় বৃহৎ শিল্প আনল রাতারাতি গজিয়ে-ওঠা বড় বড় আধুনিক নগরী। যেখানেই ঢুকল সেখানে সেটা বিভিন্ন কারিগরি এবং শিল্পের সমস্ত আগেকার পর্ব ধ্বংস করল। গ্রামাঞ্চলের উপর বাণিজ্যিক শহরগুলির চূড়ান্ত প্রাধান্য হাসিল করল বৃহৎ শিল্প। [এটার প্রথম পত্তন] হল স্বয়ংক্রিয় প্রণালী। [এটার উন্নয়ন] পয়দা করল এক-রাশ উৎপাদন-শক্তি, যেটার পক্ষে ব্যক্তিগত [মালিকানা]* হল ঠিক সেই পরিমাণে একটা বেড়ি [৫২] যে-পরিমাণে ম্যানুফ্যাকচারের বেলায় গিল্ড এবং উন্নতিশীল কারিগরির বেলায় ক্ষুদ্র গ্রামীণ কর্মশালা ছিল বেড়ি। ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার মধ্যে এইসব উৎপাদন-শক্তির উন্নয়ন হয়েছিল শুধু এক-পেশে, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো হয়ে পড়েছিল নাশক শক্তি; অধিকন্তু, এই ব্যবস্থার ভিতরে বহুসংখ্যক উৎপাদন-শক্তি প্রয়োগ করার আদৌ কোন স্থানই ছিল না। সাধারণভাবে বললে, বৃহৎ শিল্প সমাজে শ্রেণীগুলির মধ্যে একই সম্পর্ক পয়দা করল সর্বত্র, আর এইভাবে খতম করল বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। আর শেষে, যেখানে প্রত্যেকটা জাতির বুর্জোয়াদের পৃথক পৃথক জাতীয় স্বার্থ তখনও বজায় রইল, বৃহৎ শিল্প কিন্তু সৃষ্টি করল এমন একটা শ্রেণী যেটার স্বার্থ সব জাতিতে একই, আর যেটার পক্ষে জাতিসত্তা গেছে খতম হয়ে; যে-শ্রেণী পুরন দুনিয়ার ভারমুক্ত হয়ে গেছে যথার্থই, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেটা রয়েছে ঐ দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অবস্থানে। পুঁজিপতির সঙ্গে সম্পর্কটাকেই শুধু নয়, খাস শ্রমকেই শ্রমিকের পক্ষে অসহনীয় করে তোলে বৃহৎ শিল্প।

বৃহৎ শিল্প কোন একটা দেশের সমস্ত এলাকায় উন্নয়নের একই মাত্রায়

---

* পাণ্ডুলিপি খারাপ। — সম্পাঃ

ওঠে না, সেটা স্পষ্ট-প্রতীয়মান। এর ফলে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীগত আন্দোলন কিন্তু মন্দা হয়ে যায় না, তার কারণ বৃহৎ শিল্পের সৃষ্টি-করা প্রলেতারিয়ানরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব হাতে নিয়ে সমগ্র জনগণকে নিয়ে চলে তাদের সঙ্গে, মন্দা হয়ে যায় না তার আরও কারণ এই যে, বৃহৎ শিল্প থেকে বাদ-পড়া শ্রমিকদেরকে সেটা বৃহৎ শিল্পের আপনার শ্রমিকদের চেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় ফেলে দেয়। যেসব দেশে বৃহৎ শিল্প উন্নত সেগুলি কমবেশি না-শিল্পোন্নত দেশগুলির উপর অনুরূপ ক্রিয়া ঘটায়, সেটা এইদিক দিয়ে যে, পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য শেষোক্ত দেশগুলিকে ঠেলে নিয়ে যায় পৃথিবীজোড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইয়ের মধ্যে।

* * *

[উৎপাদনের] এইসব বিভিন্ন ধরন হল শ্রম-সংগঠনের, তাই মালিকানার বিভিন্ন ধরন মাত্র। প্রত্যেকটা কালপর্যায়ে বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তিসমূহের একটা সমন্বয় ঘটে — যে-পরিমাণে সেটা চাহিদার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

[৫। সমাজ-বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের ধরনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-অসংগতি]

আমরা দেখেছি, উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-অসংগতি অতীত ইতিহাসে ঘটেছে কয়েক বার, যদিও ভিত্তিটা তাতে বিপন্ন হয় নি, সেই দ্বন্দ্ব-অসংগতি প্রত্যেক বার বিপ্লব হয়ে ফেটে পড়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধারণ করেছে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক রূপ, যেমন সর্বাত্মক সংঘর্ষ, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ, চেতনার দ্বন্দ্ব-অসংগতি, ভাব-ধারণার লড়াই, ইত্যাদি, রাজনীতিক সংঘাত, ইত্যাদি। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ এইসব আনুষঙ্গিক রূপের একটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেটাকে ঐসব বিপ্লবের ভিত্তি বলে ধরতে পারে, সেটা খুব সহজই, কেননা যেসব লোক ঐসব বিপ্লব শুরু করেছিল তাদের সংস্কৃতির মাত্রা এবং ইতিহাসক্রমিক বিকাশের পর্ব অনুসারে ছিল নিজেদের কর্মবৃত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভ্রান্তি।

এইভাবে, আমাদের মতে, ইতিহাসে সমস্ত সংঘর্ষের উৎপত্তিস্থল হল উৎপাদন-শক্তি এবং [৫৩] সংসর্গের ধরনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-অসংগতি। প্রসঙ্গত বলি, কোন একটা দেশে এইসব দ্বন্দ্ব-অসংগতি একেবারে চরমে পৌঁছলে তবেই তার থেকে দেশটিতে সংঘর্ষ লাগে, এমনটা হতেই হবে তা নয়। আন্তর্জাতিক সংসর্গের প্রসারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে যে-প্রতিযোগিতা বাধে সেটাই শিল্পে-অনগ্রসর দেশগুলিতে অনুরূপ দ্বন্দ্ব-অসংগতি পয়দা করার পক্ষে যথেষ্ট (যেমন, জার্মানিতে অস্ফুট প্রলেতারিয়েতকে দৃষ্টিগোচর করল ইংরেজদের শিল্পের প্রতিযোগিতা)।

[৬। বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষে প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন শ্রেণী গঠন। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতির উদ্ভব। বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিভ্রমজনক সম্মিলনী এবং কমিউনিজমের আমলে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যথার্থ একত্ব। সম্মিলিত ব্যক্তিগণের ক্ষমতার কাছে সমাজের জীবনযাত্রার পরিবেশের বশবর্তিতা]

প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বুর্জোয়াদেরই শুধু নয়, বরং আরও বেশি পরিমাণে শ্রমিকদের — প্রতিযোগিতা তাদের একত্রিত করে, তা সত্ত্বেও। কাজেই এইসব ব্যক্তির সম্মিলিত হতে অনেক সময় লাগে, সেটা কেবল এই কারণে নয় যে, এই সম্মিলন শুধু স্থানীয় হতে না হলে, এজন্যে প্রথমে বৃহৎ শিল্পের পয়দা করা চাই আবশ্যক উপায়াদি, মস্ত মস্ত শিল্প-নগরী এবং সুলভ আর দ্রুত যোগাযোগ। কাজেই, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এই যেসব ব্যক্তি জীবনযাপন করে এই বিচ্ছিন্নতা যাতে প্রতিদিন পুনরুৎপন্ন হয় এমন সম্পর্কতন্ত্রের মাঝে, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থিত প্রত্যেকটা সংগঠিত শক্তিকে পরাস্ত করা যায় শুধু দীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। তার উলটোটা দাবি করার অর্থ হল ইতিহাসের এই নির্দিষ্ট যুগে প্রতিযোগিতা থাকবে না বলে দাবি করার শামিল, কিংবা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার অবস্থায় যে-সম্পর্কতন্ত্রের

উপর ব্যক্তি-মানুষের কর্তৃত্ব নেই সেটাকে তাদের মন থেকে বিতাড়িত করার দাবি করার শামিল।

ঘর-বাড়ি তৈরি করা। বর্বর অবস্থার মানুষের প্রত্যেকটা পরিবারের স্বভাবতই থাকে যাযাবরদের পৃথক পৃথক পারিবারিক তাঁবুর মতো নিজ স্বাভাবিক গুহা কিংবা কুঁড়েঘর। ব্যক্তিগত মালিকানার আরও প্রসারের ফলে এই পৃথক পৃথক পারিবারিক গৃহস্থালি আরও বেশি অপরিহার্য হয়েই পড়ে। কৃষিজীবী লোক-সমাজগুলির পক্ষে সাধারণ গৃহস্থালি হল জমিতে সাধারণী চাষ-বাসের মতো সমানই অসম্ভব। শহরগুলো গড়ে উঠল — সেটা হল একটা মস্ত অগ্রগতি। তবে, পৃথক পৃথক গৃহস্থালি অর্থনীতি লোপ করাটা ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা থেকে অবিচ্ছেদ্য — সমস্ত পূর্ববর্তী কালপর্যায়ে এইসব পৃথক পৃথক গৃহস্থালি অর্থনীতি লোপ করা অসম্ভব ছিল, সেটা স্রেফ এই কারণে যে, তার নিয়ামক বৈষয়িক পরিবেশ ছিল না। সাধারণী গৃহস্থালি অর্থনীতি স্থাপনের পূর্বশর্ত হল যন্ত্রপাতির উদ্ভব, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি এবং অন্যান্য বহু উৎপাদন-শক্তির প্রয়োগ — যেমন, জল-সরবরাহ, [৫৪] গ্যাসের আলো, স্টীমে তাপন, ইত্যাদি — তাছাড়া, শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার [বিরোধ] দূর করা। এইসব অবস্থা না থাকলে কোন সাধারণী অর্থনীতি আপনাতেই একটা নতুন উৎপাদন-শক্তি হত না; কোন বৈষয়িক ভিত্তি ছাড়াই নিছক তত্ত্বগত বনিয়াদে স্থাপিত সেই অর্থনীতি হত শুধু উদ্ভট একটা কিছু, সেটা শেষে হয়ে দাঁড়াত মঠীয় গোছের অর্থনীতির চেয়ে বেশি কিছু না। — যা সম্ভব ছিল সেটা দেখা যেতে পারে শহরগুলিতে যা ঘটেছিল ঘনবসতি এবং বিভিন্ন নির্দিষ্ট কাজের জন্যে নানা সাধারণী ঘরবাড়ি তৈরি করার ভিতর দিয়ে (জেলখানা, ব্যারাক, ইত্যাদি)। পৃথক পৃথক গৃহস্থালী অর্থনীতি লোপ করাটা যে পরিবার লোপ করা থেকে অবিচ্ছেদ্য, সেটা তো স্বতঃপ্রতীয়মান।

(প্রত্যেকে যা সে মোট তাইই হয়েছে রাষ্ট্রের দ্বারা, এই মর্মে সেন্ট মাক্সের বারংবার উক্তিটা, এবং বুর্জোয়া হল বুর্জোয়া প্রজাতির একটা

নমুনামাত্র, এই মর্মে উক্তিটা মূলত একই; বুর্জোয়া **শ্রেণীটা** যেন বিদ্যমান ছিল সেটা যেসব ব্যক্তিকে নিয়ে গড়া তাদের আগেই, এমনটাই ধরে নেওয়া হয় এই উক্তিতে*।)

মধ্যযুগে প্রত্যেকটা শহরে নাগরিকেরা ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতকুলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হতে বাধ্য হত নিজেদের গা বাঁচাবার জন্যে। বাণিজ্যের প্রসার এবং যোগাযোগ স্থাপিত হবার ফলে পৃথক পৃথক শহর অন্যান্য শহরকে চিনতে-জানতে পেরেছিল, এইসব শহরও একই শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা করছিল একই স্বার্থ। বার্গারদের বহু স্থানীয় সম্মিলনী থেকে শুধু ক্রমে ক্রমেই দেখা দিয়েছিল বার্গার **শ্রেণী**। বিদ্যমান সম্পর্কগুলোর সঙ্গে বার্গারদের দ্বন্দ্ব এবং ঐসব সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত শ্রম-প্রণালীর দরুন পৃথক পৃথক বার্গারের জীবনযাত্রার পরিবেশ হয়ে উঠেছিল তাদের সবার বেলায় অভিন্ন এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তি থেকে অনপেক্ষ পরিবেশ। বার্গাররা যে-পরিমাণে সামন্ততান্ত্রিক বাঁধনগুলো ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছিল, তাতে তারা সৃষ্টি করেছিল ঐ পরিবেশ, তারা সেটা সৃষ্টি করেছিল সেই পরিমাণে যতখানি সেটা নির্ধারিত হয়েছিল আগে থেকে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের বৈরিতা দিয়ে। পৃথক পৃথক শহরগুলো বিভিন্ন পরিমেল স্থাপন করতে শুরু করলে এই সাধারণী পরিবেশ শ্রেণীগত পরিবেশে পরিণত হয়েছিল। একই পরিবেশ, একই দ্বন্দ্ব-অসংগতি, একই স্বার্থ থেকে সর্বত্র পয়দা হয়েছিল মোটের উপর একই রকমের রীত-রেওয়াজ। বুর্জোয়াদের যা পরিবেশ তাতে সেটা আপনিই গড়ে ওঠে শুধু ক্রমে ক্রমে, শ্রমবিভাগ অনুসারে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং বিদ্যমান সমস্ত অস্তিমান শ্রেণীকে শেষপর্যন্ত আত্মভূত করে** (তার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আগেকার নাস্তিমান শ্রেণীর অধিকাংশকে এবং তদবধি অস্তিমান শ্রেণীর একাংশকে একটা নতুন শ্রেণী প্রলেতারিয়েতে পরিণত করে), আত্মভূত করে এই ব্যাপারে যে, সেটা বিদ্যমান সমস্ত সম্পত্তিকে শিল্পক্ষেত্রের কিংবা বাণিজ্যিক পুঁজিতে রূপান্তরিত করে।

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] দার্শনিকদের বেলায় শ্রেণীর **পূর্বকালীন অস্তিত্ব**।

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] শুরুতে সেটা আত্মভূত করে শ্রমের সেইসব শাখা যেগুলো রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত, আর তারপরে সমস্ত ± [কমবেশি] ভাবাদর্শগত বর্গ।

পৃথক পৃথক ব্যক্তি নিয়ে গড়ে ওঠে একটা শ্রেণী, সেটা শুধু এই ব্যাপারে যে, [৫৫] তাদের সবার একই লড়াই চালাতে হয় আর-একটা শ্রেণীর বিরুদ্ধে; অন্য ব্যাপারে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরস্পরের প্রতি বৈরভাবাপন্ন। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনায় শ্রেণীটার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখা দেয়, যাতে ব্যক্তিরা পড়ে যায় অস্তিত্বের পূর্বনির্দিষ্ট পরিবেশের মাঝে, এইভাবে জীবনে তাদের অবস্থান এবং তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ নির্দেশ করে দেয় তাদের শ্রেণী, তারা তাদের শ্রেণীর অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এটা হল শ্রমবিভাগের কাছে পৃথক পৃথক ব্যক্তির অধীনতার মতো একই ব্যাপার, সেটা দূর হতে পারে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রমের আপনারই লোপের ফলে।* শ্রেণীর অধীনে ব্যক্তির এই অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে হরেক রকমের ভাব-ধারণা, ইত্যাদির কাছে ব্যক্তির অধীনতা ঘটে সেটা আমরা আগেই কয়েক বার নির্দেশ করেছি।

ব্যক্তির এই ক্রমবিকাশটাকে একটার পরে একটা আগত বিভিন্ন সামাজিক বর্গ আর শ্রেণীর অস্তিত্বের সাধারণী পরিবেশের মাঝে এবং তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন সহ-বর্তমান সাধারণ ধারণার মাঝে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ বিবেচনা করলে এমনটা নিশ্চয়ই খুব সহজেই মনে করা যায় যে, এইসব ব্যক্তির মাঝে উদ্ভূত হয়েছে প্রজাতিটা বা 'মানুষ' কিংবা তারা 'মানুষের' উদ্ভব ঘটিয়েছে — আর এইভাবে কেউ কষে ইতিহাসের কান মলে দিতে পারে কয়েক বার। কারও কল্পনায় এইসব বিভিন্ন সামাজিক বর্গ আর শ্রেণী হতে পারে সাধারণ কথাটার বিভিন্ন বিশেষ-নির্দিষ্ট অভিধা, প্রজাতিটার বিভিন্ন অধস্তন রকম, কিংবা 'মানুষের' অভিব্যক্তির বিভিন্ন পর্ব।

শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যা রক্ষা করতে হয় এমন কোন বিশেষ শ্রেণীস্বার্থ যেটার আর থাকবে না এমন একটা শ্রেণী গড়ে ওঠার আগে বিভিন্ন নির্দিষ্ট শ্রেণীর অধীনে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি লোপ পেতে পারে না।

---

* 'শ্রমের লোপ' (Aufhebung der Arbeit) কথাটার অর্থের জন্যে এই খণ্ডের ৩৮-৪৯, ৮৬-৮৭, ৯৪-৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

শ্রমবিভাগের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত ক্ষমতার (সম্পর্ক) বৈষয়িক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হওয়া সংক্রান্ত সাধারণ ধারণাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ঐ রূপান্তরটাকে দূর করা যায় না; ব্যক্তি এইসব বৈষয়িক ক্ষমতাকে আবার নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন করে এবং শ্রমবিভাগ লোপ করেই শুধু সেটাকে লোপ করা যায়।* সম্প্রদায় ছাড়া এটা সম্ভব নয়। [অন্যান্যের সঙ্গে প্রত্যেকটি] ব্যক্তি-মানুষের সম্প্রদায়বদ্ধতার মাঝেই [৫৬] শুধু সে তার স্বাভাবিক গুণাবলির সর্বতোমুখী অনুশীলনের উপায়াদি পেতে পারে; কাজেই ব্যক্তির স্বকীয় স্বাধীনতা সম্ভব কেবল সম্প্রদায়ের মাঝেই। সম্প্রদায়ের জায়গায় পূর্ববর্তী বদলিগুলোয় — রাষ্ট্র, ইত্যাদিতে — যেসব ব্যক্তি গড়ে উঠেছে শাসক শ্রেণীর সম্পর্কতন্ত্রের ভিতরে কেবল তাদেরই থেকেছে স্বকীয় স্বাধীনতা, আর সেটা কেবল তারা এই শ্রেণীর মধ্যকার ব্যক্তি হিসেবে। যে বিভ্রমজনক সম্প্রদায়ে ব্যক্তিরা এখন অবধি একত্রিত হয়েছে সেটা সবসময়েই তাদের ব্যাপারে একটা স্বতন্ত্র সত্তা হয়ে উঠেছে, আর যেহেতু সেটা ছিল অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা শ্রেণীর সম্প্রদায়, তাই সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছিল একেবারে বিভ্রমজনক সম্প্রদায়ই শুধু নয়, অধিকন্তু একটা নতুন বেড়িও বটে। সত্যিকারের সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা পায় তাদের সম্মিলনীর মাঝে এবং সেটার সাহায্যে।

ব্যক্তিরা সবসময়েই গড়েছে নিজেদের ভিত্তি ক'রে, কিন্তু স্বভাবতই তাদের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিবেশ এবং সম্পর্কতন্ত্রের ভিতরে নিজেদের ভিত্তি ক'রে — ভাবাদর্শবিদদের অর্থে 'বিশুদ্ধ' ব্যক্তিকে ভিত্তি করে নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারায়, এবং শ্রমবিভাগের ভিতরে সামাজিক সম্পর্কের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘটে, ঠিক এই অনিবার্য ব্যাপারটার ভিতর দিয়ে প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবনের মাঝে দেখা দেয় একটা বিভাগ — যে-পরিমাণে সেটা নিজস্ব, আর যে-পরিমাণে সেটা নির্ধারিত হয় শ্রমের কোন শাখা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ দিয়ে। (এর থেকে আমরা এমনটা বোঝাতে চাইছি নে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, লভ্যাংশজীবী, পুঁজিপতি, ইত্যাদিরা আর মনুষ্য থাকে না; কিন্তু তাদের ব্যক্তিসত্তা রূপায়িত এবং নির্ধারিত হয়

* [মার্জিনে এঙ্গেলসের টীকা:] (ফয়েরবাখ: সত্তা এবং সারমর্ম)। দ্র. এই খণ্ডের ৫৬-৫৭ পৃঃ। — সম্পাঃ

খুবই নির্দিষ্ট শ্রেণীগত সম্পর্কতন্ত্র দিয়ে, আর বিভাগটা দেখা দেয় শুধু অন্য একটা শ্রেণীর প্রতি তাদের বিরোধিতার মাঝে, আর তাদের নিজেদের বেলায় সেটা দেখা দেয় শুধু যখন তারা দেউলিয়া হয়ে যায়।) সামাজিক বর্গের মাঝে (এবং গোষ্ঠীর মাঝে আরও বেশি পরিমাণে) সেটা তখনও প্রচ্ছন্ন: যেমন, একজন অভিজাত সবসময়েই থেকে যায় একজন অভিজাত, সাধারণ মানুষ সবসময়ে থেকে যায় সাধারণ মানুষ, সেটা তার অন্যান্য সম্পর্ক ছেড়ে দিলে, তার ব্যক্তিতা থেকে অবিচ্ছেদ্য চরিত্র হিসেবে। ব্যক্তি-মানুষ এবং শ্রেণীগত ব্যক্তির মধ্যে বিভাগ, ব্যক্তির পক্ষে জীবনের পরিবেশের আপতিক প্রকৃতি দেখা দেয় শুধু শ্রেণীটার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে, যে-শ্রেণীটা আপনিই হল বুর্জোয়াদের একটা উৎপাদ। এই আপতিক প্রকৃতিটার উদ্ভব ঘটে এবং সেটা সম্প্রসারিত হয় শুধু [৫৭] ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং সংগ্রাম দিয়ে। এইভাবে, কল্পনায়, আগের চেয়ে বুর্জোয়াদের প্রাধান্যের আমলে ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত মনে হয়, তার কারণ তার জীবনের পরিবেশটাকে আপতিক মনে হয়; বাস্তবে অবশ্য সে অপেক্ষাকৃত কম মুক্ত, কেননা তাদের উপর জিনিসের নিগ্রহ-বল খাটে আরও বেশি। সামাজিক বর্গ থেকে উদ্ভূত পার্থক্যটা প্রকাশ পায় বিশেষত বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বৈরিতার মাঝে। শহুরে বার্গারদের সামাজিক বর্গ, বিভিন্ন সম্মিলনী, ইত্যাদির যখন উদ্ভব ঘটেছিল ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতকুলের প্রতিযোগে, তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ — অস্থাবর সম্পত্তি আর কারিগরি শ্রম, যা তাদের সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আগেই অন্তর্নিহিত অবস্থায় ছিল — প্রতীয়মান হয়েছিল নির্দিষ্টরূপে, যেটাকে বজায় রাখা হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পত্তি মালিকানার বিরুদ্ধে, যেটা তার নিজস্ব ধরনে প্রথমে সামন্ততান্ত্রিক রূপ ধারণ করেছিল। পলাতক ভূমিদাসেরা তাদের পূর্ববর্তী গোলামিটাকে নিশ্চয়ই তাদের ব্যক্তি-অস্তিত্বের পক্ষে আপতিক বলে বিবেচনা করেছিল। তবে প্রত্যেকটা শ্রেণী শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করার সময়ে যা করে শুধু তাইই ভূমিদাসেরা করছিল এক্ষেত্রে; আর তারা নিজেদের মুক্ত করেছিল শ্রেণী হিসেবে নয়, আলাদা-আলাদা। অধিকন্তু, সামাজিক বর্গবিভাগ ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে তারা ওঠে নি, তারা হয়েছিল শুধু একটা নতুন সামাজিক বর্গ, তাদের নতুন অবস্থায়ও

তারা বজায় রেখেছিল তাদের পুরন শ্রম-প্রণালী, আর ইতোমধ্যে সম্পাদিত উন্নয়নের সঙ্গে যা আর মানানসই ছিল না সেই পূর্ববর্তী বেড়ি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই শ্রম-প্রণালীটার আরও উৎকর্ষ ঘটিয়েছিল।

পক্ষান্তরে, প্রলেতারিয়ানদের বেলায়, তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ, শ্রম, আর তার সঙ্গে জীবনযাত্রার যে-সমগ্র পরিবেশ আধুনিক সমাজের নিয়ামক সেটা হয়ে উঠেছে আপতিক একটাকিছু, এমন একটাকিছু যার উপর পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে তাদের আয়ত্তি নেই, কোন **সামাজিক** সংগঠন যার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে না। আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি প্রলেতারিয়ানের ব্যক্তি-অস্তিত্ব আর শ্রমের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-অসংগতি, তার উপর চাপিয়ে দেওয়া জীবনযাত্রার পরিবেশ সে নিজেই স্পষ্ট দেখতে পায়, কেননা তরুণ-বয়স থেকেই সে শিকার, আর যেটা তাকে অন্য শ্রেণীতে স্থাপন করতে পারে এমন পরিবেশ হাজির হবার কোন সম্ভাবনা তার নেই নিজ শ্রেণীর ভিতরে।

[৫৮] দ্রষ্টব্য। ভূমিদাসদের একেবারে বেঁচে থাকার তাগিদটাই এবং ভূমিদাসদের মধ্যে ভূমি আবণ্টন যাতে সংশ্লিষ্ট এমন বৃহদায়তনের অর্থনীতির অসম্ভাবনা অচিরেই মনিবের জন্যে ভূমিদাসের কাজটাকে গড় পরিমাণে বস্তুশোধ এবং বিধিবদ্ধ শ্রমে পরিণত করেছিল -- এটা ভোলা চলে না। এর ফলে ভূমিদাসের অস্থাবর সম্পত্তি জমান সম্ভব হয়ে উঠেছিল, কাজেই মনিবের দখল থেকে তার নিষ্কৃতি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠেছিল, তার শহুরে নাগরিক হতে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল; এর ফলে ভূমিদাসদের মধ্যে পর্যায়ভেদও পয়দা হয়েছিল, যাতে পলাতক ভূমিদাসেরা তখনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আধা-বার্গার। যেসব ভূমিদাস ছিল কোন কারিগরিতে ওস্তাদ তাদের অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি, এটাও স্পষ্ট।

এইভাবে, পলাতক ভূমিদাসেরা মুক্ত হতে চেয়েছিল শুধু ইতঃপূর্বে বর্তমান জীবনযাত্রার পরিবেশটাকে সম্প্রসারিত এবং রক্ষা করার জন্যে, কাজেই শেষে তারা পেঁছেছিল শুধু মুক্ত শ্রমে, পক্ষান্তরে, প্রলেতারিয়ানদের ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে লোপ করতে হবে এযাবত যা রয়েছে জীবনযাত্রার সেই পরিবেশটাকেই (অধিকন্তু সেটা হল বর্তমান সময় অবধি

সমগ্র সমাজেরই পরিবেশ) — সেটা শ্রম। এইভাবে, সমাজটা যাদের নিয়ে সেই ব্যক্তি-মানুষেরা এযাবত যে-আকারে নিজেদের সমষ্টিগত অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে সেটার সরাসর বিরুদ্ধে পড়ে যায় প্রলেতারিয়ানরা — সেটা হল রাষ্ট্র। কাজেই, ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হলে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে রাষ্ট্রটাকে।

এখন অবধি আমরা যাকিছু বলেছি তার থেকে দেখা যাচ্ছে, কোন একটা শ্রেণীর ব্যক্তি-মানুষেরা নিজেদের মধ্যে যে সম্প্রদায়গত সম্পর্ক স্থাপন করেছে, সেটা নির্ধারিত হয়েছে একটা তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে তাদের সমস্বার্থ দিয়ে আর সম্প্রদায়টা সবসময়েই ছিল এমন যাতে এইসব ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল শুধু গড় ধরনের ব্যক্তি হিসেবে, সেটা শুধু সেই পরিমাণে যাতে তারা জীবনযাত্রা চালায় তাদের শ্রেণীর জীবনের পরিবেশের ভিতরে — ঐ সম্পর্কে তারা শামিল হয়েছে ব্যক্তি হিসেবে নয়, একটা শ্রেণীর সদস্য হিসেবে। পক্ষান্তরে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়ানরা [৫৯] তাদের এবং সমাজের সমস্ত সদস্যের জীবনযাত্রার পরিবেশ নেয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে, তাদের সম্প্রদায়ের বেলায় ব্যাপারটা ঠিক উলটো: এতে ব্যক্তি-মানুষেরা শামিল হয় ব্যক্তি-মানুষ হিসেবেই। ব্যক্তি-মানুষদের ঠিক এই সম্মিলনী থেকেই (অবশ্য, আধুনিক উৎপাদন-শক্তিসমূহ উন্নত পর্বে বলে ধরে নিয়ে) ব্যক্তি-মানুষের অবাধ বিকাশ এবং গতিবিধির পরিবেশ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় — এই পরিবেশটা আগে পড়ে ছিল আপতিকতার অধীনে, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধ একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করেছিল এই পরিবেশ, সেটা হয়েছিল ব্যক্তি হিসেবে তাদের বিচ্ছিন্নতার কারণে, আর তাছাড়া, শ্রমবিভাগ থেকে নির্ধারিত যে-সম্মিলনী তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল সেটা তাদের বিচ্ছিন্নতার দরুন তাদের পক্ষে বিজাতীয় একটা বন্ধন হয়ে দাঁড়াবার কারণে। এখন অবধি সম্মিলনী [সেটা দৃষ্টান্তস্বরূপ 'Contract social' (৩১) [social contract]-এ যেমনটা বিবৃত হয়েছে তেমনি এলোবিলি নয় কোনক্রমেই, সেটা অনিবার্য] ছিল পরিবেশের উপর একটা অন্বয়, যেটার ভিতরে ব্যক্তি-মানুষ বরাতের জোরে অদ্ভুত কিছু উপভোগ করতে পারে অবাধে (দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলনীয় — উত্তর আমেরিকান রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ

আমেরিকান প্রজাতন্ত্রগুলি গঠন)। কোন কোন শর্তাধীনে আপতিকতা আর অদৃষ্ট থেকে নিরুপদ্রবে সুখ পাবার এই অধিকারটাকে এখন অবধি বলে আসা হচ্ছে নিজস্ব স্বাধীনতা। জীবনের এই পরিবেশ অবশ্য কোন একটা নির্দিষ্ট কালের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এবং সংসর্গের আকার ছাড়া কিছু নয়।

পূর্ববর্তী সমস্ত আন্দোলন থেকে কমিউনিজমের পার্থক্যটা হল এই যে, এটা উৎপাদন আর সংসর্গের পূর্ববর্তী সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তিটাকে উলটে দেয়, আর এই প্রথম সমস্ত স্বাভাবিক পত্তনকে সচেতনভাবে ধরে এতদবধি বিদ্যমান মানুষের সৃষ্টি হিসেবে, সেগুলোর স্বাভাবিক প্রকৃতিটাকে ঘুচিয়ে দেয়, এবং সম্মিলিত ব্যক্তি-মনুষ্যগণের ক্ষমতাধীন করে সেগুলোকে। কাজেই, কমিউনিজমের সংগঠন হল মূলত আর্থনীতিক, এই সম্মিলনের পরিবেশের বৈষয়িক উৎপাদন; বিদ্যমান পরিবেশকে কমিউনিজম সম্মিলনের পরিবেশে পরিণত করে। যে বাস্তবতাটাকে কমিউনিজম সৃষ্টি করছে সেটাই হল যথার্থ ভিত্তি যাতে ব্যক্তি-মানুষ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেটা এই দিক থেকে যে, বাস্তবতা হল ব্যক্তি-মানুষদের নিজেদেরই পূর্ববর্তী সংসর্গের ফল। এইভাবে, এখন অবধি উৎপাদন এবং সংসর্গ দিয়ে পয়দা-করা পরিবেশকে কমিউনিস্টরা কার্যক্ষেত্রে ধরে অজৈব বলে; তবে সেটা করতে গিয়ে কমিউনিস্টরা এমনটা ধারণা করে না যে, তাদের মালমশলা যোগানটা ছিল পূর্ববর্তী পুরুষ-পর্যায়গুলির পরিকল্পনা কিংবা নিয়তি, তেমনি, যেসব ব্যক্তি এই পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাদের পক্ষে সেটা অজৈব ছিল, এমনটাও মনে করে না কমিউনিস্টরা।

[৭। বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষ এবং তাদের জীবনের পরিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতি — উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের ধরনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব-অসংগতি। উৎপাদন-শক্তির উন্নয়ন এবং সংসর্গের ধরন পরিবর্তন]

[৬০] মানুষ হিসেবে ব্যক্তি, আর তার মাঝে যা আপতিক, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা মনগড়া নয়; এটা ইতিহাস-অনুযায়ী প্রকৃত অবস্থা।

এই পার্থক্যটার তাৎপর্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন — যেমন, আঠার শতকে সামাজিক বর্গ হল ব্যক্তির পক্ষে আপতিক একটাকিছু, পরিবারও কমবেশি তাইই। যা প্রত্যেকটা যুগের বেলায় আমাদের করতে হবে এমন প্রভেদ এটা নয়, প্রত্যেকটা যুগে আগে থেকে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের মধ্য থেকে এই প্রভেদ করে যুগটা আপনিই, সেটা বাস্তবিকপক্ষে কোন তত্ত্ব অনুসারে নয়, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ভৌত সংঘাতের চাপের জোরে সেটা ঘটে।

কোন একটা পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে প্রতীপ-তুলনায় পরবর্তী যুগের কাছে যেটা আপতিক বলে প্রতীয়মান হয় — কোন একটা পূর্ববর্তী যুগ থেকে বর্তান বিভিন্ন উপাদানের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য — সেটা হল উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্বের সঙ্গে যেটা মানানসই ছিল এখন একটা ধরনের সংসর্গ। সংসর্গের ধরনের সঙ্গে উৎপাদন-শক্তির সম্পর্ক হল ব্যক্তিদের বৃত্তি কিংবা সক্রিয়তার সঙ্গে সংসর্গের ধরনের সম্পর্ক। [এই সক্রিয়তার মৌলিক ধরন অবশ্য ভৌত, যেটার উপর নির্ভর করে অন্যান্য ধরন — মানসিক, রাজনীতিক, ধর্মীয়, ইত্যাদি। বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন মূর্তায়ন অবশ্য প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ইতঃপূর্বে গড়ে-ওঠা চাহিদাগুলোর উপর নির্ভর করে, আর এইসব চাহিদা মেটাও যেমন তেমনি পয়দা হওয়াও একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যেটা ভেড়ায় কিংবা কুকুরে দেখা যায় না [স্টির্নারের জেদী যুক্তি (৩২) adversus hominem*], যদিও বর্তমান রূপের ভেড়া আর কুকুর নিশ্চয়ই, কিন্তু malgré eux**, একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উৎপাদ।] উল্লিখিত দ্বন্দ্ব-অসংগতি না থাকলে, ব্যক্তিরা যে-পরিবেশে পরস্পরের সংসর্গে আসে সেটা তাদের ব্যক্তি-অস্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ, সেটা কোনক্রমেই তাদের বহিস্থ নয়; নির্দিষ্ট সম্পর্কের মাঝে জীবনযাপন করে এই যেসব নির্দিষ্ট ব্যক্তি, এরা একমাত্র যে-পরিবেশে পয়দা করতে পারে তাদের বৈষয়িক জীবন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু, সেটা হল এইভাবে তাদের আত্মসক্রিয়তার পরিবেশ, আর সেটাকে পয়দা করে এই আত্মসক্রিয়তা।*** ইতোমধ্যে [৬১] দ্বন্দ্ব-অসংগতিটা এসে না গেলে, তারা

---

* মানুষের বিরুদ্ধে। — সম্পাঃ

** তাদের ইচ্ছে ছাড়াই। — সম্পাঃ

*** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] সংসর্গের আকারটারই উৎপাদন।

যে-পরিবেশে উৎপাদন করে সেটা এইভাবে তাদের সাপেক্ষ প্রকৃতির বাস্তবতার সঙ্গে, তাদের একপেশে জীবনের সঙ্গে মানানসই হয় — জীবনের একপেশে অবস্থাটা স্পষ্ট-প্রতীয়মান হয় শুধু যখন দ্বন্দ্ব-অসংগতিটা সেখানে দেখা দেয় এবং এইভাবে পরবর্তী ব্যক্তিদের বেলায় বর্তমান থাকে। তখন এই পরিবেশটা প্রতীয়মান হয় একটা আপাতিক বেড়ির মতো, আর এটা-যে একটা বেড়ি এই চেতনাটাকে আরোপ করা হয় পূর্ববর্তী যুগের ক্ষেত্রেও।

এই যেসব বিভিন্ন পরিবেশ প্রতীয়মান হয় প্রথমে আত্মসক্রিয়তার পরিবেশের মতো, পরে সেটায় লাগান বেড়ির মতো, এগুলো নিয়ে ইতিহাসের সমগ্র ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে সংসর্গের বিভিন্ন ধরনের একটা সম্বদ্ধ শ্রেণী, সেটার সম্বদ্ধতা হল এতে: সংসর্গের যে পূর্ববর্তী ধরনটা বেড়ি হয়ে দাঁড়ায় সেটার জায়গায় আসে একটা নতুন ধরন, যেটা অপেক্ষাকৃত উন্নত উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে, তাই ব্যক্তিদের আত্মসক্রিয়তার উন্নত প্রণালীর সঙ্গে মানানসই — এই ধরনটা আবার বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেটার জায়গায় আসে আর-একটা ধরন। যেহেতু এইসব পরিবেশ প্রত্যেকটা পর্বে উৎপাদন-শক্তিসমূহের যুগপৎ উন্নয়নের সঙ্গে মানানসই, তাই সেগুলির ইতিহাস একসঙ্গে প্রত্যেকটা পুরুষ-পর্যায়ের হাতে নেওয়া উন্নয়নশীল উৎপাদন-শক্তিসমূহের ইতিহাস এবং কাজেই ব্যক্তিদের নিজেদেরই শক্তিসমূহের বিকাশের ইতিহাস।

যেহেতু এই ক্রমবিকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অর্থাৎ সেটা অবাধে সম্মিলিত ব্যক্তিদের কোন সাধারণ পরিকল্পনার সাপেক্ষ নয়, তাই সেটা উদ্ভূত হয় বিভিন্ন এলাকা, গোষ্ঠী, জাতি, শ্রমের শাখা, ইত্যাদি থেকে, যেগুলোর প্রত্যেকটা শুরুতে বিকশিত হয় অন্যান্যের থেকে স্বতন্ত্রভাবে, এবং অন্যান্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় শুধু ক্রমে ক্রমে। অধিকন্তু, এটা ঘটে শুধু খুবই ধীরে; বিভিন্ন পর্ব আর স্বার্থ কখনও পুরোপুরি দমিত হয় না, সেটা প্রাধান্যশালী স্বার্থের শুধু অধীন হয়ে পরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার সঙ্গে হেঁচড়ে চলতে থাকে। এর থেকে ব্যাপারটা যা দাঁড়ায় তাতে এক-একটা জাতির ভিতরে ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থার কথাটা ছেড়ে দিলেও তাদের বিকাশ হয় একেবারেই পৃথক পৃথক ধরনে, আর কোন একটা পূর্ববর্তী স্বার্থ, যেটার সংসর্গের বিশেষ ধরনটাকে একটা

পরবর্তী স্বার্থের সংসর্গের ধরন এসে হঠিয়ে দেয়, সেটা পরে দীর্ঘকাল যাবত থেকে যায় বিভ্রমজনক সম্প্রদায়ের (রাষ্ট্র, আইন) রেওয়াজ ক্ষমতার অধীনে, যেটা ব্যক্তিদের থেকে স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব লাভ করে; ঐ ক্ষমতাটাকে শেষপর্যন্ত চূর্ণ করতে পারে শুধু বিপ্লব। এর থেকে বোঝা যায় কেন এমনটা হয় যে, যেসব পৃথক পৃথক বিষয় [৬২] থেকে অপেক্ষাকৃত সাধারণ সংক্ষিপ্তসার করা চলে সেগুলোর প্রসঙ্গে চেতনা কখনও-কখনও সমসাময়িক প্রয়োগজ সম্পর্কের চেয়ে উন্নত প্রতীয়মান হয়, যাতে কোন একটা পরবর্তী যুগের বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে কেউ পূর্ববর্তী তত্ত্ববিদদের প্রামাণ্য বলে উল্লেখ করতে পারে।

পক্ষান্তরে, উত্তর আমেরিকার মতো যেসব দেশ শুরু করে ইতঃপূর্বে উন্নত ইতিহাসক্রমিক যুগে সেগুলিতে বিকাশ ঘটে খুবই দ্রুত। ব্যক্তি-মানুষেরা ছাড়া কোন স্বাভাবিক পত্তন থাকে না এইসব দেশের — সেইসব ব্যক্তি সেখানে স্থায়িভাবে বসবাস করে এবং সেটা করতে প্রণোদিত হয়, তার কারণ পুরন দেশগুলিতে সংসর্গের ধরন তাদের বিভিন্ন চাহিদার অনুযায়ী নয়। এইভাবে, সেইসব দেশ শুরু করে পুরন দেশগুলির সবচেয়ে উন্নত ব্যক্তিদের নিয়ে, কাজেই তদনুযায়ী সবচেয়ে উন্নত ধরনের সংসর্গ নিয়ে — সংসর্গের এই ধরনটা পুরন দেশগুলিতে চালু হতে পারার আগে। এমনটা ঘটে সমস্ত উপনিবেশের বেলায় — যেক্ষেত্রে সেগুলি সামরিক কিংবা বাণিজ্যিক কেন্দ্রমাত্র নয়। এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত হল — কার্থিজ, গ্রীক উপনিবেশগুলি, এবং এগার আর বার শতকের আইসল্যান্ড। অনুরূপ সম্পর্ক পয়দা হয় দেশজয় থেকে, সেক্ষেত্রে অন্য দেশে গড়ে-ওঠা সংসর্গের ধরনটাকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এনে ফেলা হয় বিজিত দেশে: স্বদেশে সেটা বিভিন্ন পূর্ববর্তী কালপর্যায় থেকে চলে-আসা বিভিন্ন স্বার্থ আর সম্পর্কের ভারাক্রান্ত থাকে, কিন্তু এখানে সেটাকে চালু করা যায় এবং তা করা চাইই সম্পূর্ণভাবে এবং প্রতিবন্ধ ছাড়াই, আর কিছু না হলেও বিজেতার সুস্থিত ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্যে। [নর্ম্যান বিজয়ের পরে (৩৩) ইংলন্ড এবং নেপ্‌ল্‌স, তখন তারা পেয়েছিল সবচেয়ে নিখুঁত ধরনের সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন।]

[৮। ইতিহাসে বলপ্রয়োগের (দেশজয়ের) ভূমিকা]

দেশজয়ের ব্যাপারটা যেন ইতিহাস সম্বন্ধে এই সমগ্র ব্যাখ্যাটাকে বেঠিক প্রতিপন্ন করে। বলপ্রয়োগ, যুদ্ধ, লুটতরাজ, হত্যা আর দস্যুতা, ইত্যাদি এযাবত ইতিহাসের চালিকাশক্তি বলে গণ্য হয়ে আসছে। এখানে আমাদের প্রধান বিষয়ে গণ্ডিবদ্ধ থাকতে হবে, কাজেই ধরতে হবে শুধু সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত — কোন বর্বর জাতির হাতে কোন প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস এবং তার ফলস্বরূপে সমাজের সম্পূর্ণ নতুন সংগঠনের উদ্ভব। [রোম এবং বারবারিয়ানরা; সামন্ততন্ত্র এবং গল্; বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্য এবং তুর্কীরা। (৩৪)]

[৬৩] বিজেতা বর্বরদের কাছে যুদ্ধ তখনও সংসর্গের একটা নিয়মিত ধরন, যা আগে নির্দেশ করা হয়েছে; রেওয়াজী এবং একমাত্র সম্ভাব্য আনাড়ি উৎপাদন-প্রণালীর সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধি মিলে উৎপাদনের নতুন নতুন উপকরণের আবশ্যকতা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে আরও বেশি সাগ্রহে কাজে লাগান হয়। পক্ষান্তরে, ইতালিতে ভূমি-সম্পত্তির সমাহরণ এবং সেগুলিকে পশুচারণভূমিতে পরিণত করার ফলে মুক্ত জনসমষ্টি প্রায় তামাম-উজাড় হয়ে গিয়েছিল। (ভূমি-সম্পত্তি সমাহরণ ঘটেছিল তামাম-ক্রয় আর ঋণগ্রস্ততার দরুন ছাড়াও উত্তরলব্ধির ফলেও; উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবন ছিল ব্যাপক, বিবাহ ছিল বিরল, তাই পুরন পরিবারগুলো লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের বিষয়-সম্পত্তি পড়েছিল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। অদ্যাবধি প্রচলিত রেওয়াজী আর্থনীতিক শক্তিগুলোর ক্রিয়াফলেই শুধু নয়, লুঠ-করা আর নজরানার শস্যের আমদানি এবং তার পরিণতিতে ইতালীয় শস্যের জন্যে চাহিদার অভাবের ফলেও ভূমি-সম্পত্তি পশুচারণভূমিতে পরিণত হয়েছিল।) দাসেরাই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বারবার, তাদের জায়গায় নতুন নতুন দাস আনতে হত অবিরাম। দাসপ্রথাই থেকে গিয়েছিল সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তি। মুক্তি-পাওয়া দাস আর দাসদের মাঝামাঝি ছিল প্লিবিয়ানরা -- তারা প্রলেতারিয়ান জনতার চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারে নি কখনও। রোম বাস্তবিকপক্ষে কখনও একটা নগরীর চেয়ে বেশি কিছু হয় নি; প্রদেশগুলোর সঙ্গে সেটার সংযোগ ছিল প্রায় পুরোপুরিই

রাজনীতিক, কাজেই আবার রাজনীতিক ঘটনাবলির ফলেও সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারত সহজেই।

এযাবত ইতিহাসে সবকিছু হল **হস্তগত করার** ব্যাপার, এই মর্মে ধারণাটার চেয়ে আকছার চালু নয় আর কিছুই। বারবারিয়ানরা রোম-সাম্রাজ্য **হস্তগত করল,** এই হস্তগতকরণের ঘটনাটাকে দিয়ে প্রাচীন দুনিয়া থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের ব্যাখ্যা করান হয়। তবে বারবারিয়ানদের এই হস্তগতকরণের ব্যাপারে প্রশ্নটা হল, বিজিত জাতিটা শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন-শক্তিসমূহ গড়ে তুলেছে (আধুনিক জাতিগুলির বেলায় যেমনটা), না, তাদের উৎপাদন-শক্তিসমূহের ভিত্তি হল প্রধানত শুধু তাদের সম্মিলনী আর সম্প্রদায়। হস্তগতকরণটা আরও নির্ধারিত হয় হস্তগত বস্তুটাকে দিয়ে। কোন ব্যাংকারের ধন-ঐশ্বর্য কাগজী, — হস্তগত দেশটির উৎপাদন আর সংসর্গের প্রণালীর কাছে বশ্যতাস্বীকার না করে হস্তগতকারী সেই ধন আদৌ হস্তগত করতে পারে না। কোন আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ দেশের সমগ্র শিল্পগত পুঁজির বেলায়ও সেই একই কথা। শেষে, সর্বত্রই হস্তগত করার সমাপ্তি ঘটে অচিরে, হস্তগত করার মতো আর কিছু না থাকলে তখন উৎপাদনের কাজে লাগতে হয়। উৎপাদন করার এই অপরিহার্যতা বলবৎ হয় অচিরে, এই অপরিহার্যতা থেকে উদ্ভূত হয় [৬৪] এই অবস্থাটা: ঔপনিবেশিক বিজেতাদের অবলম্বিত সম্প্রদায়বদ্ধতার ধরনটা হওয়া চাই উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের যে-পর্বটা তারা বিদ্যমান দেখতে পায় তদনুযায়ী; কিংবা, শুরু থেকেই ব্যাপারটা তেমন না হলে, উৎপাদন-শক্তিসমূহ অনুসারে সেটা পরিবর্তিত হওয়া চাই। এর থেকে আরও একটা ব্যাপারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেটা হল, বিভিন্ন জাতির প্রবসনের পরবর্তী কালপর্যায়ে সর্বত্র যা লোকে লক্ষ্য করেছে বলে: চাকর হল মনিব, আর বিজেতারা অচিরেই গ্রহণ করল বিজিতদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে কোনক্রমেই জার্মানি থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আনা হয় নি; বিজেতারা যতখানি সংশ্লিষ্ট তাতে এটার উৎপত্তিস্থল হল ফৌজে ঠিক দেশজয়ের সময়কার সামরিক সংগঠন, আর সেটা ক্রমে খাস সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল শুধু দেশজয়ের

পরে — বিজিত দেশে বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তিসমূহের ক্রিয়াফলের ভিতর দিয়ে। প্রাচীন রোমের অবশেষগুলো থেকে নেওয়া অন্যান্য ধরন বাস্তবায়িত করার ব্যর্থ চেষ্টাগুলো (শার্লেমেন, ইত্যাদি) থেকে দেখা যায় এই ধরনটা কী পরিমাণে নির্ধারিত হয়েছিল উৎপাদন-শক্তিসমূহ দিয়ে।

[৯। বৃহৎ শিল্প আর অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশে উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের ধরনের মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতির বিকাশ। শ্রম আর পুঁজির মধ্যে বৈপরীত্য]

ব্যক্তি-মানুষের জীবনযাত্রার পরিবেশ, বিভিন্ন ঊনতা আর বদ্ধধারণার সমগ্র সাকল্যটা বৃহৎ শিল্প আর প্রতিযোগিতার ভিতরে একত্রে মিলেমিশে গিয়ে দুটো অতি সরল রূপ ধারণ করে: ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শ্রম। অর্থ দেখা দিলে সংসর্গের প্রত্যেকটা ধরন এবং সংসর্গ আপনিই ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে আপতিক বিবেচিত হয়। এইভাবে অর্থ দেখিয়ে দেয় যে, পূর্ববর্তী সমস্ত সংসর্গ ছিল শুধু বিশেষ বিশেষ পরিবেশের আওতায় ব্যক্তি-মানুষদের সংসর্গ, ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তিদের সংসর্গ নয়। এইসব পরিবেশ দুটো উপাদানে পরিণত হয়: পুঞ্জিত শ্রম বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সাক্ষাৎ শ্রম। উভয়ই কিংবা এর একটা ক্ষান্ত হলে সংসর্গ অচল অবস্থায় পড়ে যায়। আধুনিক অর্থনীতিবিদেরাই — যেমন সিস্‌মন্দি, শেরবুলিয়ে, ইত্যাদি — 'ব্যক্তিদের সম্মিলনীকে' স্থাপন করেন 'পুঁজির সম্মিলনীর' বিপরীতে। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিরা নিজেরাই পুরোপুরি শ্রমবিভাগের অধীন, তাই তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে একেবারে পুরোপুরি। ব্যক্তিগত মালিকানা যে-পরিমাণে শ্রমের ভিতরেই শ্রমের বিপরীতে তাতে সেটা গড়ে ওঠে সঞ্চয়নের আবশ্যকতা থেকে, গোড়ায় সেটাতে কিছুটা সাম্প্রদায়িকতার আকার থাকে; কিন্তু পরবর্তী বিকাশের ধারায় সেটা ক্রমাগত বেশি পরিমাণে ব্যক্তিগত মালিকানার আধুনিক আকারের কাছাকাছি এসে যায়। শ্রমবিভাগের মধ্যে শুরু থেকেই নিহিত থাকে শ্রমের **পরিবেশের,** হাতিয়ার আর মালমশলার

বিভাগ, তার থেকে বিভিন্ন মালিকের মধ্যে সঞ্চিত পুঁজির বিভাগ, আর তার থেকে পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে এবং মালিকানার নিজেরই বিভিন্ন আকারের বিভাগ। শ্রমবিভাগ যত বেশি অগ্রসর হয় [৬৫] এবং সঞ্চয় বাড়ে, ততই বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই প্রভেদনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ। খাস শ্রমেরই অস্তিত্ব সম্ভব কেবল এই বিভক্ত অবস্থার ভিত্তিতে।

(বিভিন্ন জাতির — জার্মানরা এবং আমেরিকানরা — ব্যক্তিদের স্বকীয় কর্মশক্তি — এমনকি সংকর-প্রজননের সাহায্যেও কর্মশক্তি — তার থেকে জার্মানদের বামনত্ব; বিদেশীদের পরিবাপন — ফ্রান্স, ইংলন্ড, ইত্যাদি দেশে ইতঃপূর্বে উন্নয়ন-করা জমিনে, আমেরিকায় একেবারেই নতুন জমিনে; জার্মানিতে দেশজ জনসমষ্টি নির্ঝঞ্ঝাটে থেকে গেল যেখানে ছিল।)

এইভাবে এখানে প্রকাশ পেল দুটো তথ্য।* এক, উৎপাদন-শক্তিসমূহ প্রতীয়মান হয় ব্যক্তিদের পাশাপাশি আপনাতেই একটা জগৎ, যা ব্যক্তিদের থেকে স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন: তার কারণটা এই যে, সেগুলো যাদের শক্তি সেই ব্যক্তিরা থাকে পৃথক পৃথক হয়ে এবং পরস্পরের প্রতিযোগে, যদিও পক্ষান্তরে, এইসব শক্তি কেবল এইসব ব্যক্তির সংসর্গ এবং সম্মিলনীর মাঝেই বাস্তব শক্তি। এইভাবে, একদিকে রয়েছে উৎপাদন-শক্তিসমূহের একটা সাকল্য, সেগুলো যেন বৈষয়িক আকার পেয়ে ব্যক্তিদের পক্ষে আর ব্যক্তিদের শক্তি নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির শক্তি, আর তাই সেগুলো ব্যক্তিদের শক্তি কেবল এই দিক থেকে যে, তারা নিজেরাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক। পূর্ববর্তী কোন কালপর্যায়ে উৎপাদন-শক্তিসমূহ কখনও **ব্যক্তিগণ হিসেবে** ব্যক্তিগণের সংসর্গ থেকে এমনটা অনপেক্ষ আকার ধারণ করে নি, কেননা তাদের সংসর্গটাই আগে ছিল সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে, এইসব উৎপাদন-শক্তির বিপরীতে রয়েছে ব্যক্তিদের অধিকাংশ, যাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া

---

* [মার্জিনে এঙ্গেলসের টীকা:] সিস্‌মন্দি।

হয়েছে এইসব শক্তি, যারা এইভাবে সমস্ত সত্যিকারের সঞ্জীবন-মর্মবস্তু থেকে বঞ্চিত হয়ে বিমূর্ত ব্যক্তি হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবু কেবল এই ব্যাপারটার ফলেই তারা **ব্যক্তিগণ হিসেবে** পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবার মতো অবস্থায় এসেছে।

উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে এবং তাদের নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্গে তাদের এখনও সংযুক্ত রেখেছে একটামাত্র গ্রন্থি, সেটা হল শ্রম; এই শ্রমের আত্মসক্রিয়তার কোন উপাদানই আর নেই, সেটা তাদের জীবন [৬৬] বজায় রাখে শুধু সেটাকে খর্ব ক'রে। যদিও একদিকে, পূর্ববর্তী কালপর্যায়গুলিতে আত্মসক্রিয়তা এবং বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন ছিল সংযোগচ্যুত, কেননা সে-দুটো থাকত পৃথক পৃথক লোকের হাতে, আর যদিও ব্যক্তিদের নিজেদের সংকীর্ণতার দরুন বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন আত্মসক্রিয়তার একটা নিকৃষ্ট প্রণালী বলে বিবেচিত হত, এখন সে-দুটো এতই ভিন্নমুখী যাতে বৈষয়িক জীবন প্রতীয়মান হয় একেবারেই পরিণতি বলে, আর এই বৈষয়িক জীবনটাকে যা পয়দা করে সেই শ্রম (যা এখন একমাত্র সম্ভাব্য কিন্তু, আমরা যেমনটা দেখি, আত্মসক্রিয়তার নঞর্থক রূপী) প্রতীয়মান হয় উপায় হিসেবে।

[১০। ব্যক্তিগত মালিকানা লোপের অপরিহার্যতা, পরিবেশ এবং পরিণতি]

এইভাবে ব্যাপারটা এখন এমন অবস্থায় এসেছে, যাতে উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিদ্যমান সাকল্যটাকে ব্যক্তিদের ভোগ-দখল করা চাই, সেটা আত্মসক্রিয়তা লাভ করার জন্যেই শুধু নয়, অধিকন্তু তাদের অস্তিত্বটাকেই স্রেফ রক্ষা করার জন্যেও।

এই ভোগ-দখল প্রথমে নির্ধারিত হয় যা ভোগ-দখল করতে হবে সেই বস্তুটা দিয়ে, সেটা হল উৎপাদন-শক্তিসমূহ, যা একটা সাকল্যের মাত্রায় উন্নত হয়েছে, যেটার অস্তিত্ব শুধু একটা সর্বব্যাপী সংসর্গের মাঝে। কাজেই কেবল এই দিকটা থেকেই, উৎপাদন-শক্তিসমূহের এবং সংসর্গের সঙ্গে মানানসই সর্বব্যাপী প্রকৃতি থাকা চাই এই ভোগ-দখলের। এইসব শক্তির ভোগ-দখল আপনাতে উৎপাদনের বৈষয়িক হাতিয়ারগুলির সঙ্গে মানানসই

বিশেষ বিশেষ সামর্থ্যের বিকাশের চেয়ে বেশি কিছু নয়। ঠিক এই কারণেই উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহের সাকল্যটার ভোগ-দখল হল ব্যক্তিদের নিজেদের মাঝে সামর্থ্যসমূহের একটা সাকল্যের বিকাশ।

যেসব লোকে ভোগ-দখল করে তাদের দিয়েও নির্ধারিত হয় এই ভোগ-দখল। এখনকার দিনের প্রলেতারিয়ানরা, যারা সমস্ত আত্মসক্রিয়তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বহির্ভূত, কেবল তারাই যা পূর্ণাঙ্গ এবং আর সীমাবদ্ধ নয় এমন আত্মসক্রিয়তা লাভ করার মতো অবস্থায় আছে, সেই আত্মসক্রিয়তা নিহিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের সাকল্যটাকে ভোগ-দখলের মাঝে এবং সামর্থ্যসমূহের সাকল্যের এইভাবে নির্দিষ্ট বিকাশের মাঝে। পূর্ববর্তী সমস্ত বৈপ্লবিক ভোগ-দখল ছিল সীমাবদ্ধ; উৎপাদনের আনাড়ি হাতিয়ার এবং গণ্ডিবদ্ধ সংসর্গ দিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল যাদের আত্মসক্রিয়তা এমনসব ব্যক্তি ভোগ-দখল করেছিল উৎপাদনের [৬৭] এই আনাড়ি হাতিয়ার, এই কারণে তারা পেঁছেছিল শুধু একটা নতুন সীমাবদ্ধাবস্থায়। তাদের উৎপাদনের হাতিয়ার হয়েছিল তাদের সম্পত্তি, কিন্তু তারা নিজেরা থেকে গিয়েছিল শ্রমবিভাগ এবং তাদের নিজেদের উৎপাদনের হাতিয়ারের অধীন। এখন অবধি সমস্ত ভোগ-দখলে বিপুল ব্যক্তিরাশি থেকে গিয়েছিল উৎপাদনের একটামাত্র হাতিয়ারের বশবর্তী; প্রলেতারিয়ানদের ভোগ-দখলের বেলায় প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে উৎপাদনের একগাদা হাতিয়ার, আর সেগুলো হবে সবার সম্পত্তি। কাজেই, আধুনিক সর্বব্যাপী সংসর্গকে যখন নিয়ন্ত্রণ করবে সবাই, একমাত্র তখনই সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে ব্যক্তিরা।

এই ভোগ-দখল কিভাবে বলবৎ হবে তা দিয়েও সেটা নির্ধারিত হবে। এটা বলবৎ হতে পারে কেবল সম্মিলনীর দ্বারা, প্রলেতারিয়েতের আপনারই যা প্রকৃতি তাতে এই সম্মিলনীও হতে পারে কেবল সর্বব্যাপী, আর বলবৎ হতে পারে বিপ্লবের সাহায্যে, যে বিপ্লবে, একদিকে, পূর্ববর্তী উৎপাদন আর সংসর্গের প্রণালী এবং সামাজিক সংগঠনের ক্ষমতা উচ্ছেদ হবে, আর অন্যদিকে গড়ে ওঠে প্রলেতারিয়েতের সর্বব্যাপী প্রকৃতি আর কর্মশক্তি, যেটা ছাড়া বিপ্লব সম্পাদিত হতে পারে না; সে-বিপ্লবে আরও ঘটবে এটা: সমাজে প্রলেতারিয়েতের পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে তখনও তাতে যাকিছু জড়িয়ে থাকে সেগুলোর ভারমুক্ত হবে প্রলেতারিয়েত।

শুধু এই পর্বে আত্মসক্রিয়তা হয় বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, যেটা ব্যক্তির পূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া এবং সমস্ত স্বাভাবিক সীমাবদ্ধাবস্থা ঝেড়ে ফেলার জন্যে উপযুক্ত। আত্মসক্রিয়তায় শ্রমের রূপান্তরটা পূর্ববর্তী সীমাবদ্ধ সংসর্গের ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তিদের মধ্যে সংসর্গে রূপান্তরিত হবার প্রতিষঙ্গী হয়। সম্মিলিত ব্যক্তিগণের মারফত সমগ্র উৎপাদন-শক্তি ভোগ-দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটে। ইতিহাসে আগে কোন একটা বিশেষ পরিবেশ আপতিক বলে প্রতীয়মান হত, কিন্তু এখন ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্নতা এবং প্রত্যেকটি মানুষের বিশেষ নিজস্ব লাভ নিজেরাই হয়ে পড়ে আপতিক।

যারা আর [৬৮] শ্রমবিভাগের অধীন নয় সেই ব্যক্তিদের সম্বন্ধে দার্শনিকেরা ধারণা করেছেন 'মানুষ' বলে অভিহিত একটা আদর্শ হিসেবে। আমরা যে সমগ্র প্রক্রিয়াটার রূপরেখা দিয়েছি সেটাকে তাঁরা ধারণা করেছেন 'মানুষের' ক্রম-অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া হিসেবে, যাতে প্রত্যেকটা ইতিহাসক্রমিক পর্বে ব্যক্তিদের বদলি 'মানুষ' স্থাপন ক'রে সেটাকে দেখান হয়েছে ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে। এইভাবে সমগ্র প্রক্রিয়াটাকে ধারণা করা হয়েছে 'মানুষের' আত্ম-পরকীকরণ* প্রক্রিয়া হিসেবে, সেটা মূলত এই কারণে যে, কোন পরবর্তী পর্বের গড়পড়তা ব্যক্তিকে পূর্ববর্তী পর্বের উপর এবং কোন পরবর্তী যুগের চেতনাকে পূর্ববর্তী যুগের ব্যক্তিদের উপর প্রক্ষেপ করা হয়েছে সবসময়ে। এই ওলটান অবস্থাটা গোড়া থেকেই যথার্থ পরিবেশের একটা বিমূর্ত প্রতিমূর্তি — এটার সাহায্যে সমগ্র ইতিহাসকে চেতনার একটা অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল।

* * *

উৎপাদন-শক্তিসমূহের উন্নয়নের কোন নির্দিষ্ট পর্বের ভিতরে ব্যক্তিদের সমগ্র বৈষয়িক সংসর্গ জুড়ে থাকে নাগরিক সমাজ। কোন নির্দিষ্ট পর্বের বাণিজ্যিক আর শিল্প জীবন জুড়ে এটা থাকে এবং সেই পরিমাণে ছাড়িয়ে

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] আত্ম-পরকীকরণ।

যায় রাষ্ট্র আর জাতির পরিধি, যদিও অন্যদিকে এটাকে আবার বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই জাতিসত্তা হিসেবে, আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংগঠিত হওয়া চাই রাষ্ট্র হিসেবে। 'নাগরিক সমাজ' (সিভিল সোসাইটি) ['bürgerliche Gesellschaft']* অভিধাটা দেখা দিয়েছিল আঠার শতকে, যখন মালিকানা সম্পর্ক ইতঃপূর্বে প্রাচীন আর মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়িক সমাজ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। নাগরিক সমাজ বলতে ঠিক যা বোঝায় সেটা গড়ে ওঠে শুধু বুর্জোয়াদের সঙ্গে সঙ্গে; সরাসরি উৎপাদন আর বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত যে-সামাজিক সংগঠন সর্বকালে রাষ্ট্র এবং বাদবাকি আদর্শগত** উপরকাঠামের ভিত্তি, সেটাকে কিন্তু বরাবর ঐ একই নামে অভিহিত করা হয়েছে।

[১১।] সম্পত্তির সঙ্গে রাষ্ট্র আর আইনের সম্পর্ক

যেমন মধ্যযুগে তেমনি প্রাচীন দুনিয়ায় প্রথম আকারের সম্পত্তি হল গোষ্ঠীগত সম্পত্তি, যেটা নির্ধারিত হয় রোমকদের বেলায় প্রধানত যুদ্ধ দিয়ে, আর পশুপালন দিয়ে [৬৯] জার্মানদের বেলায়। প্রাচীন জাতিগুলির ক্ষেত্রে, কয়েকটা গোষ্ঠী এক শহরে একত্রে বসবাস করে ব'লে গোষ্ঠীগত সম্পত্তি প্রতীয়মান হয় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে, আর তাতে ব্যক্তির অধিকার নিছক 'ভোগ-অধিকার' হিসেবে প্রতীয়মান হয়, সেটা কিন্তু সমগ্রভাবে গোষ্ঠীগত সম্পত্তির মতো গণ্ডিবদ্ধ থাকে কেবল ভূমি-সম্পত্তিতেই। যেমন আধুনিক জাতিগুলি তেমনি প্রাচীনদের বেলায় সত্যিকারের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূত্রপাত হয় অস্থাবর সম্পত্তি দিয়ে। — (দাসপ্রথা আর সম্প্রদায়) (dominium ex jure Quiritum)***। মধ্যযুগে গড়ে-ওঠা জাতিগুলির ক্ষেত্রে, সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পত্তি, সংস্থাভুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি আর ম্যানুফ্যাকচারে বিনিয়োজিত

---

* 'Bürgerliche Gesellschaft'-এর অর্থ হতে পারে 'বুর্জোয়া সমাজ' কিংবা 'নাগরিক সমাজ'। — সম্পাঃ

** অর্থাৎ, ভাবগত, ভাবাদর্শগত। — সম্পাঃ

*** পূর্ণ রোমক নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী মালিকানা। — সম্পাঃ

পুঁজি, এইসব বিভিন্ন পর্বের ভিতর দিয়ে গিয়ে গোষ্ঠীগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায় আধুনিক পুঁজি, বৃহৎ শিল্প আর প্রতিযোগিতা দিয়ে নির্ধারিত আধুনিক পুঁজি, অর্থাৎ অবিমিশ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যা সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানের সমস্ত লক্ষণ ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, আর সম্পত্তির বিকাশের উপর যেকোন প্রভাব ফেলা থেকে রাষ্ট্রকে বাদ দিয়েছে। এই আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্র মানানসই; ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকেরা কর দিয়ে-দিয়ে এই রাষ্ট্রটাকে ক্রমে ক্রমে কিনে ফেলেছে, জাতীয় ঋণের কারণে সেটা সম্পূর্ণভাবেই চলে গেছে তাদের হাতে; সম্পত্তির মালিকেরা, বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রকে যে কারবারী ক্রেডিট দেয় তার উপর সেটার অস্তিত্ব পুরোপুরি নির্ভর করে, সেটা প্রকাশ পায় স্টক এক্সচেঞ্জে কম্পানির কাগজের ওঠা-নামাতে। বুর্জোয়ারা আর নয় একটা **সামাজিক বর্গ**, তারা তখন একটা **শ্রেণী**, কেবল এরই দরুন তারা স্থানীয়ভাবে আর নয়, দেশজোড়া পরিসরে সংগঠিত হতে, আর নিজ গড়-অনুযায়ী স্বার্থের একটা সাধারণ আকার দিতে বাধ্য হয়। সম্প্রদায় থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মুক্তির ফলে রাষ্ট্র হয়ে উঠল নাগরিক সমাজের পাশাপাশি এবং সেটার বাইরে একটা পৃথক সত্তা; কিন্তু অভ্যন্তরীণ আর বহিস্থ উভয় প্রয়োজনে, তাদের সম্পত্তি আর স্বার্থের পারস্পরিক নিশ্চয়তার জন্যে অপরিহার্য বলে বুর্জোয়ারা সংগঠনের এই আকারটাকে অবলম্বন করল, এটা তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। যেখানে সামাজিক বর্গগুলো এখনও পুরোপুরি শ্রেণীতে পরিণত হয় নি, অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলিতে যার পাট চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সামাজিক বর্গগুলোর একটা ভূমিকা যেখানে এখনও রয়েছে, আর যেখানে রয়েছে একটা মিশ্রণ, অর্থাৎ কিনা, যেখানে জনসমষ্টির কোন একটা অংশ অন্যান্যের উপর আধিপত্য কায়েম করতে পারে নি, কেবল সেইসব দেশেই আজকাল দেখা যায় রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য। অবস্থাটা তেমনিই বিশেষত জার্মানিতে। আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে নিখুঁত দৃষ্টান্ত হল উত্তর [৭০] আমেরিকা। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্যে, এই মত প্রকাশ করেন সমস্ত আধুনিক ফরাসী, ইংরেজ এবং মার্কিন গ্রন্থকারেরা, যাতে সাধারণ মানুষের চেতনায় ঢুকে গেছে এই তথ্যটা।

যেহেতু কোন একটা শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাদের সমস্বার্থ জাহির

করে রাষ্ট্র এই আকারটা দিয়ে, এই আকারটায় চুম্বকে মূর্ত হয় কোন যুগের সমগ্র নাগরিক সমাজটা, তার থেকে আসে এই অবস্থাটা: সমস্ত সাধারণী প্রতিষ্ঠানাদি গঠিত হয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে, আর এইসব প্রতিষ্ঠানাদি রাজনীতিক রূপ ধারণ করে। তার থেকে উদ্ভূত হয় এই বিভ্রমটা: বিধি-বিধানের ভিত্তি হল ইচ্ছা, সেটার বাস্তব ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ইচ্ছাই — **স্বাধীন** ইচ্ছা। তেমনি আবার ন্যায়ের বেলায় — সেটাকে বিদ্যমান আইন-কানুনে পর্যবসিত করা হয়।

স্বতঃস্ফূর্ত সম্প্রদায় ভেঙে পড়লে, তার মধ্য থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে দেওয়ানী আইন। রোমকদের বেলায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর দেওয়ানী আইনের বিকাশের দরুন আর কোন শিল্পগত আর বাণিজ্যিক পরিণতি ঘটে নি, কেননা তাদের সমগ্র উৎপাদন-প্রণালী বদলায় নি।* শিল্প আর বাণিজ্যের ফলে যেখানে সামন্ততান্ত্রিক সম্প্রদায় ভেঙে পড়েছিল সেইসব আধুনিক জাতির বেলায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর দেওয়ানী আইন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন পর্বের সূত্রপাত হয়, সেটার আরও বিকাশ ঘটতে পারে। মধ্যযুগে সর্বপ্রথমে ব্যাপক সামুদ্রিক বাণিজ্য করেছিল আমাল্‌ফি নামে শহর, সেখানে সামুদ্র আইনও গড়ে উঠেছিল (৩৫)। শিল্প আর বাণিজ্যের কল্যাণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আরও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে খুবই উন্নত রোমক দেওয়ানী আইন আবার অবিলম্বে অবলম্বিত এবং কর্তৃত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল — প্রথমে ইতালিতে, পরে অন্যান্য দেশে। পরে বুর্জোয়ারা এতই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল যাতে রাজ-রাজড়ারা বুর্জোয়াদের সাহায্যে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতকুলকে উচ্ছেদ করার জন্যে বুর্জোয়াদের স্বার্থের জিম্মাদার হয়েছিল, তখন সমস্ত দেশে শুরু হয়েছিল — ফ্রান্সে ষোল শতকে — আইনের সত্যিকারের বিকাশ, সেটা ইংলন্ড ছাড়া সমস্ত দেশে ঘটেছিল [৭১] রোমক আইন-সংহিতার ভিত্তিতে। ইংলন্ডেও দেওয়ানী আইনের বিকাশে আনুকূল্য করার জন্যে রোমক আইনের মূল উপাদানগুলি চালু করতে হয়েছিল (বিশেষত অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে)। (আইনের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে ধর্মেরই মতো সামানাই, এটা ভোলা চলে না।)

* [মার্জিনে এঙ্গেলসের টীকা:] (জোটা!)

দেওয়ানী আইনে বলা হয়, বিদ্যমান মালিকানা সম্পর্ক হল সাধারণ ইচ্ছার ফল। Jus utendi et abutendi* আপনিই সপ্রমাণ করে একদিকে এই তথ্যটা যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবেই সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে, আর অন্যদিকে এই বিভ্রমটা: ব্যক্তিগত সম্পত্তি আপনারই একমাত্র ভিত্তি হল স্বেচ্ছা, ইচ্ছামতো জিনিসের বিলি-বন্দেজ। কার্যক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক যদি তার সম্পত্তি, কাজেই, তার jus abutendi** অন্যান্য হাতে চলে যায় এমনটা না চায়, তাহলে abuti'-র*** বিভিন্ন নির্দিষ্ট আর্থনীতিক সীমাবদ্ধতা থাকে মালিকের পক্ষে, কেননা প্রকৃতপক্ষে, শুধু তার ইচ্ছার দিক থেকে দেখলে, জিনিসটা আদৌ কোন জিনিস নয়, সেটা জিনিস হয়ে ওঠে, সত্যিকারের সম্পত্তি হয়ে ওঠে শুধু সংসর্গের মাঝে এবং আইনের থেকে অনপেক্ষভাবে (যেটা হল একটা **সম্পর্ক**, যেটাকে দার্শনিকেরা বলেন একটা ভাব****)। এই আইনগত বিভ্রমটা আইনকে নিছক পর্যবসিত করে, — মালিকানা সম্পর্কের আরও বিকাশের ধারায় এই বিভ্রমটা অনিবার্যভাবেই পৌঁছে যায় এই মতাবস্থানে: একজনের কোন একটা জিনিস প্রকৃতপক্ষে না থাকলেও সেটাতে তার আইনগত স্বত্ব থাকতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা জমি-বন্দ থেকে আয় প্রতিযোগিতার দরুন খোয়া গেলে জমিটাতে jus utendi et abutendi সহ আইনগত স্বত্ব মালিকের নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু সেটা দিয়ে সে করতে পারে না কিছুই: জমিটা ছাড়াও তদুপরি সেটায় চাষবাস করার মতো যথেষ্ট পুঁজি না থাকলে ভূমি-মালিক হিসেবে সে কিছুরই অধিকারী নয়। ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করে (যেমন চুক্তি), এটা ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞদের কাছে, যেমন প্রত্যেকটা সংহিতার কাছে একেবারেই আপতিক, এই তথ্যটারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাদের ঐ বিভ্রমটা থেকে; এইসব সম্পর্ক স্থাপিত হতে [পারে] কিংবা নাও পারে

---

* কোন জিনিস ব্যবহার করার এবং পরিভোগ করার (অপব্যবহার করারও), অর্থাৎ ইচ্ছামতো বিলি-বন্দেজ করার অধিকার। — সম্পাঃ

** অপব্যবহারের অধিকার। — সম্পাঃ

*** পরিভোগ করা কিংবা অপব্যবহার করা। — সম্পাঃ

**** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] **দার্শনিকদের পক্ষে সম্পর্ক=ভাব।** তাঁরা জানেন শুধু 'মানুষের' নিজের সঙ্গে সম্পর্ক, কাজেই তাঁদের কাছে সমস্ত হয়ে দাঁড়ায় ভাব।

ইচ্ছামতো, [৭২] আর সেগুলোর মর্মবস্তুর অবলম্বন হল চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলির স্রেফ [স্বাধীন] ইচ্ছা, এমনটা তারা কেন বিবেচনা করে তা বোঝা যায় তাদের ঐ বিভ্রমটা থেকে।

শিল্প আর বাণিজ্যের প্রসারের কল্যাণে যখনই নতুন নতুন ধরনের সংসর্গ দেখা দিয়েছে (যেমন, বিমা কম্পানি, ইত্যাদি), তেমন সমস্ত ক্ষেত্রে আইন সেগুলোকে সম্পত্তি অর্জনের উপায়গুলোর মধ্যে ধরতে বাধ্য হয়েছে।*

[১২। সামাজিক চেতনার বিভিন্ন আকার]

বিজ্ঞানের উপর শ্রমবিভাগের প্রভাব।

রাষ্ট্র, অধিকার, নৈতিকতা, ইত্যাদি ব্যাপারে **নিগ্রহের** ভূমিকা।

আইনে বুর্জোয়াদের নিজেদের একটা সাধারণ অভিব্যক্তি দিতে হয়, সেটা ঠিক এই কারণে যে, তারা শাসন চালায় একটা শ্রেণী হিসেবে।

প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং ইতিহাস।

রাজনীতি, আইন, বিজ্ঞান, ইত্যাদির, কলাবিদ্যা, ধর্ম, ইত্যাদির কোন ইতিহাস নেই।**

ভাবাদর্শীবিদেরা সবকিছুকে উলটে-পালটে ধরেন কেন।

ধর্মওয়ালারা, ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা, রাজনীতিকরা।

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা, রাজনীতিকরা (সাধারণভাবে রাষ্ট্রনায়কেরা), নীতিবাদীরা, ধর্মওয়ালারা।

---

* পরে, পান্ডুলিপির শেষে মার্কসের হাতে লেখা বিভিন্ন টীকা আছে, সেগুলিকে তিনি আরও বিশদ করতে মনস্থ করেছিলেন। — সম্পাঃ

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] প্রাচীন রাষ্ট্রে, সামন্ততন্ত্রে এবং নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে 'সম্প্রদায়' যেমনটা প্রতীয়মান হয় তার, এই বন্ধনের প্রতিষঙ্গী হল বিশেষত বিভিন্ন (আধ্যাত্মিক) ধর্মীয় ধারণা।

একটা শ্রেণীর ভিতরে এই ভাবাদর্শগত শাখা-বিভাগের জন্যে, ১) **শ্রমবিভাগের দরুন বৃত্তি একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধারণ করে;** প্রত্যেকে মনে করে, তার বৃত্তিটাই আসল বৃত্তি। তাদের বৃত্তি এবং বাস্তবতার মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভ্রমের কাছে তাদের আরও সহজে বশীভূত করায় তাদের বৃত্তির প্রকৃতিটাই। তাদের চেতনায়, ব্যবহারসংহিতায়, রাজনীতিতে, এবং এইরকমের অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পর্কগুলো হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন ধারণা; তারা এইসব সম্পর্ক ছাড়িয়ে যায় না বলে সম্পর্কগুলো সম্বন্ধে ধারণাও তাদের মনে হয়ে দাঁড়ায় বদ্ধ ধারণা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচারক সংহিতা প্রয়োগ করে, কাজেই আইনগুলোকে সে আসল, সক্রিয় চালিকাশক্তি বলে বিবেচনা করে। মালের প্রতি তাদের সমীহ, কেননা তাদের বৃত্তির কাজকর্ম সাধারণ বিষয়াবলি নিয়ে।

ন্যায় সম্বন্ধে ধারণা। রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা। **প্রচলিত** চেতনায় ব্যাপারটা উলটে-পালটে দাঁড়ায়।

একেবারে শুরু থেকেই ধর্ম হল যা **অতিপ্রাকৃত** সে-সম্বন্ধে **সত্যিকারের** অপরিহার্যতা থেকে উদ্ভূত চেতনা।

এটা অপেক্ষাকৃত জন-প্রচলিত।

আইন, ধর্ম, ইত্যাদি প্রসঙ্গে ঐতিহ্য।

* * *

[৭৩]* ব্যক্তিরা সবসময়ে শুরু করেছে এবং সবসময়ে শুরু করে নিজেদের থেকে। তাদের সম্পর্কগুলো তাদের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক।

* পাণ্ডুলিপিতে এই শেষ পৃষ্ঠাটা সংখ্যাচিহ্নিত নয়। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণা বিষয়ে গ্রন্থকারদ্বয়ের ব্যাখ্যানের সূচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন টীকা এতে রয়েছে। এখানে ব্যক্ত ভাব-ধারণাগুলিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে পরিচ্ছেদটার ১ম ভাগের ৩য় বিভাগে। — সম্পাঃ

তাদের সম্পর্কগুলো তাদের বিপরীতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে, এমনটা হয় কেমন করে? আর কেমন করে এমনটা হয় যে, তাদের নিজেদেরই জীবনের বলগুলো তাদের অভিভূত করে?

সংক্ষেপে: **শ্রমবিভাগ,** যেটার মাত্রা যেকোন বিশেষ সময়ে নির্ভর করে উৎপাদন-ক্ষমতার বিকাশের উপর।

ভূমি-সম্পত্তি। সম্প্রদায়গত সম্পত্তি। সামন্ততান্ত্রিক। আধুনিক।

সামাজিক-বর্গীয় সম্পত্তি। ম্যানুফ্যাকচারের সম্পত্তি। শিল্পক্ষেত্রের পুঁজি।

১৮৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের অগস্ট মাসের মধ্যে ব্রাসেলসে মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখা

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ছাপা হল জার্মান থেকে ইংরেজী তরজমার ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ (৩৬)

১ নং প্রশ্ন: কমিউনিজম কি?

উত্তর: কমিউনিজম হল প্রলেতারিয়েতের মুক্তির জন্যে আবশ্যক পরিবেশ সংক্রান্ত মতবাদ।

২ নং প্র: প্রলেতারিয়েত কি?

উ: প্রলেতারিয়েত হল সমাজের সেই শ্রেণী যেটা জীবনোপায় যোগাড় করে সম্পূর্ণভাবে এবং শুধু শ্রম বিক্রি করে, কোন পুঁজি থেকে পাওয়া লাভ দিয়ে নয়; যেটার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, জীবন-মরণ, সমগ্র অস্তিত্ব নির্ভর করে শ্রমের জন্যে চাহিদার উপর, কাজেই, ব্যবস্থা-বাণিজ্যের ভাল আর খারাপ দিনকালের পালা-বদলের উপর, লাগামছাড়া প্রতিযোগিতার ওঠা-পড়ার উপর। এককথায়, প্রলেতারিয়েত, বা প্রলেতারিয়ানদের শ্রেণী হল উনিশ শতকের শ্রমিক শ্রেণী।

৩ নং প্র: তাহলে, প্রলেতারিয়ানরা সবসময়েই ছিল না কি?

উ: না। গরিব লোক আর মেহনতী শ্রেণী সবসময়েই থেকেছে; মেহনতী শ্রেণীগুলির বেশির ভাগই ছিল গরিব। কিন্তু এখনই যে পরিবেশের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে থেকেছে যেসব গরিব লোক, যেসব মেহনতী মানুষ, অর্থাৎ প্রলেতারিয়ানরা তারা সবসময়ে ছিল না, যেমন কিনা প্রতিযোগিতাও সবসময়ে ছিল না অবাধ আর লাগামছাড়া।

৪ নং প্র: প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব হল কিভাবে?

উ: গত শতকের শেষার্ধে ইংলন্ডে উদ্ভূত হয়েছিল শিল্প-বিপ্লব, তার পর থেকে সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে পৃথিবীর সমস্ত দেশে — সেই শিল্প-

বিপ্লবের ফলে প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব। স্টীম ইঞ্জিন, বিভিন্ন সূতা-কাটার যন্ত্র, যান্ত্রিক তাঁত এবং বহুসংখ্যক অন্যান্য কল-কব্জা উদ্ভাবনের ফলে ঘটেছিল এই শিল্প-বিপ্লব। এইসব যন্ত্রপাতি ছিল খুবই ব্যয়বহুল, কাজেই সেগুলো কিনতে পারত কেবল বড় বড় পুঁজিপতিরাই, সেগুলো তদবধি বর্তমান সমগ্র উৎপাদন-প্রণালীটাকে বদলে দিল এবং তদবধি বর্তমান শ্রমিকদের হটিয়ে দিল, কেননা আনাড়ি চরকা আর হাতে চালান তাঁতে শ্রমিকেরা যা করত তার চেয়ে সস্তা আর সরেস পণ্য উৎপন্ন হল যন্ত্রে। এইভাবে এইসব যন্ত্র প্রচলনের ফলে শিল্প পুরোপুরি চলে গেল বড় বড় পুঁজিপতিদের হাতে, শ্রমিকদের সামান্য সম্পত্তি (হাতিয়ার, হাতে চালান তাঁত, ইত্যাদি) হয়ে পড়ল অকেজো, এইভাবে অচিরেই পুঁজিপতিরা হয়ে গেল সবকিছুর মালিক, শ্রমিকদের হাতে থাকল না কিছু। এইভাবে বোনা জিনিস উৎপাদনের ক্ষেত্রে চালু হয়েছিল কারখানা প্রণালী। — যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করায় এবং কারখানা প্রণালীতে যেই বেগ সঞ্চারিত হল অমনি কারখানা প্রণালী দ্রুত ঢুকে পড়ল অন্যান্য সমস্ত শাখায়, বিশেষত কাপড় বোনা আর বই-ছাপার বৃত্তিতে, মৃৎশিল্পে এবং লোহালক্কড় শিল্পে। কাজ ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে ভাগ-ভাগ হয়ে পড়তে থাকল বহু শ্রমিকের মধ্যে, তাতে যে-শ্রমিক আগে তৈরি করত গোটা জিনিসটা সে পয়দা করতে থাকল জিনিসটার একটা অংশ। এই শ্রমবিভাগের ফলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং কাজেই অপেক্ষাকৃত সস্তায় জাতদ্রব্যের যোগান সম্ভব হয়ে উঠল। এর ফলে প্রত্যেকটি শ্রমিকের কাজ খুবই সরল, অনবরত পুনরাবৃত্ত যান্ত্রিক ক্রিয়াপ্রণালীতে পরিণত হল, তাতে কাজটা যন্ত্র করতে পারে সমানই ভালভাবেই শুধু নয়, ঢের বেশি ভালভাবেই। এইভাবে, ঠিক সুতা-কাটা আর কাপড়-বোনা শিল্পেরই মতো শিল্পের ঐ সমস্ত শাখা একটার পরে একটা পড়ে গেল স্টীম-শক্তি, যন্ত্রপাতি আর কারখানা প্রণালীর দখলে। কিন্তু ঐ সমস্ত শিল্প বড় বড় পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেল তার ফলে, আর এক্ষেত্রেও শ্রমিকদের স্বাধীনতার লেশমাত্রও অবশিষ্ট রইল না। যথার্থ ম্যানুফ্যাকচার ছাড়াও তেমনিভাবে হস্তশিল্পও ক্রমাগত বেশি পরিমাণে চলে গেল কারখানা প্রণালীর দখলে, কেননা এক্ষেত্রেও বড় বড় পুঁজিপতিরা বড় বড় কর্মশালা বসিয়ে খুদে মালিকদের ক্রমাগত বেশি পরিমাণে ঠেলে

দিয়েছিল একধারে। ঐসব কর্মশালায় অনেকটা সাশ্রয় হত, আর কাজও সুবিধাজনকভাবে ভাগ করে দেওয়া যেত শ্রমিকদের মধ্যে। এইভাবে অবস্থাটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সমস্ত সভ্য দেশে শ্রমের প্রায় সমস্ত শাখায়ই কাজ চলে কারখানা প্রণালীতে, এগুলির প্রায় সমস্ত শাখায় হস্তশিল্প আর ম্যানুফ্যাকচারকে উচ্ছেদ করেছে বৃহদায়তনের শিল্প। — ফলে, আগেকার মধ্যশ্রেণীগুলি, বিশেষত অপেক্ষাকৃত খুদে মালিক হস্তশিল্পীরা ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে জেরবার হয়ে গেছে, শ্রমিকদের আগেকার অবস্থান বদলে গেছে একেবারেই, আর দেখা দিয়েছে দুটো নতুন শ্রেণী, যারা অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীকে ক্রমে ক্রমে আত্মভূত করছে, এই শ্রেণী-দুটো হল:

এক। বড় বড় পুঁজিপতিদের শ্রেণী; সেটা সমস্ত সভ্য দেশে ইতোমধ্যে প্রায় সমগ্রভাবেই সমস্ত জীবনোপায়ের এবং এইসব জীবনোপায় উৎপাদনের জন্যে আবশ্যক কাঁচামাল আর সাধিত্রের (যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, ইত্যাদির) মালিক। এটা হল বুর্জোয়া শ্রেণী বা বুর্জোয়ারা (bourgeoisie)।

দুই। সেই শ্রেণীটা যারা একেবারে কিছুরই মালিক নয়, যারা কাজে-কাজেই বুর্জোয়াদের কাছে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য সেটার বিনিময়ে অত্যাবশ্যক জীবনোপায় জোটাবার জন্যে। এই শ্রেণীটাকে বলা হয় প্রলেতারিয়ান শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েত।

৫ নং প্র: বুর্জোয়াদের কাছে প্রলেতারিয়ানদের এই শ্রম-বেচা চলে কোন্ পরিবেশে?

উ: অন্য যেকোন পণ্যের মতো শ্রমও একটা পণ্য; অন্য যেকোন পণ্যের মতো একই নিয়মে এটার দাম স্থির হয়। আমরা পরে দেখতে পাব বৃহদায়তনের শিল্প আর অবাধ প্রতিযোগিতা বলতে বোঝায় একই জিনিস — এটার কিংবা ওটার দখলে পণ্যের গড় দাম সবসময়েই পণ্যটার উৎপাদন পরিব্যয়ের সমান। কাজেই, তেমনি শ্রমের দামও শ্রম উৎপাদনের পরিব্যয়ের সমান। শ্রমিকটি যাতে লুপ্ত হয়ে না যায়, সেজন্যে যে-পরিমাণ জীবনোপায় আবশ্যক সেটাই শ্রম উৎপাদনের পরিব্যয়। এইভাবে, ঐজন্যে যা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি শ্রমিক পাবে না তার শ্রম বাবত; জীবিকানির্বাহের জন্যে আবশ্যক সবচেয়ে কম, ন্যূনকল্প পরিমাণ হবে শ্রমের দাম বা মজুরি। যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্য চলে কখনও একটু মন্দ, কখনও একটু ভাল, তাই শ্রমিক পায় কখনও

একটু বেশি, কখনও একটু কম, ঠিক যেমন কারখানার মালিক তার পণ্য বাবত পায় কখনও একটু বেশি, কখনও একটু কম। কিন্তু ঠিক যেমন, দিনকাল ভালই হোক আর খারাপই হোক, কারখানা মালিক তার পণ্য বাবত গড়ে পায় সেটার উৎপাদন পরিব্যয়ের চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়, তেমনি শ্রমিকও গড়ে পাবে সেই ন্যূনকল্প পরিমাণের চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়। শ্রমের সমস্ত শাখা যত বেশি পরিমাণে চলে যাবে বৃহদায়তনের শিল্পের হাতে ততই বেশি কড়াকড়ি করে প্রযুক্ত হতে থাকবে মজুরি সংক্রান্ত এই আর্থনীতিক নিয়ম।

৬ নং প্র: শিল্প-বিপ্লবের আগে কোন্ কোন্ মেহনতী শ্রেণী ছিল?

উ: সমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্ব অনুসারে মেহনতী শ্রেণীগুলির জীবনযাত্রার পরিবেশ ছিল বিভিন্ন, আর মনিব এবং শাসক শ্রেণীগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল বিভিন্ন। প্রাচীনকালে মেহনতী জনগণ ছিল তাদের মালিকদের **দাস,** ঠিক যেমনটা এখনও তারা রয়েছে অনেক অনগ্রসর দেশে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশেও। মধ্যযুগে তারা ছিল ভূস্বামী অভিজাতকুলের মালিকানাধীন **ভূমিদাস,** ঠিক যেমনটা তারা এখনও রয়েছে হাঙ্গেরিতে, পোল্যান্ডে আর রাশিয়ায়। মধ্যযুগে এবং শিল্প-বিপ্লব অবধি আরও ছিল পেটি-বুর্জোয়া মনিবদের কাজে নিযুক্ত হস্তশিল্পীরা, আর ম্যানুফ্যাকচারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকদের উদ্ভব ঘটেছিল, এখন তাদের খাটায় কমবেশি বড় বড় পুঁজিপতিরা।

৭ নং প্র: দাস থেকে প্রলেতারিয়ানের পার্থক্যটা কোন্ দিক থেকে?

উ: দাস বিকিয়ে যায় সরাসরি পুরোপুরি, প্রলেতারিয়ান বিকোয় দিনে-দিনে, ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। প্রত্যেকটি ব্যক্তি-দাস কোন **একক** মালিকের সম্পত্তি - আর কিছু না হলেও অন্তত মালিকের স্বার্থের খাতিরে এই দাসের জীবনোপায় নিশ্চিত থাকে, সেটা যত অকিঞ্চিৎকরই হোক; ব্যক্তি-প্রলেতারিয়ান যেন গোটা বুর্জোয়া **শ্রেণীর** সম্পত্তি, যখন কারও প্রয়োজন হয় কেবল তখনই তার শ্রম কেনা হয়, তার জীবনোপায়ের কোন নিশ্চয়তা নেই। জীবনোপায় নিশ্চিত থাকে শুধু সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়ান **শ্রেণীর** জন্যে। দাস থাকে প্রতিযোগিতার বাইরে, প্রলেতারিয়ানের অবস্থান সেটার ভিতরে। সেটার যাবতীয় ওঠা-পড়া তাকে মালুম করতে হয়। নাগরিক

সমাজের একজন সদস্য হিসেবে নয় — দাস গণ্য হয় জিনিস হিসেবে; লোক হিসেবে, নাগরিক সমাজের সদস্য হিসেবে ধরা হয় প্রলেতারিয়ানকে। এইভাবে, দাসের জীবনযাত্রা প্রলেতারিয়ানের চেয়ে ভাল হতে পারে, কিন্তু প্রলেতারিয়ান হল সমাজ বিকাশের একটা উচ্চতর পর্বের মানুষ, তার অবস্থান দাসের চেয়ে উপরের স্তরে। কেবল দাসপ্রথার সম্পর্ক ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দাস মুক্তি লাভ করে, এবং সেইভাবে নিজে হয়ে যায় প্রলেতারিয়ান; প্রলেতারিয়ান মুক্তি লাভ করতে পারে শুধু সাধারণভাবে সমগ্র ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ ক'রে।

৮ নং প্র: ভূমিদাস থেকে প্রলেতারিয়ানের পার্থক্যটা কোন্ দিক থেকে?

উ: উৎপাদনের কোন সাধিত্র, একটা জমি-বন্দ থাকে ভূমিদাসের দখলে, তার ব্যবহারের জন্যে — সেটার বদলে সে উৎপাদের একটা অংশ দিয়ে দেয় কিংবা খাটে। প্রলেতারিয়ান উৎপাদনের যে-সাধিত্র দিয়ে কাজ করে সেটা অপরের, সে কাজ করে সেই লোকের জন্যে, আর তার বাবত সে পায় উৎপাদের একাংশ। ভূমিদাস দেয়, প্রলেতারিয়ানকে দেওয়া হয়। ভূমিদাসের জীবনোপায়ের নিশ্চয়তা থাকে, প্রলেতারিয়ানের তা থাকে না। ভূমিদাস থাকে প্রতিযোগিতার বাইরে, প্রলেতারিয়ানের অবস্থান সেটার মাঝে। ভূমিদাস মুক্ত হয় এইভাবে: হয় সে পালিয়ে শহরে গিয়ে সেখানে হয় হস্তশিল্পী, নইলে জমিদারকে শ্রম আর জাতদ্রব্যের বদলে টাকা দিয়ে হয় স্বাধীন পাট্টাদার, নইলে সামন্ত মালিককে তাড়িয়ে দিয়ে সে নিজেই হয়ে ওঠে মালিক, এককথায়, কোন-না-কোন উপায়ে সে এসে যায় মালিক শ্রেণী আর প্রতিযোগিতার কাতারে। প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সমস্ত শ্রেণীগত পার্থক্য লোপ করে মুক্ত হয় প্রলেতারিয়ান।

৯ নং প্র: হস্তশিল্পী থেকে প্রলেতারিয়ানের পার্থক্য কোন্ দিক থেকে?*

১০ নং প্র: ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিক থেকে প্রলেতারিয়ানের পার্থক্য কোন্ দিক থেকে?

উ: ষোল থেকে আঠার শতকে প্রায় সর্বত্রই ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকের

* এরপরে পাণ্ডুলিপিতে এঙ্গেলস উত্তরটা দেবার জন্যে একটা জায়গা খালি রেখেছেন। — সম্পাঃ

মালিকানায় থাকত তার উৎপাদনের হাতিয়ার, হাত-তাঁত, পারিবারিক চরকাগুলো, আর ছোট্ট জমি-বন্দ, যাতে সে অবসর-সময়ে চাষবাস করত। প্রলেতারিয়ানের নেই এর কিছুই। জমিদার কিংবা মালিকের সঙ্গে কমবেশি গোষ্ঠীতান্ত্রিক সম্পর্কের মাঝে ম্যানুফ্যাক্টরির শ্রমিক প্রায় সম্পূর্ণতই থাকে গ্রামাঞ্চলে; প্রলেতারিয়ানরা প্রায় সবাই থাকে বড় বড় শহরে, মনিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিছক আর্থিক সম্পর্ক। ম্যানুফ্যাক্টরির শ্রমিককে তার গোষ্ঠীগত পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নেয় বৃহদায়তনের শিল্প, তখনও তার যা সম্পত্তি ছিল সেটা খোয়া গিয়ে সে হয়ে পড়ে প্রলেতারিয়ান।

১১ নং প্র: শিল্প-বিপ্লব, এবং বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে সমাজের বিভাগের সরাসর ফলাফল হয়েছিল কী?

উ: প্রথমত, যন্ত্রে কাজের ফলে শিল্পজাতদ্রব্যের দাম সমানে কমে যাচ্ছিল ব'লে কায়িক শ্রমের ভিত্তিতে চালান ম্যানুফ্যাকচার কিংবা শিল্পের পুরন প্রণালীটা পৃথিবীর সমস্ত দেশে একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত আধা-বর্বর দেশ তদবধি ইতিহাসক্রমিক বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তখন অবধি ঐসব দেশের শিল্পের ভিত্তি ছিল ম্যানুফ্যাকচার, — ঐ প্রক্রিয়ার প্রভাবে সেইসব দেশের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটেছিল। ইংরেজদের অপেক্ষাকৃত সস্তা পণ্যদ্রব্য তারা কিনত, এবং নিজেদের ম্যানুফ্যাক্টরির শ্রমিকদের তারা ধ্বংস হয়ে যেতে দিয়েছিল। হাজার হাজার বছর ধরে বদ্ধতায় বিড়ম্বিত দেশগুলিতে আদ্যোপান্ত আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল এইভাবে, যেমন ভারতে, এমনকি চীনও এখন এগিয়ে চলেছে বিপ্লবের দিকে। আজ ইংলন্ডে উদ্ভাবিত একটা যন্ত্র বছরখানেকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের দৈনন্দিন অন্ন কেড়ে নেয় চীনে, এমনটা ঘটে ঐভাবেই। বৃহদায়তনের শিল্প এইভাবে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়েছে, ছোট ছোট সমস্ত স্থানীয় বাজারকে একত্রিত করে গড়ে তুলেছে বিশ্ব-বাজার, সভ্যতা আর প্রগতির পথ সুগম করেছে সর্বত্র, আর সবকিছু পৌঁছেছে এমন একটা মাত্রায় যেখানে সভ্য দেশগুলিতে যাকিছু ঘটে সেগুলোর প্রতিক্রিয়া ঘটে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশে। এইভাবে, ইংলন্ডে কিংবা ফ্রান্সে শ্রমিকেরা এখন নিজেদের মুক্ত করে নিলে সেটা বিপ্লব ঘটাবেই অন্যান্য সমস্ত দেশে, সেই বিপ্লবের ফলে ঐসব দেশেও শ্রমিকদের মুক্তি আসবে আগেপিছে।

দ্বিতীয়ত, যেখানেই ম্যান্যুফ্যাকচারের জায়গায় এসেছে বৃহদায়তনের শিল্প, সেখানে শিল্প-বিপ্লব বুর্জোয়াদের, তাদের ধনদৌলত আর ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত ক'রে তাদের করে তুলেছে সংশ্লিষ্ট দেশের সর্বপ্রথম শ্রেণী। তার ফল হয়েছে এই: যেখানেই সেটা ঘটেছে সেখানে বুর্জোয়ারা রাজনীতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে উচ্ছেদ করেছে তদবধি বিদ্যমান শাসক শ্রেণীগুলোকে — অভিজাতকুলকে, গিল্ডের মনিবদের এবং এই দুইয়ের প্রতিভূ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে। দায়াদী সম্পত্তি হস্তান্তরণ-বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা বা ভূমি-সম্পত্তি বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং উচ্চ-খেতাবধারীদের বিশেষ অধিকার লোপ ক'রে বুর্জোয়ারা অভিজাতবর্গের, উচ্চ-খেতাবধারীদের ক্ষমতা চূর্ণ করেছিল। সমস্ত গিল্ড এবং বৃত্তিগত বিশেষ অধিকার লোপ ক'রে বুর্জোয়ারা চূর্ণ করেছিল গিল্ড-বার্গারদের ক্ষমতা। ঐ দুইয়ের জায়গায় তারা এনেছিল অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ সমাজের এমন ব্যবস্থা যাতে প্রত্যেকে শিল্পের যেকোন শাখায় রত হবার অধিকারী, যাতে আবশ্যক পুঁজির অভাব ছাড়া কিছু তাতে কারও পক্ষে বাধা হতে পারে না। কাজেই, অবাধ প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের অর্থ হল এই প্রকাশ্য ঘোষণাটা যে, অতঃপর সমাজের সদস্যদের পুঁজি যে-পরিমাণে অসম কেবল সেই পরিমাণেই তারা অসম, আর পুঁজি হল চূড়ান্ত ক্ষমতা, আর তার থেকে, পুঁজিপতিরা, বুর্জোয়ারা হয়ে দাঁড়াল সমাজের সর্বত্র প্রধান শ্রেণী। কিন্তু বৃহদায়তনের শিল্পের শুরুতে অবাধ প্রতিযোগিতা আবশ্যক, কেননা সমাজের একমাত্র এই অবস্থায়ই বৃহদায়তনের শিল্প বাড়তে পারে। অভিজাতবর্গ আর গিল্ড-বার্গারদের সামাজিক ক্ষমতা চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ারা চূর্ণ করল তাদের রাজনীতিক ক্ষমতাও। সমাজে সর্বপ্রধান শ্রেণী হয়ে উঠে বুর্জোয়ারা নিজেদের সর্বপ্রধান শ্রেণী বলে ঘোষণা করল রাজনীতিক্ষেত্রেও। সেটা তারা করল প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ক'রে — এই ব্যবস্থাটার ভিত্তি হল আইনের কাছে বুর্জোয়া সমতা, এবং অবাধ প্রতিযোগিতাকে আইনগত স্বীকৃতিদান, সেটা ইউরোপীয় দেশগুলিতে চালু হয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রূপে। এইসব নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে যাদের কিছু পরিমাণ পুঁজি থাকে কেবল তারাই, অর্থাৎ কিনা কেবল বুর্জোয়ারাই ভোটদাতা; এই বুর্জোয়ারা প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে,

আর এই বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা যোগান দিতে অস্বীকার করার অধিকার অনুসারে নির্বাচিত করে বুর্জোয়া সরকার।

তৃতীয়ত, যে-পরিমাণে বুর্জোয়া শ্রেণীকে সেই পরিমাণে প্রলেতারিয়েতকে গড়ে তুলল শিল্প-বিপ্লব। যে-মাত্রায় বুর্জোয়ারা ধনদৌলত লাভ করল, সেই মাত্রায় সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটল প্রলেতারিয়ানদের। যেহেতু প্রলেতারিয়ানদের কাজে নিয়োগ করতে পারে কেবল পুঁজি, আর যেহেতু পুঁজি বাড়তে পারে কেবল শ্রম নিযুক্ত করলে, তাই প্রলেতারিয়েতের বৃদ্ধি ঘটে ঠিক পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে। তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিপ্লব বুর্জোয়াদের আর প্রলেতারিয়ানদের জড়ো করে বড় শহরে, যেখানে শিল্প চালান সবচেয়ে লাভজনক; **একটা** জায়গায় এইভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জনরাশির যূথবদ্ধতা প্রলেতারিয়ানদের তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। তাছাড়া, শিল্প-বিপ্লব যত বেশি সম্প্রসারিত হয়, যত বেশি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়, যেগুলো উচ্ছেদ করে কায়িক শ্রমকে, বৃহদায়তনের শিল্প মজুরি নামিয়ে দেয় ততই ন্যূনকল্প মাত্রায়, যা আমরা আগেই বলেছি, এইভাবে প্রলেতারিয়েতের অবস্থা ক্রমাগত বেশি অসহনীয় হয়ে ওঠে। এইভাবে, একদিকে প্রলেতারিয়েতের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ দিয়ে এবং অন্যদিকে সেটার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দিয়ে শিল্প-বিপ্লব প্রলেতারিয়েতের সমাজ-বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে।

১২ নং প্র: শিল্প-বিপ্লবের অন্যান্য ফলাফল কি?

উ: যাতে অল্পকালের মধ্যে এবং সামান্য খরচায় অঢেল পরিমাণে শিল্পোৎপাদন বাড়ান সম্ভব তার উপায় শিল্প-বিপ্লব সৃষ্টি করল স্টীম ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্র দিয়ে। বৃহদায়তনের শিল্পের অপরিহার্য ফল হল অবাধ প্রতিযোগিতা, সেটা উৎপাদনের স্বচ্ছন্দতার কল্যাণে চরম মাত্রায় তীব্র হয়ে উঠল অচিরেই; বহুসংখ্যক পুঁজিপতি লেগে গেল শিল্পে, অচিরেই উৎপন্ন হল যা কাজে লাগান যেতে পারে তার চেয়ে বেশি। তার ফল ম্যানুফ্যাকচারের পণ্যদ্রব্যের কাটতি থাকল না, আর দেখা দিল তথাকথিত বাণিজ্যিক সংকট। কল-কারখানা অচল হয়ে থাকল, কল-কারখানার মালিকেরা হল দেউলিয়া, শ্রমিকদের অন্ন ঘুচল। শোচনীয় দুর্দশা লেগে গেল। কিছুকাল পরে উদ্বৃত্ত উৎপাদ বিক্রি হল। আবার চালু হল কল-কারখানা, মজুরি বাড়ল, ব্যবসা-

বাণিজ্য হল অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে তেজী। কিন্তু অনতিকাল পরেই আবার পণ্য উৎপন্ন হল বড় বেশি, লাগল আর-একটা সংকট, সেটারও গতিপথ হল আগেরটার মতো। এইভাবে, এই শতাব্দীর শুরু থেকে শিল্পের হাল বিভিন্ন বাড়বাড়ন্তের কালপর্যায় এবং সংকটের কালপর্যায়ের মধ্যে ওঠা-পড়া করেছে অবিরাম, অনুরূপ সংকট পুনরাবৃত্ত হয়েছে প্রায় নিয়মিতভাবে পাঁচ থেকে সাত বছর অন্তর-অন্তর, সেগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছে শ্রমিকদের যৎপরোনাস্তি অসহনীয় দুর্গতি, ব্যাপক বৈপ্লবিক আলোড়ন, আর সমগ্র বিদ্যমান ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিপদ।

১৩ নং প্র: নিয়মিতভাবে পুনরাবৃত্ত এইসব বাণিজ্যিক সংকট থেকে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছন যেতে পারে?

উ: প্রথমত, সিদ্ধান্ত হল, বিকাশের প্রারম্ভিক পর্বগুলিতে বৃহদায়তনের শিল্প আপনিই অবাধ প্রতিযোগিতা পয়দা করলেও এই শিল্পের বৃদ্ধি এখন অবাধ প্রতিযোগিতার পরিধি ছাপিয়ে গেছে; প্রতিযোগিতা এবং সাধারণভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা শিল্পোৎপাদন চালানটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃহদায়তনের শিল্পের পায়ে বেড়ির মতো, সেটাকে এই শিল্পের ভাঙা চাই এবং তা সে ভাঙবে; যতকাল সেটা চালান হবে এখনকার ভিত্তিতে, তাতে বৃহদায়তনের শিল্প টিকে থাকতে পারে শুধু সাত বছর অন্তর-অন্তর পুনরাবৃত্ত সাধারণ তালগোল পাকান অবস্থার ভিতর দিয়ে, সেটা প্রত্যেক বার প্রলেতারিয়ানদের ফেলে দেয় দুর্দশার গাড্ডায় শুধু তাই নয়, তেমনি আবার সর্বনাশ করে বহুসংখ্যক বুর্জোয়ার, এইভাবে সেটা প্রত্যেক বার বিপন্ন করে সমগ্র সভ্যতাকে; তার থেকে আসে এই অবস্থাটা: হয় বৃহদায়তনের শিল্প ছাড়তে হবে, যা একেবারেই অসম্ভব, নইলে এটা সম্পূর্ণভাবেই অপরিহার্য করে তোলে সমাজের একেবারে নতুন একটা সংগঠন, যেখানে কল-কারখানার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি-মালিকেরা আর নয়, সমগ্র সমাজ শিল্পোৎপাদন চালায় একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে এবং সবার চাহিদা অনুসারে।

দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্ত হল, বৃহদায়তনের শিল্প, এবং সেটা যে অঢেল উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব করেছে, এই দুইয়ে মিলে এমন একটা সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে যেখানে জীবনীয়সমূহ এমন বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে যাতে সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য পূর্ণতম মাত্রায় স্বাধীনভাবে তার অন্তর্নিহিত

শক্তি বিকশিত করতে এবং সমস্ত ক্ষমতা আর সামর্থ্য প্রয়োগ করতে পারবে। এইভাবে, বৃহদায়তনের শিল্পের ঠিক যে প্রকৃতিটা এখনকার দিনের সমাজে পয়দা করছে যাবতীয় দুর্দশা আর যাবতীয় বাণিজ্যিক সংকট, ঠিক সেটাই ভিন্ন সামাজিক সংগঠনের অবস্থায় ঠিক সেই দুর্দশা এবং এইসব বিপর্যয়কর ওঠা-পড়া খতম করবে।

এইভাবে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে:

১) যে সমাজব্যবস্থা আর বিদ্যমান পরিবেশের সঙ্গে মানানসই নয়, সম্পূর্ণভাবে সেটারই ক্রিয়া বলে এখন থেকে গণ্য করা যেতে পারে এই সমস্ত অমঙ্গলকে;

২) একটা নতুন সমাজব্যবস্থা স্থাপন করে এইসব অমঙ্গল পুরোপুরি লোপ করার উপায়-উপকরণ হাতের কাছে প্রস্তুত রয়েছে।

১৪ নং প্র: সেটাকে হতে হবে কোন্ রকমের নতুন সমাজব্যবস্থা?

উ: সর্বপ্রথমে, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতারত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের হাত থেকে শিল্প এবং উৎপাদনের সমস্ত শাখার পরিচালনা সমগ্রভাবে নিজ হাতে নিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা তার বদলে উৎপাদনের এই সমস্ত শাখা চালাবে সমগ্র সমাজের তরফে, অর্থাৎ একটা সামাজিক পরিকল্পনা অনুসারে, তাতে অংশগ্রহণ করবে সমাজের সমস্ত সদস্য। এইভাবে, সেটা প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় আনবে সম্মিলনী। যেহেতু ব্যক্তিরা শিল্প পরিচালনা করলে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী, আর যেহেতু প্রতিযোগিতা হল ব্যক্তি-মালিকদের শিল্প চালাবার ধরন ছাড়া কিছু নয়, তাই শিল্পের ব্যক্তিগত পরিচালনা এবং প্রতিযোগিতা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা অবিচ্ছেদ্য। কাজেই ব্যক্তিগত মালিকানাও খতম করতে হবে, আর তার বদলে আসবে [illegible] উৎপাদনের সমস্ত [illegible] সাধারণ প্রয়োগ এবং [illegible] ...াধারণ সম্মতি অনুসারে [illegible]

সমস্ত উৎপাদের বণ্টন, বা যাকে বলা যায় পণ্যদ্রব্য... ...সমূহের সমবায়। শিল্পের সম্প্রসারণ থেকে সমগ্র সমাজব্যবস্থার অবশ্যম্ভা... ...বী রূপান্তরের সবচেয়ে চাঁচাছোলা এবং সবচেয়ে বিশেষক চুম্বকের অ... ...ভিব্যক্তি হল ব্যক্তিগত মালিকানার লুপ্তি, কাজেই এটা-যে কমিউনিস্টদের ... তোলা প্রধান দাবি, সেটা সঠিক।

১৫ নং প্র: কাজেকাজেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা আগে অসম্ভব ছিল?

উ: ঠিক। সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটা পরিবর্তন, মালিকানা সম্পর্কের প্রত্যেকটা আমূল পরিবর্তন হল নতুন নতুন উৎপাদন-শক্তি পয়দা হবার অপরিহার্য ফল, এইসব উৎপাদন-শক্তি পুরন মালিকানা সম্পর্কের সঙ্গে আর মানানসই নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি আপনিই দেখা দিয়েছিল এইভাবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো বরাবর ছিল না, কিন্তু মধ্যযুগের শেষের দিকে চালু হয়েছিল একটা নতুন উৎপাদন-প্রণালী, সেটা হল ম্যানুফ্যাকচার, সেটা ছিল তখন বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক আর গিল্ডের সম্পত্তির সঙ্গে বেমানান, সেটা পুরন মালিকানা সম্পর্কের পরিধি ছাপিয়ে গিয়েছিল, সেই ম্যানুফ্যাকচার পয়দা করল নতুন ধরনের মালিকানা — ব্যক্তিগত মালিকানা। ম্যানুফ্যাকচারের কালপর্যায়ে এবং বৃহদায়তনের শিল্প গড়ে ওঠার প্রথম পর্বে ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া কোন রূপের মালিকানা সম্ভব ছিল না, ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থা ছাড়া সমাজের অন্য কোন ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না। সবার চাহিদা অনুসারে যোগান দেবার জন্যে যা পর্যাপ্ত সেই পরিমাণ উৎপাদই শুধু নয়, অধিকন্তু সামাজিক পুঁজি বাড়াবার এবং উৎপাদন-শক্তিসমূহের আরও সম্প্রসারের জন্যে আবশ্যক উদ্বৃত্ত উৎপাদ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ সবসময়ে থাকেই একটা প্রাধান্যশালী শ্রেণী, যেটা সমাজের উৎপাদন-শক্তিসমূহের পরিচালক, আর একটা গরিব উৎপীড়িত শ্রেণী। উৎপাদন বিকাশের পর্বের উপর নির্ভর করে শ্রেণী-দুটোর গড়নের ধরন। মধ্যযুগ ছিল কৃষির মুখাপেক্ষী, তখন ছিল ভূস্বামী আর ভূমিদাস; মধ্যযুগের শেষ ভাগের শহরগুলিতে আমরা দেখতে পাই গিল্ড-কর্তা এবং তার শিক্ষানবিস আর দিনমজুরদের; সতর শতকে — ম্যানুফ্যাকচারারেরা এবং ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকেরা; উনিশ শতকে — বৃহৎ কারখানা মালিক আর প্রলেতারিয়ান। স্পষ্টই দেখা যায়, যাতে সবার জন্যে যা পর্যাপ্ত এমন পরিমাণে উৎপাদন হতে পারে, আর যাতে ব্যক্তিগত মালিকানা হয়ে ওঠে উৎপাদন-শক্তিসমূহের পক্ষে বেড়ির মতো প্রতিবন্ধক, তদবধি উৎপাদন-শক্তিসমূহ তত ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয় নি। কিন্তু বৃহদায়তনের শিল্পের সম্প্রসারের ফলে এখন, **প্রথমত,** পুঁজি আর উৎপাদন-শক্তি এমন পরিসরে পয়দা হয়েছে যেমনটা

এযাবত শোনা যায় নি, আর এইসব উৎপাদন-শক্তিকে অল্পকালের মধ্যে অশেষ মাত্রায় বাড়াবার উপায়-উপকরণ রয়েছে; **দ্বিতীয়ত,** এইসব উৎপাদন-শক্তি জড়ো হয়েছে মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াদের হাতে, পক্ষান্তরে বিপুল জনরাশি ক্রমাগত বেশি পরিমাণে পড়ে যাচ্ছে প্রলেতারিয়েতের কাতারে, আর যে-পরিমাণে বুর্জোয়াদের ধনদৌলত বহুলীকৃত হচ্ছে সেই পরিমাণেই বিপুল জনরাশির অবস্থা হয়ে পড়ছে আরও দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্বহ; **তৃতীয়ত,** এইসব উৎপাদন-শক্তি মহাশক্তিশালী, এগুলিকে বহুলীকৃত করা যায় সহজেই, এগুলির বৃদ্ধি ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বুর্জোয়াদের পরিধি এতখানি ছাড়িয়ে গেছে যাতে সমাজব্যবস্থায় অবিরাম প্রচন্ড গোলযোগ ঘটছে -- শুধু এখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে শুধু তাই নয়, সেটা হয়ে উঠেছে এমনকি একেবারেই অপরিহার্য।

১৬ নং প্র: শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা সম্ভব হবে কি?

উ: সেটা ঘটে, তাইই কাম্য, তাতে কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই বাধা দেবে না। কমিউনিস্টরা খুব ভালভাবেই জানে, সমস্ত ষড়যন্ত্রই অকার্যকরই শুধু নয়, অধিকন্তু হানিকর। তারা খুব ভালভাবেই জানে, পরিকল্পনা অনুসারে এবং মর্জিমাফিক বিপ্লব ঘটান হয় না, সর্বত্র এবং সর্বকালে বিপ্লবগুলি ছিল পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি, সেটা বিশেষ বিশেষ পার্টি এবং গোটা গোটা শ্রেণীর ইচ্ছা আর নেতৃত্বের সাপেক্ষ নয় একেবারেই। কিন্তু তারা তেমনি লক্ষ্য করছে, প্রায় প্রত্যেকটা সভ্য দেশে প্রলেতারিয়েতের বিকাশ বলপূর্বক দমন করা হচ্ছে, সেইভাবে কমিউনিস্টদের প্রতিপক্ষীয়রা বিপ্লব এগিয়ে আনছে। উৎপীড়িত প্রলেতারিয়েতকে শেষপর্যন্ত বিপ্লবের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলে আমরা কমিউনিস্টরা তখন প্রলেতারিয়ানদের কর্মব্রত টাকে সমর্থন করব কাজ দিয়ে, ঠিক যেমনটা এখন আমরা করছি কথা দিয়ে।

১৭ নং প্র: ব্যক্তিগত মালিকানা কি এক-ঘায়ে খতম করা সম্ভব হবে?

উ: না, সম্প্রদায় সৃষ্টি করার জন্যে আবশ্যক মাত্রায় বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তিসমূহের বহুলীকরণ **এক-ঘায়ে** যেমন অসম্ভব, সেটাও তেমনিই এক-ঘায়ে অসম্ভব। কাজেই, যে-প্রলেতারিয়েত বিপ্লব খুব সম্ভবত কাছিয়ে আসছে সেটা বিদ্যমান সমাজটাকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে শুধু ক্রমে ক্রমে, আর

সেটা ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করবে শুধু যখন আবশ্যক পরিমাণ উৎপাদনের উপকরণ পয়দা হবে।

১৮ নং প্র: এই বিপ্লবের গতিপথটা কি হবে?

উ: প্রথমে সেটা চালু করবে একটা **গণতান্ত্রিক সংবিধান** এবং সেই সূত্রে প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষে প্রলেতারিয়েতের রাজনীতিক শাসন। প্রত্যক্ষভাবে ইংলন্ডে, যেখানে প্রলেতারিয়েত ইতোমধ্যে জনগণের অধিকাংশ; ফ্রান্সে আর জার্মানিতে পরোক্ষে, এই দুই দেশে জনগণের অধিকাংশ হল প্রলেতারিয়ানরা ছাড়াও খুদে কৃষক আর বুর্জোয়াদের নিয়ে, এরা এখন প্রলেতারিয়ানে পরিণত হচ্ছে, আর রাজনীতিক স্বার্থের দিক থেকে ক্রমাগত বেশি পরিমাণে প্রলেতারিয়েতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে, কাজেই প্রলেতারিয়েতের দাবিদাওয়ায় তাদের মত দিতে হবে শিগগিরই। এতে হয়ত লাগবে একটা দ্বিতীয় লড়াই, সে-লড়াইয়ে পরিণতি হতে পারে শুধু প্রলেতারিয়েতের বিজয়।

ব্যক্তিগত মালিকানার উপর সরাসরি আক্রমণের আরও ব্যবস্থাবলি অবলম্বন করার এবং প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব নিরাপদে প্রতিষ্ঠা করার একটা উপায় হিসেবে গণতন্ত্র অবিলম্বে প্রযুক্ত না হলে সেটা হবে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে অনাবশ্যক। বিদ্যমান সম্পর্কতন্ত্র থেকে ফলস্বরূপ যা উদ্ভূত সেইসব প্রধান প্রধান ব্যবস্থা হবে নিম্নলিখিতরূপ:

১) বৃদ্ধিমূলক আয়-কর, চড়া হারে উত্তরলব্ধি-কর, জ্ঞাতিসূত্রে (ভাই, ভাইপো, ইত্যাদি) উত্তরলব্ধি লোপ করা, আবশ্যিক ঋণ, ইত্যাদি উপায়ে ব্যক্তিগত মালিকানা সীমাবদ্ধ করা।

২) অংশত রাষ্ট্রীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা দিয়ে এবং অংশত সরাসরি পত্রমুদ্রায় খেসারত দিয়ে ভূমি-সম্পত্তির মালিক, কল-কারখানা মালিক এবং রেলওয়ে আর জাহাজী কারবারের রাঘববোয়ালদের ক্রমে ক্রমে বেদখল করা।

৩) সমস্ত প্রবসিত মানুষের সম্পত্তি এবং জনগণের অধিকাংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

৪) প্রলেতারিয়ানদের শ্রম বা বৃত্তিকে জাতীয় ভূমি-সম্পত্তিতে, জাতীয় কল-কারখানা আর কর্মশালায় সংগঠিত করা, এবং সেটা দিয়ে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটান, আর রাষ্ট্র যা দেয় তেমনি চড়া হারে মজুরি দিতে তখনও বিদ্যমান কল-কারখানা মালিকদের বাধ্য করা।

৫) ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা সমাধা হবার সময় অবধি সমাজের সমস্ত সদস্যের কাজ করার সম-বাধ্যবাধকতা। শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন বাহিনী গঠন, বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে।

৬) রাষ্ট্রীয় পুঁজিওয়ালা জাতীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে ক্রেডিট আর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করা এবং সমস্ত বেসরকারী ব্যাঙ্ক আর ব্যাঙ্কারদের দমন করা।

৭) জাতীয় কল-কারখানা, কর্মশালা, রেলওয়ে এবং জাহাজ বাড়ান; সমস্ত অনাবাদী জমি আবাদ করা এবং জাতির হাতে পুঁজি আর কর্মী যে-পরিমাণে বাড়ে সেই একই অনুপাতে ইতোমধ্যে আবাদী জমির উন্নয়ন।

৮) মায়ের যত্ন-পরিচর্যা ছাড়াই যখন চলে অমনি বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এবং জাতির খরচায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা। উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষা।

৯) জাতীয় ভূমি-সম্পত্তিগুলিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্মাণ, সেগুলি হবে শিল্পে এবং কৃষিকাজেও ব্যাপৃত নাগরিকদের সাধারণী বাসস্থান, সেগুলিতে শহরে আর গ্রামীণ জীবনের সুযোগ-সুবিধেগুলোকে এক করতে হবে, যাতে কোনটার একপেশেমি কিংবা অসুবিধে নাগরিকদের ভোগ করতে না হয়।

১০) সমস্ত অস্বাস্থ্যকর এবং খারাপভাবে তৈরি বাড়ি আর ফ্ল্যাটের ব্লক ভেঙে ফেলা।

১১) জারজ এবং না-জারজ সমস্ত সন্তানের সমান দায়াদী অধিকার।

১২) পরিবহনের সমস্ত উপায়-উপকরণ জাতির হাতে কেন্দ্রীভূতকরণ।

এই সমস্ত ব্যবস্থাই অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই চালু করা যায় না। কিন্তু সবসময়েই একটা থেকে আসবে অন্যটা। ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রথম মূলগত আক্রমণটা সমাধা হয়ে গেলেই প্রলেতারিয়েত আরও এগিয়ে চলতে এবং সমস্ত পুঁজি, সমস্ত কৃষিকাজ, সমস্ত শিল্প, সমস্ত পরিবহন আর বিনিময়ের সমস্ত উপায় ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা থেকে আসবে ঐসব ফল; আর প্রলেতারিয়েতের শ্রমের কল্যাণে দেশের উৎপাদন-শক্তিসমূহ যে-পরিমাণে বেড়ে উঠবে সেই অনুপাতেই ঐসব ব্যবস্থা হাসিল করা যাবে এবং সেগুলির

কেন্দ্রীকরণ পরিণতি বাড়বে। শেষে, সমস্ত পুঁজি, সমস্ত উৎপাদন, আর সমস্ত বিনিময় জাতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেলে ব্যক্তিগত মালিকানা আপনা থেকেই খতম হয়ে যাবে, টাকা হয়ে পড়বে অনাবশ্যক, আর উৎপাদন এত বাড়বে, মানুষ এমনই বদলে যাবে, যাতে পুরন সামাজিক সম্পর্কতন্ত্রের অবশিষ্ট ধরনগুলোও ঝরে পড়ে যাবে।

১৯ নং প্র: শুধু কোন একটা দেশে এই বিপ্লব ঘটা সম্ভব হবে কি?

উ: না। বৃহদায়তনের শিল্প ইতোমধ্যে পয়দা করেছে বিশ্ব-বাজার, তার ফলে পৃথিবীর সমস্ত জাতি, বিশেষত সভ্য জাতিগুলি এমনভাবে গ্রথিত হয়ে গেছে যাতে অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে যা ঘটে সেটার উপর প্রত্যেকটা জাতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, বৃহদায়তনের শিল্প সমস্ত সভ্য দেশের সামাজিক উন্নয়ন এতই সমান-সমান করে দিয়েছে যাতে এই সমস্ত দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী আর প্রলেতারিয়েত হয়ে উঠেছে সমাজের দুটো নিষ্পত্তিকর শ্রেণী, আর তাদের মধ্যে সংগ্রামটা হয়ে উঠেছে এখনকার দিনের মুখ্য সংগ্রাম। কাজেই, কমিউনিস্ট বিপ্লবটা হবে শুধু জাতীয় বিপ্লব নয়; সেটা ঘটবে সমস্ত সভ্য দেশে, অর্থাৎ অন্তত ইংলন্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স আর জার্মানিতে যুগপৎ। কোন্ দেশে রয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি বিকশিত শিল্প, অপেক্ষাকৃত বেশি ধনদৌলত এবং অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদন-শক্তিরাশি, তদনুসারে এর প্রত্যেকটা দেশে বিপ্লব বিকশিত হতে সময় লাগবে অপেক্ষাকৃত বেশি কিংবা কম। কাজেই, এই বিপ্লবের গতিবেগ সবচেয়ে ধীরি হবে এবং এই বিপ্লব সমাধা করা সবচেয়ে কঠিন হবে জার্মানিতে; এই বিপ্লব সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে সহজে সম্পাদিত হবে ইংলন্ডে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর এই বিপ্লবের বিস্তর প্রভাব পড়বে, সেগুলির বিকাশের এখন অবধি বিদ্যমান প্রণালীটাকে একেবারেই বদলে দেবে, আর প্রচুর পরিমাণে ত্বরিত করবে সেই বিকাশটাকে। এটা হতে হবে বিশ্ব-বিপ্লব, কাজেই এটার রঙ্গভূমি হবে সারা পৃথিবী।

২০ নং প্র: ব্যক্তিগত মালিকানা লুপ্তির চূড়ান্ত পরিণতিগুলো কি হবে?

উ: যেমন উৎপাদের বিনিময় আর বণ্টন থেকে, তেমনি সমস্ত উৎপাদন-শক্তি আর যোগাযোগের উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা থেকে, ব্যক্তি-পুঁজিপতিদের বেদখল ক'রে সমাজ প্রাপ্তিসাধ্য উপায়-উপকরণ আর সমগ্র

সমাজের প্রয়োজনের ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনা অনুসারে সেগুলোর ব্যবস্থাপন করতে থাকলে বৃহদায়তনের শিল্পের সঙ্গে বর্তমানে যেসব কু-পরিণতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেগুলো সর্বপ্রথমে দূর হবে। সংকটগুলো আর থাকবে না; সমাজের বর্তমান ব্যবস্থায় অত্যুৎপাদন হল সম্প্রসারিত উৎপাদনের অনিবার্য ফল, সম্প্রসারিত উৎপাদন দুর্দশা-দুর্গতির একটা প্রবল কারণ, সেটা তখন পর্যাপ্তও হবে না, সেটাকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। সমাজের সাক্ষাৎ চাহিদাগুলো ছাপিয়ে বাড়তি উৎপাদনের পায়ে-পায়ে আসবে না দুর্দশা-দুর্গতি, সেটা সবার চাহিদা মেটাবে, পয়দা করবে নতুন নতুন চাহিদা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও মেটাবার উপায়। সেটা হয়ে উঠবে আরও অগ্রগতির জন্যে আবশ্যক অবস্থা এবং উদ্দীপক; এযাবত সবসময়ে সেটা সমাজব্যবস্থাটাকে তালগোল পাকান অবস্থায় ফেলে দিয়ে আসছে, আর তখন তা না করে সেটা হাসিল করবে অগ্রগতি। ব্যক্তিগত মালিকানার জোয়াল থেকে মুক্তি পেলেই বৃহদায়তনের শিল্পের প্রসারের পরিধিটার কাছে সেটার উন্নয়নের এখনকার মাত্রা তুচ্ছ মনে হবে — আমাদের একালের বৃহদায়তনের শিল্পের সঙ্গে তুলনায় ম্যানুফ্যাকচার প্রণালীটাকে ঠিক যেমনটা তুচ্ছ মনে হয়। শিল্পের এই উন্নয়নের ফলে সমাজ সবার চাহিদা মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদের যোগান পাবে। ভূমিতে রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা, ভূমি এখন টুকরো টুকরো, তার চাপে কৃষিও ব্যাহত, সেই কৃষিতে প্রাপ্তিসাধ্য উন্নতি আর বৈজ্ঞানিক সাধনসাফল্যগুলি চালু করা হলে সেটার নতুন অগ্রগতি ঘটবে, সমাজের হাতে আসবে অঢেল কৃষিজাতদ্রব্য। এইভাবে সমাজে এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে জাতদ্রব্য উৎপন্ন হবে, যাতে সমাজের সবার প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী বণ্টনের বন্দোবস্ত হতে পারবে। শত্রুভাবাপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাগটা তার ফলে হয়ে পড়বে অনাবশ্যক। সেটা অনাবশ্যক হয়ে যাবে শুধু তাই নয়, অধিকন্তু নতুন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সেটা মোটেই খাপ খাবে না। বিভিন্ন শ্রেণী পয়দা হয়েছে শ্রমবিভাগের দরুন, আর সেই শ্রমবিভাগ এযাবত যে আকারে রয়েছে সেটা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে। যেমনটা বলা হল তেমনি উঁচু মাত্রায় শিল্প আর কৃষির উৎপাদন বাড়াবার জন্যে কেবল যান্ত্রিক আর রাসায়নিক সহায়গুলোই যথেষ্ট নয়, যারা সেইসব সহায়ক চালু করে সেইসব মানুষের

সামর্থ্যও সেজন্যে তদনুসারে বিকশিত হওয়া চাই। কৃষক এবং ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকেরা গত শতকে বৃহদায়তনের শিল্পে শামিল হলে তাদের সমগ্র জীবনযাত্রাপ্রণালী যেমনটা বদলাতে হয়েছিল, আর তারা নিজেরাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল একেবারে ভিন্ন মানুষ, ঠিক তেমনি উৎপাদনে সমগ্র সমাজের যৌথ ব্যবস্থাপন চালু হলে এবং তার ফলে উৎপাদনের নতুন প্রসার ঘটলে সেজন্যে আবশ্যক হবে একেবারে ভিন্ন মানুষ, সেটা গড়েও তুলবে তেমনি মানুষ। মানুষ এখন যেমনটা রয়েছে, যাতে প্রত্যেকের জন্যে উৎপাদনের একটামাত্র শাখা নির্দিষ্ট, সে সেটার সঙ্গে বাঁধা, সেটার দ্বারা শোষিত, প্রত্যেকে অন্যান্য সমস্ত সামর্থ্য খুইয়ে গড়ে তুলেছে তার **একটামাত্র** সামর্থ্য, সে জানে সমগ্র উৎপাদনের শুধু **একটা** শাখা কিংবা একটা শাখার শুধু একটা শাখা, এমন মানুষ দিয়ে উৎপাদনের যৌথ উৎপাদন চালান যায় না। এমনকি সমসাময়িক শিল্পেও এমন মানুষ ক্রমেই আরও কম কাজের হয়ে পড়ছে। যৌথভাবে এবং পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র সমাজের পরিচালিত শিল্পে এমন মানুষ অপরিহার্য যাদের সামর্থ্যগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটেছে, যারা সমগ্র উৎপাদন-প্রণালীটাকে বিবেচনায় রাখতে সক্ষম। কাজেকাজেই, যে শ্রমবিভাগের অবস্থায় একজন হয়ে পড়ে কৃষক, আর একজন হয় চর্মকার, কারখানা শ্রমিক হয় অন্য কেউ, আবার কেউ হয় ফটকা-কারবারি, এই যে শ্রমবিভাগটাকে যন্ত্র-ব্যবস্থা ইতোমধ্যে ক্ষয়ে দিয়েছে, এটা ঐভাবে একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে। শিক্ষা পেয়ে নওজোয়ানেরা সমগ্র উৎপাদন-প্রণালীটাকে চটপট রপ্ত করে নিতে পারবে, তারা সামাজিক চাহিদা কিংবা নিজেদের ঝোঁক অনুসারে শিল্পের একটা থেকে অন্য শাখায় চলে যেতে পারবে। কাজেই, এখনকার শ্রমবিভাগের দরুন সবার উপর বিকাশের যে একপেশেমিটা চেপে রয়েছে সেটা তার ফলে লোপ পাবে। এইভাবে, কমিউনিজমের ধারায় সংগঠিত সমাজে সবাই তাদের সর্বতোভাবে বিকশিত সামর্থ্যগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী লুপ্ত হবে, সেটা অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে, একদিকে কমিউনিজমের ধারায় সংগঠিত সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না, তেমনি পক্ষান্তরে, এই সমাজ গড়ে উঠলে সেটা আপনিই যোগায় এইসব শ্রেণীগত প্রভেদ ঘুচিয়ে দেবার উপায়।

এই সবকিছুর ফল হিসেবে শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যও লোপ পেয়ে যাবে। দুটো পৃথক শ্রেণীর বদলে একই সব লোকের কৃষি আর শিল্পের উৎপাদন করাটা এমনকি নিছক বৈষয়িক কারণেও কমিউনিজমের ধারায় সম্মিলনীর একটা অপরিহার্য অবস্থা। শিল্পক্ষেত্রের জনসমষ্টি বড় বড় শহরে ভিড় করে থাকার পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রের জনসমষ্টির সারা দেশে ছড়িয়ে থাকাটা কৃষি আর শিল্পের শুধু একটা অনুন্নত পর্বের পক্ষেই উপযোগী অবস্থা, সেটা সমস্ত পরবর্তী সম্প্রসারণের পথে একটা বাধা, যা এমনকি এখনও বোধ করা যাচ্ছে খুবই।

ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করার প্রধান প্রধান ফলগুলি নিম্নলিখিতরূপে হবে বলে ধরা যায়: উৎপাদন-শক্তিসমূহের সাধারণী এবং পরিকল্পিত সদ্ব্যবহারের জন্য সমাজের সমস্ত মানুষের সর্বাত্মক সম্মিলনী; সবার চাহিদা মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত মাত্রায় উৎপাদন সম্প্রসারণ; যাতে কারও কারও চাহিদা মেটে অন্যান্যের ঘাড় ভেঙে সেই অবস্থাটার অবসান; বিভিন্ন শ্রেণী এবং সেগুলোর মধ্যকার বিরোধগুলোর পূর্ণ লুপ্তি; এযাবত প্রাধান্যশালী শ্রমবিভাগ লোপ করার কল্যাণে, শিল্প-শিক্ষার সাহায্যে, কর্মবৃত্তি বদল করার ফলে, সবার দ্বারা উৎপন্ন ভোগসুখের বস্তুগুলিতে সবার অংশভাগীদারির ভিতর দিয়ে, শহর আর গ্রামাঞ্চলের মিলেমিশে যাবার কল্যাণে সমাজের সমস্ত মানুষের সামর্থ্যগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

২১ নং প্র: কমিউনিজমের ধারার সমাজব্যবস্থার কোন্ প্রভাব পড়বে পরিবারের উপর?

উ: এই ধারার ব্যবস্থা নারী-পুরুষের সম্পর্ককে করে দেবে নিছক একান্ত বিষয়, কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপার, তাতে সমাজের কোন হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা থাকবে না। কমিউনিস্ট সমাজ সেটা করতে পারে, তার কারণ এই সমাজ ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা দেয় সাধারণী উপায়ে, এবং এইভাবে এযাবত বিদ্যমান বিবাহের ভিত্তি-প্রস্তর দুটোকে ভেঙে দেয় — এই দুটো হল ব্যক্তিগত মালিকানা দিয়ে যা ঘটিত সেই স্বামীর উপর স্ত্রীর এবং বাপ-মায়ের উপর ছেলেমেয়েদের নির্ভর। কমিউনিজমের ধারায় স্ত্রীদের নিয়ে সাধারণী সম্ভোগের কথা তুলে নৈতিকতাবাগীশ কূপমণ্ডূকেরা যে সোরগোল করে, এটা হল তার একটা

জবাব। স্ত্রীদের দিয়ে সাধারণী সম্ভোগ সংক্রান্ত সম্পর্কটা সম্পূর্ণত বুর্জোয়া সমাজেরই বস্তু, এখন সেটা রয়েছে নিখুঁত আকারে — বেশ্যাবৃত্তি। কিন্তু বেশ্যাবৃত্তির মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা, এই মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে বেশ্যাবৃত্তি লোপ পাবে। এইভাবে, কমিউনিজমের ধারার সংগঠন নারীদের নিয়ে সাধারণী সম্ভোগ চালু না করে বরং সেটার অবসান ঘটাবে।

২২ নং প্র: বিদ্যমান জাতিসত্তাগুলি সম্বন্ধে কমিউনিজমের ধারার সংগঠনের মনোভাব কি হবে?

— রয়েছে (৩৭)।

২৩ নং প্র: বিদ্যমান ধর্মগুলি সম্বন্ধে সেটার মনোভাব কি হবে?

— রয়েছে।

২৪ নং প্র: সমাজতন্ত্রীদের থেকে কমিউনিস্টদের পার্থক্য কিসে?

উ: তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের তিনটে বর্গে ভাগ করা যায়।

প্রথম বর্গটা হল সামন্ততান্ত্রিক আর গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজের অনুগামীদের নিয়ে, এই যে দুটো সমাজকে ধ্বংস করেছে কিংবা এখন প্রতিদিন ধ্বংস করছে বৃহদায়তনের শিল্প আর বিশ্ব-বাণিজ্য এবং ঐ দুটো সমাজের পয়দা-করা বুর্জোয়া সমাজ। এখনকার দিনের অকল্যাণগুলো থেকে এই বর্গটা সিদ্ধান্ত করে যে, সামন্ততান্ত্রিক আর গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, কেননা তাতে এইসব অকল্যাণ ছিল না। সরাসরি কিংবা পরোক্ষে তাদের সমস্ত প্রস্তাব এই লক্ষ্যটাই তুলে ধরে। প্রলেতারিয়েতের প্রতি তাদের তথাকথিত সহানুভূতি এবং প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা-দুর্গতির কথা নিয়ে তাদের তপ্ত অশ্রুবর্ষণ সত্ত্বেও **প্রতিক্রিয়াশীল** সমাজতন্ত্রীদের এই গ্রুপটার প্রবল বিরোধিতা করবে কমিউনিস্টরা, কেননা

১) তারা যেজন্যে চেষ্টা করছে সেটা স্রেফ অসম্ভব;

২) তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছে অভিজাতবর্গ, গিল্ড কর্তা আর ম্যানুফ্যাকচারপতিদের কর্তৃত্ব, এদের সঙ্গে নিরঙ্কুশ বা সামন্ততান্ত্রিক রাজা, আমলা-ফয়লা, সৈনিকবর্গ এবং যাজকসম্প্রদায় নিয়ে এদের অনুচরবর্গ, তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছে এমন সমাজ যেখানে এখনকার দিনের সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলো না থাকলেও সেটার ছিল অন্তত সমসংখ্যক স্বকীয় দোষ-ত্রুটি,

আর তাছাড়া, কমিউনিজমের ধারায় সংগঠনের কল্যাণে উৎপীড়িত শ্রমিকদের মুক্তির সম্ভাবনাটাও সে-সমাজে থাকে না;

৩) প্রলেতারিয়েত যখনই বৈপ্লবিক এবং কমিউনিজমের ধারা ধরে তেমন সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায় তাদের আসল মতলব, তেমনসব ক্ষেত্রে তারা সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট বাঁধে প্রলেতারিয়ানদের বিরুদ্ধে।

এখনকার দিনের সমাজের অনুগামীদের নিয়ে দ্বিতীয় বর্গটা, — এই সমাজের অনিবার্য পরিণতি যেসব অমঙ্গল সেগুলো এই সমাজের অস্তিত্বের জন্যে তাদের মনে উদ্বেগ জাগিয়ে তুলেছে। কাজেই, এখনকার দিনের সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অমঙ্গলগুলোকে দূর ক'রে তারা এটাকে অক্ষত রাখতে চাইছে। এই লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে তাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্থাপন করছে বিভিন্ন কল্যাণ-ব্যবস্থা, আর অন্যান্যেরা বিভিন্ন জমকাল সংস্কার-ব্যবস্থার ওকালতি করছে, সেগুলোতে রয়েছে সমাজটাকে পুনঃসংগঠিত করার ছুতো, সেগুলো চালু হলে আজকের দিনের সমাজের বনিয়াদগুলো বজায় থাকে, আর সেইভাবে বজায় থাকে আজকের দিনের সমাজটাই। কমিউনিস্টদের অধ্যবসায়ী বিরোধিতা করতে হবে এইসব **বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদেরও**, কেননা তারা সচেষ্ট রয়েছে কমিউনিস্টদের শত্রুদের পক্ষে, আর কমিউনিস্টরা যে-সমাজটাকে বিনষ্ট করতে চায় সেটাকে তারা সমর্থন করছে।

শেষে, তৃতীয় বর্গটা হল গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে, তারা কমিউনিস্টদের মতোই... নং প্রশ্নের* ব্যবস্থাবলির একাংশ চায়, কিন্তু সেটা কমিউনিজমে উত্তরণের উপায় হিসেবে নয়, সেটা হল এখনকার দিনের সমাজের দুর্দশা-দুর্গতি আর অমঙ্গলগুলো দূর করার উপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে। এই **গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীরা** দু'রকমের: হয় নিজেদের শ্রেণীর মুক্তির উপযোগী পরিবেশ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট অবহিত নয় এমনসব প্রলেতারিয়ান, নইলে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক, — গণতন্ত্র হাসিল হওয়া পর্যন্ত এবং তার থেকে উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলি হাসিল হওয়া পর্যন্ত এই শ্রেণীটার স্বার্থ অনেক দিক থেকে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে অভিন্ন। কাজেই,

---

* পাণ্ডুলিপিতে এখানে একটু জায়গা খালি আছে। ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

সংগ্রামের সময়ে গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সমঝতা করতে হবে এবং অন্তত সেই সময়ে যখন সম্ভব তাদের সঙ্গে সাধারণভাবে সাধারণী কর্মনীতি অনুসারে চলতে হবে — যতক্ষণ না এই গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীরা শাসক বুর্জোয়াদের সেবায় লেগে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করে। তাদের সঙ্গে পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা এই সাধারণী সংগ্রামের দরুন রহিত হয় না, সেটা তো স্পষ্টই।

২৫ নং প্র: আমাদের একালের অন্যান্য রাজনীতিক পার্টি সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের মনোভাব কী?

উ: এই মনোভাব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। — ইংলন্ড, ফ্রান্স আর বেলজিয়মে বুর্জোয়ারা শাসক পার্টি, এইসব দেশে আপাতত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে এখনও কমিউনিস্টদের বিভিন্ন সাধারণী স্বার্থ রয়েছে, এই স্বার্থের অভিন্নতা হবে ততই বেশি যে-পরিমাণে গণতন্ত্রীদের এখন সর্বত্র উপস্থাপিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলি কমিউনিস্টদের লক্ষ্যগুলির কাছাকাছি আসবে, অর্থাৎ যতই বেশি স্পষ্ট করে এবং নির্দিষ্টভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ সমর্থন করবে, আর যতই বেশি করে তারা নির্ভর করবে প্রলেতারিয়েতের উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলন্ডে — সেখানে চার্টিস্টরা (৩৮) সবাই শ্রমিক, তারা গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়া কিংবা তথাকথিত র‍্যাডিকালদের চেয়ে কমিউনিস্টদের এত বেশি কাছাকাছি যা অপরিমেয়।

আমেরিকায় প্রবর্তিত হয়েছে একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান — সেখানে যে-পার্টি এই সংবিধানটাকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে এবং প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে কাজে লাগাবে সেটার সঙ্গে, অর্থাৎ জাতীয় ভূমি-সংস্কারকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম-কর্মব্রতী হতে হবে।

সুইজারল্যান্ডে র‍্যাডিকালরা এখনও একটা খুবই মিশ্র পার্টি হলেও একমাত্র তাদের সঙ্গেই কমিউনিস্টদের কোন সম্পর্ক হতে পারে, আর এদের মধ্যে আবার ভাউড আর জেনেভার র‍্যাডিকালরা সবচেয়ে প্রগতিশীল।

শেষে, জার্মানিতে বুর্জোয়া শ্রেণী আর নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মধ্যে নিষ্পত্তিকর সংগ্রাম এখনও সবে সামান্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু বুর্জোয়ারা শাসক না হওয়া অবধি কমিউনিস্টরা তাদের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিকর সংগ্রাম চালাতে পারে না, তাই যত শীঘ্র সম্ভব বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার

জন্যে যথাসম্ভব দ্রুত তাদের শাসন-ক্ষমতা লাভ করতে সাহায্য করাই কমিউনিস্টদের স্বার্থের অনুযায়ী। কাজেই, কমিউনিস্টদের সবসময়ে সরকারের বিরুদ্ধে উদারপন্থী বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন করতে হবে, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হবে, যাতে কমিউনিস্টরা বুর্জোয়াদের আত্মপ্রবঞ্চনায় শরিক হয়ে না পড়ে, কিংবা বুর্জোয়াদের জয়ের ফলে প্রলেতারিয়েতের কল্যাণ হবে বুর্জোয়াদের এমনসব লোভনীয় কথায় কমিউনিস্টরা যাতে বিশ্বাস না করে। বুর্জোয়াদের জয়ের ফলে কমিউনিস্টদের যে একমাত্র সুবিধে হতে পারে তা হল: ১) যাতে কমিউনিস্টদের মূলনীতিগুলি সমর্থন করা, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সেগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, আর তার ফলে একটা নিবিড়, লড়িয়ে এবং সুসংগঠিত শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েতের ঐক্য সাধিত হয়, এমনসব সুযোগ-সুবিধে, আর ২) যখন নিরঙ্কুশ সরকার উচ্ছেদ হবে সেইদিন থেকেই বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে সংগ্রামের পালা আসবে এই নিশ্চয়তা। সেইদিন থেকে কমিউনিস্টদের পার্টি কর্মনীতি হবে বুর্জোয়ারা যেসব দেশে ইতোমধ্যে শাসক সেখানে যেমনটা তেমনিই।

১৮৪৭ সালে অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বর মাসে এঙ্গেলসের লেখা

পৃথক সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ছাপা হল

জার্মান থেকে ইংরেজী তরজমার ভাষান্তর

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার (৩৯)

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

শ্রমিকদের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কমিউনিস্ট লীগ (৪০) তখনকার অবস্থায় গুপ্ত সমিতি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লন্ডন কংগ্রেসে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের উপর ভার দেওয়া হয় পার্টির একটি বিশদ তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক কর্মসূচি রচনা করতে প্রকাশের জন্যে। নিম্নলিখিত 'ইশতেহার'টির উৎপত্তি হয় এইভাবে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (৪১) অল্প কয়েক সপ্তাহ আগে এর পান্ডুলিপিটি ছাপা হবার জন্যে যায় লন্ডনে। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশের পরে জার্মানি, ইংলন্ড এবং আমেরিকায় এটি জার্মান ভাষায় অন্তত বারটি সংস্করণে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতী হেলেন ম্যাকফারলেনের অনুবাদে এটা ইংরেজীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডনের 'Red Republican'-এ (৪২) ১৮৫০ সালে, এবং পরে ১৮৭১ সালে আমেরিকায় অন্তত তিনটি স্বতন্ত্র অনুবাদে এটা প্রকাশিত হয়। ফরাসী অনুবাদ প্রথম বের হয় প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের (৪৩) সামান্য আগে, আবার সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের 'Socialiste' পত্রিকায় (৪৪)। আরও একটি অনুবাদের কাজ এখন চলছে। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত এবার একটু পরেই লন্ডনে এটার পোলীয় অনুবাদ বের হয়েছিল। সপ্তম দশকে জেনেভা শহরে প্রকাশিত হয় এর রুশ অনুবাদ (৪৫)। প্রথম প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই এর অনুবাদ হয় ডেনিশ ভাষাতেও।

গত পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইশতেহার'-এ উপস্থাপিত সাধারণ মূলনীতিগুলি আজও মোটের ওপর আগের মতোই সঠিক। এখানে-ওখানে দু'একটি খুঁটিনাটি কথা আরও ভাল করে লেখা যেত। সর্বত্র এবং সবসময়ে মূলনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ

নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর, 'ইশতেহার'-এই যা বিবৃত হয়েছে, সেইজন্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে প্রস্তাবিত বৈপ্লবিক ব্যবস্থাবলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। আজকের দিনে হলে ঐ অংশটা অনেক দিক থেকে খুবই অন্যভাবে লেখা হত। গত পঁচিশ বছরে আধুনিক শিল্প যে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সংগঠন যেভাবে উন্নত এবং প্রসারিত হয়েছে, প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, পরে আরও বেশি করে প্যারিস কমিউনে (৪৬), যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুই মাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচি খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে সেকেলে হয়ে পড়েছে। কমিউন বিশেষ করে একটি কথা প্রমাণ করেছে যে, 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটা শুধু দখলে পেয়েই শ্রমিক শ্রেণী তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না'। ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ। আন্তর্জাতিক মেহনতী জন সমিতির সাধারণ পরিষদের বিবৃতি', জার্মান সংস্করণ, ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য; সেখানে কথাটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) তাছাড়া একথাও স্বতঃস্পষ্ট যে, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সমালোচনাটি আজকের দিনের হিসেবে অসম্পূর্ণ, কারণ সে আলোচনার বিস্তার এখানে মাত্র ১৮৪৭ পর্যন্ত; তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিপক্ষ পার্টি প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের অবস্থান সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও (চতুর্থ অধ্যায়) সাধারণ মূলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে, এবং ইতিহাসের অগ্রগতি উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশকে এ জগৎ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়েছে।

কিন্তু এই 'ইশতেহার' এখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলবার কোন অধিকার আমাদের আর নেই। সম্ভবত পরবর্তী কোন সংস্করণ বার করা যাবে যাতে ১৮৪৭ থেকে আজ অবধি ব্যবধান কালটুকু নিয়ে একটা ভূমিকা থাকবে; বর্তমান সংস্করণ এত অপ্রত্যাশিতভাবে বেরল যে আমাদের পক্ষে তার জন্যে সময় ছিল না।

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ২৪ জুন, ১৮৭২

১৮৮২ সালের দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের ভূমিকা

বাকুনিনের অনুবাদে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এর প্রথম রুশ সংস্করণ সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে 'কলোকোল' পত্রিকার (৪৭) ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন পশ্চিমের কাছে এটা ('ইশতেহার'-এর রুশ সংস্করণ) মনে হতে পারত একটা সাহিত্যিক কৌতূহল-বস্তু মাত্র। আজ তেমনভাবে দেখা অসম্ভব।

তখনও পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৮৪৭) প্রলেতারীয় আন্দোলন কত সীমাবদ্ধ স্থান জুড়ে ছিল সেটা খুবই পরিষ্কার করে দেয় 'ইশতেহার'-এর শেষ অধ্যায়টা: বিভিন্ন দেশে 'বিভিন্ন প্রতিপক্ষ পার্টি প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের অবস্থান'।* রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখই নেই তাতে। সে-যুগে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরাট শেষ-নির্ভরস্থল, আর অভিবাসনের ভিতর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করছিল ইউরোপীয় প্রলেতারিয়ানদের উদ্বৃত্ত অংশটাকে। উভয় দেশই ইউরোপকে কাঁচামাল যোগাত, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ছিল তার শিল্পজাত উৎপাদ বিক্রির বাজার। সে-যুগে তাই দুই দেশই কোন না কোন ভাবে ছিল ইউরোপের বিদ্যমান ব্যবস্থার অবলম্বন।

আজ অবস্থা কত বদলে গেছে! ইউরোপীয় অধিবাসীরাই উত্তর আমেরিকাকে বৃহৎ কৃষি-উৎপাদনের যোগ্য ক্ষেত্র করে তোলে, তার প্রতিযোগিতা ইউরোপের ছোট বড় সমস্ত ভূমি-সম্পত্তির ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে। তাছাড়া এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল শিল্পসম্পদকে এমন উৎসাহভরে এবং এমন আয়তনে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে যাতে শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলন্ডের যে একচেটে আজও রয়েছে তা অচিরে ভেঙে পড়তে বাধ্য। উভয় পরিস্থিতি আবার আমেরিকার উপরেই বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। কৃষকের ছোট আর মাঝারি ভূমি-মালিকানা, যা গোটা রাজনীতিক গঠনের ভিত্তি, তা ক্রমে ক্রমে বৃহদায়তন খামারের প্রতিযোগিতায় অভিভূত হয়ে পড়ছে; তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পাঞ্চলগুলিতে এই প্রথম গড়ে উঠছে ব্যাপক পরিসরে প্রলেতারিয়েত, এবং পুঁজি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে অবিশ্বাস্য বিপুল পরিমাণে।

---

* এই খণ্ডের ১৭৯-১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

তারপর রাশিয়া! ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময়ে শুধু ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নয়, ইউরোপের বুর্জোয়ারাও সবে জেগে উঠতে থাকা প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় দেখেছিল রাশিয়ার হস্তক্ষেপে। জারকে ঘোষণা করা হয়েছিল ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্দার হিসেবে। সেই জার আজ গাৎচিনায় বিপ্লবের হাতে যুদ্ধবন্দীর মতন (৪৮), আর ইউরোপে বৈপ্লবিক কার্যকরণের সেনামুখ হয়েছে রাশিয়া।

আধুনিক বুর্জোয়া মালিকানার অনিবার্য আগতপ্রায় অবসান ঘোষণা করাই ছিল 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর লক্ষ্য। কিন্তু রাশিয়াতে দেখি দ্রুত বর্ধিষ্ণু পুঁজিতান্ত্রিক জুয়াচুরি, আর সবে বিকাশোন্মুখ বুর্জোয়া ভূমি-সম্পত্তির মুখোমুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের বেশি জমি জুড়ে কৃষকদের যৌথ মালিকানা। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জমিতে সাধারণের মালিকানার একটা আদি রূপ রুশ অব্শিচনা* কি সরাসরি উচ্চতর রূপের কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানায় রূপান্তরিত হতে পারে? নাকি উলটোটা — তাকেও যেতে হবে ভাঙনের সেই একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা পশ্চিমে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা?

এর একমাত্র যে উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব তা হল এই: রাশিয়ায় বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে, যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রাশিয়ায় ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসেবে।

কার্ল মার্কস

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ২১ জানুয়ারি, ১৮৮২

১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণে ফ. এঙ্গেলসের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা হায় আমাকে একলাই সই করতে হবে। ইউরোপ আর আমেরিকার সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী যাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী সেই মার্কস হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে শান্তিলাভ করেছেন। তাঁর সমাধির উপর

* অব্শিচনা — গ্রাম-সম্প্রদায়। — সম্পাঃ

ইতোমধ্যে প্রথম তৃণরাজি মাথা তুলেছে। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইশতেহার'-এ সংশোধন বা সংযোজন আরও অভাবনীয়। তাই এখানে স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি আবার বলা আমি আরও বেশি প্রয়োজন মনে করি:

'ইশতেহার'-এ সর্বত্র প্রবহমান এই মূলচিন্তা — ইতিহাসের যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং তার থেকে অনিবার্যভাবে উদ্ভূত সামাজিক গঠন হল সেযুগের রাজনৈতিক এবং মানসিক ইতিহাসের ভিত্তি; সুতরাং (জমিতে আদিম যৌথ মালিকানার অবসানের পর থেকে) সমগ্র ইতিহাস হয়ে এসেছে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে শোষিত আর শোষক, অধীন আর অধিপতি শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস; কিন্তু এই সংগ্রাম আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে শোষিত এবং নিপীড়িত শ্রেণী (প্রলেতারিয়েত) নিজেকে তার শোষক এবং নিপীড়ক শ্রেণীর (বুর্জোয়া শ্রেণীর) কবল থেকে উদ্ধার করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজকে শোষণ, নিপীড়ন আর শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি দিয়ে ছাড়া সেটা আর করতে পারে না — এই মূলচিন্তাটি পুরোপুরি এবং একমাত্র মার্কসেরই।*

একথা আমি বহু বার বলেছি। কিন্তু ঠিক আজকেই এ বক্তব্য 'ইশতেহার'-এরই পুরোভাগেও থাকা প্রয়োজন।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ২৮ জুন, ১৮৮৩

---

* ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম: 'ডারউইনের মতবাদ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই উপস্থাপনা ইতিহাসের বেলায় তাই করবে, সেটা অবধারিত। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই ধীরে ধীরে এই উপস্থাপনার দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে আমি কতটা এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমার "ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা" বইখানি। কিন্তু যখন ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্‌স্‌ শহরে মার্কসের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল, মার্কস ইতোমধ্যে এ উপস্থাপনাটা প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন এবং এখানে আমি যে-ভাষায় সেটা বিবৃত করলাম প্রায় তেমনি পরিষ্কারভাবেই তিনি তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন।' [১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে ফ. এঙ্গেলসের ভূমিকা থেকে

'ইশতেহার'-এর একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। সংখ্যায় তখন পর্যন্ত বেশি নয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের এহেন অগ্রণীদের কাছ থেকে এর প্রকাশকালে জুটেছিল সোৎসাহ অভ্যর্থনা (প্রথম ভূমিকায় উল্লিখিত অনুবাদগুলিই তার প্রমাণ*), কিন্তু ১৮৪৮ সালের জুনে প্যারিস শ্রমিকদের পরাজয়ের পর যে-প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তার চাপে এটা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে গিয়েছিল অচিরে, আর ১৮৫২ সালের নভেম্বরে কলোন কমিউনিস্টদের উপর দণ্ডাজ্ঞার (৪৯) পর শেষপর্যন্ত 'আইন অনুসারে' এটাকে সমাজচ্যুত করা হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব থেকে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটা রঙ্গভূমি থেকে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 'ইশতেহার'ও লোকচক্ষুর অন্তরালে যায়।

শাসক শ্রেণীগুলির ক্ষমতার উপর নতুন আক্রমণের পক্ষে পর্যাপ্ত শক্তি যখন ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণী আবার সংগ্রহ করতে পারল তখন দেখা দেয় আন্তর্জাতিক মেহনতী জন সমিতি। ইউরোপ আর আমেরিকার সমগ্র সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীকে একটি গোটা বিরাট বাহিনীতে সুসংহত করা ছিল তার লক্ষ্য। সুতরাং 'ইশতেহার'-এ নির্দেশ করা নীতিগুলি থেকে সমিতি শুরু করতে পারে নি। সেটা এমন কর্মসূচি নিতে বাধ্য ছিল যা বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন, ফরাসী, বেলজিয়ান, ইতালীয় আর স্পেনীয় প্রুধোঁবাদী এবং জার্মান লাসালপন্থীদের** সামনে দরজা বন্ধ করবে না। এই কর্মসূচি — আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলির মুখবন্ধ — মার্কস রচনা করলেন এমন নিপুণ হাতে যা বাকুনিন এবং নৈরাজ্যবাদীরা পর্যন্ত স্বীকার করেন। 'ইশতেহার'-এ বিবৃত নীতিগুলির আখেরী বিজয়ের ব্যাপারে মার্কস পুরোপুরি এবং একান্তভাবে নির্ভর করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিগত

* এই খণ্ডের ১২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** লাসাল আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই স্বীকার করতেন যে তিনি মার্কসের 'শিষ্য' এবং সেই হিসেবে অবশ্য তাঁর অবস্থান ছিল 'ইশতেহার'-এর জমিনে। তাঁর যে ভক্তরা রাষ্ট্রীয় ক্রেডিটের সাহায্যে উৎপাদক সমবায় সম্বন্ধে তাঁর দাবির চেয়ে এগিয়ে যেতে চায় নি, যরা গোটা শ্রমিক শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের সমর্থক এবং স্বাবলম্বনের সমর্থক এই দুই ভাগে ভাগ করত, তাদের কথা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। [এঙ্গেলসের টীকা।]

বিকাশের উপর, মিলিত লড়াই আর আলোচনা থেকে যার উদ্ভব অনিবার্য। পুঁজির সঙ্গে লড়াইয়ের ঘটনাবলি আর নানা উত্থান-পতন, সাফল্যের চেয়ে পরাজয়ই বেশি করে সংগ্রামীদের কাছে প্রমাণ করবেই যে, তাদের আগেকার সর্বরোগহর দাওয়াইগুলি অকেজো, আর শ্রমিকদের মুক্তির যথার্থ পরিবেশ সম্যক উপলব্ধির জন্যে তাদের মনকে আরও ভাবগ্রাহী করবেই। মার্কস ঠিকই বুঝেছিলেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সময়কার শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় ১৮৭৪ সালে আন্তর্জাতিক উঠে যাবার সময়কার শ্রমিক শ্রেণী সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে ওঠে। ল্যাটিন দেশগুলিতে প্রুধোঁবাদ এবং জার্মানির স্বকীয় লাসালপন্থা তখন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল; এমনকি তদানীন্তন চরম রক্ষণশীল বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলি পর্যন্ত ধীরে ধীরে পৌঁছাচ্ছিল এমন একটা পর্যায়ে যখন ১৮৮৭ সালে তাদের সোয়ানসি কংগ্রেসের সভাপতি* তাদের তরফে বলতে পারলেন: 'ইউরোপের মূলভূমির সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে আর বিভীষিকা নয়।' অথচ ১৮৮৭ সাল নাগাত ইউরোপের মূলভূমির সমাজতন্ত্র প্রায় পুরোপুরিই ছিল 'ইশতেহার'-এ ঘোষিত তত্ত্ব। এইভাবে, ১৮৪৮ সালের পরবর্তী আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসটা কিছু পরিমাণে প্রতিফলিত হয় 'ইশতেহার'-এর ইতিহাসে। বর্তমানে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহেই সবচেয়ে বেশি প্রচারিত, সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সৃষ্টি, সাইবেরিয়া থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সমস্ত দেশে বহু নিযুত নিযুত শ্রমিকের সাধারণ কর্মসূচি।

তবুও প্রথম প্রকাশের সময়ে আমরা একে **সমাজতান্ত্রিক** 'ইশতেহার' বলতে পারতাম না। ১৮৪৭ সালে দুই ধরনের লোককে সমাজতন্ত্রী গণ্য করা হত। একদিকে ছিল বিভিন্ন ইউটোপীয় মতবাদের অনুগামীরা, বিশেষ করে ইংলন্ডে ওয়েনপন্থী আর ফ্রান্সে ফুরিয়েপন্থীরা, অবশ্য ততদিনে উভয়েই নিছক সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। অন্যদিকে ছিল বহুবিধ সামাজিক হাতুড়ে যারা সামাজিক অবিচার দূর করতে চাইত নানাবিধ সর্বরোগহর দাওয়াই আর জোড়াতালি দিয়ে, পুঁজি আর লাভের উপর একটুও আঁচড় না দিয়ে: উভয় ক্ষেত্রেই এরা ছিল শ্রমিক

---

* ডবলিউ. বিভেন। — সম্পাঃ

আন্দোলনের বাইরের লোক এবং সমর্থন প্রত্যাশা করত বরং 'শিক্ষিত' শ্রেণীগুলির কাছ থেকে। নিছক রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয় বলে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশটি সেদিন সমাজের আমূল পুনর্গঠনের দাবি তোলে, তারা সেসময়ে নিজেদের **কমিউনিস্ট** বলত। তখন পর্যন্ত এটা ছিল অমার্জিত, নিছক সহজিক, প্রায়শ অনেকটা স্থূল কমিউনিজম। তবুও ইউটোপীয় কমিউনিজমের দুটি ধারাকে জন্ম দেবার মতো শক্তি এর ছিল — ফ্রান্সে কাবে-র 'ইকেরীয়' (Icarian) কমিউনিজম এবং জার্মানিতে ভাইটলিং-এর কমিউনিজম। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝাত একটা বুর্জোয়া আন্দোলন, কমিউনিজম বোঝাত শ্রমিক আন্দোলন। অন্তত ইউরোপের ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্র ছিল বেশ ভদ্রস্থ, আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। যেহেতু সেই তত আগেই আমাদের অতি দৃঢ় মত ছিল যে, 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব কাজ' (৫০), তাই দুই নামের মধ্যে কোন্‌টি বেছে নেব সে সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিধা থাকতে পারত না। পরেও কখনও নামটা বর্জন করার কথা আমাদের মনে আসে নি।

'দুনিয়ার মেহনতী জনগণ এক হও!' প্রথম প্যারিস বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত তার নিজস্ব দাবি নিয়ে হাজির হয়, তার ঠিক পূর্বক্ষণে, বেয়াল্লিশ বছর আগে আমরা যখন পৃথিবীর সামনে এই কথা ঘোষণা করেছিলাম, অতি অল্প লোকেই তাতে গলা মিলিয়েছিল। ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের প্রলেতারিয়ানরা মিলে গড়েছিল গৌরবের স্মৃতিমণ্ডিত আন্তর্জাতিক মেহনতী জন সমিতি। আন্তর্জাতিক বেঁচে ছিল মাত্র নয় বছর, তা ঠিক। কিন্তু সকল দেশের প্রলেতারিয়ানদের যে চিরন্তন ঐক্য এটা সৃষ্টি করেছিল সেটা যে আজও জীবন্ত এবং আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, আজকের দিনটি তার সর্বোত্তম সাক্ষ্য। কেননা ঠিক আজকের দিনে (৫১) যখন আমি এই পংক্তিগুলি লিখছি তখন ইউরোপ আর আমেরিকার প্রলেতারিয়েত তাদের লড়বার বল পরিদর্শন করছে, সেটার এই সর্বপ্রথম সমাবেশ ঘটেছে, সমাবেশ ঘটেছে একটা গোটা বাহিনী রূপে, একই পতাকার নিচে, একই ভার উপস্থিত লক্ষ্য: ১৮৬৬ সালে আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে এবং আবার ১৮৮৯ সালে প্যারিস শ্রমিক কংগ্রেসে যা ঘোষিত হয়েছিল সেইভাবে আইন করে যা বিধিবদ্ধ

করতে হবে — সাধারণ আট ঘণ্টার কর্মদিন। আজকের দিনটির দৃশ্য সকল দেশের পুঁজিপতি আর জমিদারদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে আজ সকল দেশের মেহনতী জন বাস্তবিক এক হয়েছে।

মার্কস যদি এখনও আমার পাশে থেকে নিজের চোখে এটা দেখতেন!

লন্ডন, ১ মে, ১৮৯০

ফ. এঙ্গেলস

১৮৯২ সালের পোলীয় সংস্করণের ভূমিকা

'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর একটি নতুন পোলীয় সংস্করণ আবশ্যক হল, এর থেকে নানা কথা মনে আসছে।

ইদানীং এই 'ইশতেহার' যেন ইউরোপ মহাদেশে বৃহদায়তনের শিল্প উন্নয়নের একটা নির্দেশক হয়ে উঠেছে, এটাই সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। কোন একটা দেশে বৃহদায়তনের শিল্প যে পরিমাণে সম্প্রসারিত হয় সেই অনুপাতে সেদেশে অস্তিমান শ্রেণীগুলির প্রসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান সম্বন্ধে জানার জন্যে শ্রমিকদের মধ্যে চাহিদা বাড়ে, তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার ঘটে এবং 'ইশতেহার'-এর জন্যে চাহিদা বাড়ে। এইভাবে, যেকোন দেশের ভাষায় 'ইশতেহার' কতখানা প্রচারিত হল সেটা দিয়ে দেশটিতে শ্রমিক আন্দোলনের হালই শুধু নয়, বৃহদায়তনের শিল্পের উন্নয়নের মাত্রাও বেশ যথাযথভাবে বিচার করা যায়।

তদনুসারে, পোল্যান্ডে শিল্পের একটা স্পষ্ট অগ্রগতি নির্দেশ করছে এই নতুন পোলীয় সংস্করণটা। এর আগেকার সংস্করণটা প্রকাশিত হয়েছিল দশ বছর আগে, তার পর থেকে ঐ অগ্রগতিটা যথার্থই ঘটেছে, তাতে একেবারে কোন সংশয়ই থাকতে পারে না। রুশ সাম্রাজ্যের মস্ত শিল্পাঞ্চল হয়ে উঠেছে রুশী পোল্যান্ড, কংগ্রেসী পোল্যান্ড (৫২)। রুশী বৃহদায়তনের শিল্প ইতস্তত বিক্ষিপ্ত — একাংশ রয়েছে ফিন উপসাগরের চতুর্দিকে, আর-একটা অংশ কেন্দ্রে (মস্কোয় আর ভ্যাদিমিরে), কৃষ্ণ সাগর আর আজোভ

সাগরের উপকূল বরাবর রয়েছে আর-একটা অংশ, আরও অন্যান্য অংশ রয়েছে অন্যত্র, পক্ষান্তরে পোল্যান্ডের শিল্প ঠাসা রয়েছে একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এলাকায়; এমনভাবে একত্র করার সুবিধে আর অসুবিধে দুইই আছে পোল্যান্ডের শিল্পের। প্রতিদ্বন্দ্বী রুশী শিল্পপতিরা ঐ সুবিধেগুলো লক্ষ্য ক'রে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে রক্ষণ-শুল্ক দাবি করেছিল — যদিও পোল্‌দের রুশী বনাবার প্রবল বাসনা ছিল তাদের। পোল্‌ শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারণার দ্রুত প্রসারে এবং 'ইশতেহার'-এর জন্যে বেড়ে-চলা চাহিদায় প্রকাশ পেয়েছে অসুবিধেগুলো — পোল্‌ শিল্পপতি এবং রুশ সরকারের অসুবিধেগুলো।

কিন্তু পোল্‌ জনগণের অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং তাদের জাতিগত পুনঃস্থাপনার আসন্নতার একটা নিশ্চায়ক হল রাশিয়ার শিল্পকে ছাড়িয়ে পোল্যান্ডের শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন। তাছাড়া, স্বাধীন শক্তিশালী পোল্যান্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে গরজটা পোল্‌দেরই শুধু নয়, সেটা আমাদের সবারই। ইউরোপের প্রত্যেকটি জাতি নিজ বাসভূমিতে পুরোপুরি স্বশাসিত হলে একমাত্র তবেই এই জাতিগুলির অকৃত্রিম আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্ভব। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব তো সবকিছু সত্ত্বেও প্রলেতারিয়ান সংগ্রামীদের দিয়ে করিয়েছিল শুধু বুর্জোয়াদের কাজটা, আর তাছাড়া, সেটার দায়াদী নির্বাহক লুই বোনাপার্ত আর বিসমার্কের মারফত ইতালি, জার্মানি এবং হাঙ্গেরির স্বাধীনতা হাসিল করিয়েছিল, কিন্তু এই বিপ্লবের জন্যে ১৭৯২ সাল থেকে ঐ তিনটে দেশ একত্রে যা করেছিল তার চেয়ে বেশি করেছিল পোল্যান্ড, এই দেশটি ১৮৬৩ সালে (৫৩) দশগুণ বেশি রুশী বলের কাছে অভিভূত হয়েছিল, তখন দেশটিকে কেবল নিজ সহায়-সম্বলের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। অভিজাতবর্গ পোল্যান্ডের স্বাধীনতা বজায় রাখতেও পারে নি, পুনরুদ্ধার করতেও পারে নি; এখন বুর্জোয়াদের কাছে এই স্বাধীনতার কোন গুরুত্ব নেই — এটা তো ঊন উক্তি। তবু, ইউরোপীয় জাতিগুলির সমন্বিত সহযোগের জন্যে এটা অপরিহার্য।* এই স্বাধীনতা হাসিল করতে পারে কেবল পোল্যান্ডের নবীন প্রলেতারিয়েত, তাদের হাতে সেটা নিরাপদ।

* পোলীয় সংস্করণে এই বাক্যটি বাদ দেওয়া হয়। — সম্পাঃ

পোল্যান্ডের স্বাধীনতা পোল্ শ্রমিকদের নিজেদের পক্ষে যতখানি আবশ্যক, ঠিক তেমনিই সেটা আবশ্যক বাদবাকি ইউরোপের শ্রমিকদের পক্ষেও।

ফ. এঙ্গেলস

লন্ডন, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২

১৮৯৩ সালের ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইতালীয় পাঠকদের প্রতি

বলা যেতে পারে, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এর প্রকাশনা এবং মিলান আর বার্লিনের বিপ্লব সমকালীন — ১৮৪৮ সালের ১৮ মার্চ; ঐ দুই বিপ্লব ছিল কেন্দ্রে অবস্থিত দুটি জাতির সশস্ত্র অভ্যুত্থান, একটি ইউরোপ মহাদেশের কেন্দ্রে, অন্যটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত; জাতি-দুটি তখন অবধি বিভাগ আর অভ্যন্তরীণ বিবাদের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে বৈদেশিক আধিপত্যের অধীন হয়েছিল। ইতালি ছিল অস্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীন, আর জার্মানি পড়েছিল সারা রাশিয়ার জারের জোয়ালে, এটা অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ হলেও কিছু কম কার্যকর ছিল না। ১৮৪৮ সালের ১৮ মার্চের পরিণতিতে ইতালি আর জার্মানি উভয় দেশ এই অবমাননা থেকে মুক্ত হয়েছিল; ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ সালে এই দুটি মহান জাতি পুনর্গঠিত হয়েছিল এবং যেকোনভাবেই হোক আবার তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার কারণ হল, যা কার্ল মার্কস বলতেন, যারা ১৮৪৮ সালের বিপ্লব দমন করেছিল তারা নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়েছিল সেটার দায়াদী নির্বাহক।

সর্বত্র সেই বিপ্লব ছিল শ্রমিক শ্রেণীর কর্মকাণ্ড; ব্যারিকেডগুলো তৈরি করেছিল এবং রক্ত ঢেলে মূল্য দিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীই। সরকার উচ্ছেদ করায় বুর্জোয়া রাজটাকে উচ্ছেদ করার স্পষ্ট-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল কেবল প্যারিসের শ্রমিকদের। কিন্তু তাদের নিজেদের শ্রেণী এবং বুর্জোয়া

শ্রেণীর মধ্যে মারাত্মক বৈরিতা সম্বন্ধে তারা সচেতন থাকলেও, দেশটির আর্থনীতিক অগ্রগতি কিংবা ফরাসী শ্রমিকসাধারণের মানস বিকাশ কোনটাই তখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছয় নি যাতে সামাজিক পুনর্গঠন সম্ভব হয়। কাজেই, বিপ্লব থেকে উদ্ভূত সুবিধা-সুযোগগুলো শেষপর্যন্ত তুলে নিয়েছিল পুঁজিপতি শ্রেণী। অন্যান্য দেশে — ইতালিতে, জার্মানিতে, অস্ট্রিয়ায় — শ্রমিকেরা একেবারে শুরু থেকেই করেছে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার কাজ। তবে যেকোন দেশে জাতীয় স্বাধীনতা ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন অসম্ভব। কাজেই, তখন অবধি যেসব দেশের একত্ব আর স্বশাসন ছিল না সেগুলিতে — ইতালিতে, জার্মানিতে, হাঙ্গেরিতে —১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পায়ে-পায়ে সেই একত্ব আর স্বশাসন এসেছিল, এটা ছিল অনিবার্য। ঐ তিন দেশের পরে পোল্যান্ডের পালা।

এইভাবে, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না, কিন্তু সেটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ করে দিয়েছিল, জমিন প্রস্তুত করেছিল। সমস্ত দেশে বৃহদায়তনের শিল্পে গতিশক্তি সঞ্চারিত হবার কল্যাণে গত পঁয়তাল্লিশ বছরে বুর্জোয়া রাজগুলো সর্বত্র পয়দা করেছে সংখ্যাবহু, একত্রে জড়ো করা এবং শক্তিশালী প্রলেতারিয়েত। এইভাবে বুর্জোয়া রাজ সৃষ্টি করেছে, 'ইশতেহার'-এর ভাষায় বললে, নিজ কবরখনকদের। প্রত্যেকটি জাতির স্বশাসন এবং অখন্ডতা পুনঃস্থাপিত না হলে প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক সম্মিলনী, কিংবা সাধারণ লক্ষ্য সাধনের জন্যে এইসব জাতির শান্তিপূর্ণ এবং সচেতন সহযোগিতা স্থাপন করা অসম্ভব হবে। ১৮৪৮ সালের আগেকার রাজনীতিক পরিবেশে ইতালীয়, হাঙ্গেরীয়, জার্মান, পোল্ এবং রুশ শ্রমিকদের যুক্ত আন্তর্জাতিক কার্যকরণের কথা কল্পনা করুন তো!

এইভাবে, ১৮৪৮ সালের লড়াইগুলো বিফলে যায় নি। সেই বৈপ্লবিক যুগ থেকে আমাদের সময় অবধি পঁয়তাল্লিশটা বছরও উদ্দেশ্যহীনভাবে কাটে নি। ফলগুলি পেকে উঠছে; মূল 'ইশতেহার'-এর প্রকাশন আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পক্ষে যেমনটা শুভসূচক হয়েছিল, ইতালীয় বিপ্লবের বিজয়ের পক্ষে তেমনি শুভসূচক হোক এই ইতালীয় অনুবাদের প্রকাশন, এটাই আমি কামনা করি।

পুঁজিতন্ত্র অতীতে যে বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেটাকে যথাযথভাবেই তুলে ধরা হয়েছে 'ইশতেহার'-এ। ইতালি হল প্রথম পুঁজিতান্ত্রিক জাতি। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের সমাপ্তি আর আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক যুগের উদ্বোধনকে চিহ্নিত করছে একটি মহাকায় মানবমূর্তি: একজন ইতালীয়, দান্তে, যিনি হলেন একাধারে মধ্যযুগের শেষ কবি, আর আধুনিক যুগের প্রথম কবি। ১৩০০ সালেরই মতো আজও ঘনিয়ে আসছে একটা নতুন ঐতিহাসিক যুগ। ইতালি আমাদের দেবে কি এক নতুন দান্তে, যিনি চিহ্নিত করে দেবেন এই নতুন, প্রলেতারীয় যুগের উদ্ভব-মুহূর্তটাকে?

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার

ইউরোপ ভূত দেখছে — কমিউনিজমের ভূত। এ ভূত ঝেড়ে ফেলার জন্যে একটা পবিত্র জোট বেঁধেছে সাবেকী ইউরোপের সকল শক্তি — পোপ এবং জার, মেটের্নিখ আর গিজো, ফরাসী র‍্যাডিকালেরা এবং জার্মান পুলিসগোয়েন্দারা।

এমন কোন্ প্রতিপক্ষ পার্টি আছে, ক্ষমতায় আসীন তাদের বিরোধীরা যাকে কমিউনিস্টভাবাপন্ন বলে নিন্দা করে নি? এমন প্রতিপক্ষ পার্টিই-বা কোথায় যে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর প্রতিপক্ষ দলগুলির, তথা প্রতিক্রিয়াশীল বিপক্ষদের বিরুদ্ধে পাল্টা ছুঁড়ে মারে নি কমিউনিজমের গালি?

এই তথ্য থেকে দুটি ব্যাপার বেরিয়ে আসে।

এক। ইউরোপের সকল শক্তি ইতোমধ্যে কমিউনিজমকে একটা শক্তি হিসেবে স্বীকার করেছে।

দুই। সময় এসে গেছে যখন প্রকাশ্যে, সারা জগতের সম্মুখে কমিউনিস্টদের ঘোষণা করা উচিত তাদের মতামত কী, লক্ষ্য কী, তাদের ঝোঁক কোন্ দিকে, এবং কমিউনিজমের ভূতের এই আষাঢ়ে গল্পের জবাব দেওয়া উচিত পার্টির একটা ইশতেহার দিয়েই।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে নানা জাতির কমিউনিস্টরা লন্ডনে সমবেত হয়ে নিম্নলিখিত 'ইশতেহার' প্রস্তুত করেছে; ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, ফ্লেমিশ এবং ডেনিশ ভাষায় এটি প্রকাশিত হবে।

রইল না। তার জায়গায় এল ম্যানুফ্যাকচার ব্যবস্থা। ম্যানুফ্যাকচারের মধ্য শ্রেণী ঠেলে সরিয়ে দিল গিল্ড-কর্তাদের। প্রত্যেকটা আলাদা কর্মশালার ভিতরকার শ্রমবিভাগের মুখে বিভিন্ন কর্পোরেট গিল্ডগুলির মধ্যে শ্রমবিভাগ মিলিয়ে গেল।

এদিকে বাজার বাড়তেই থাকে, চাহিদা বাড়তে থাকে। ম্যানুফ্যাকচারেও আর কুলোয় না। অতঃপর স্টীম আর কল-কব্জা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাল শিল্পোৎপাদনে। ম্যানুফ্যাকচারের জায়গা নিল অতিকায় আধুনিক শিল্প, শিল্পক্ষেত্রের মধ্য শ্রেণীর জায়গা নিল শিল্পক্ষেত্রের লাখপতিরা, গোটা গোটা শিল্পবাহিনীর হর্তাকর্তারা, আধুনিক বুর্জোয়ারা।

তার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল আমেরিকা আবিষ্কার, আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করল বিশ্ব-বাজার। এ বাজারের ফলে বাণিজ্য, নৌবাহ আর স্থলপথে যোগাযোগের প্রভূত বিকাশ ঘটল। সে বিকাশ আবার প্রভাবিত করল শিল্পের প্রসারকে; যে অনুপাতে শিল্প, বাণিজ্য, নৌবাহ আর রেলপথের প্রসার ঘটল, সেই অনুপাতেই উন্নতি হল বুর্জোয়াদের, বেড়ে গেল তাদের পুঁজি, মধ্যযুগ থেকে আগত সমস্ত শ্রেণীকেই পেছনে ঠেলে দিল।

এইভাবে দেখা যায়, আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীটা আপনিই একটা দীর্ঘ বিকাশধারার ফল, উৎপাদন আর বিনিময়-প্রণালীর ক্ষেত্রে একগুচ্ছ বিপ্লবের পরিণতি।

বিকাশের পথে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছিল শ্রেণীটির তদনুযায়ী রাজনৈতিক অগ্রগতি। সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের কর্তৃত্বাধীনে একটা নিষ্পেষিত শ্রেণী, মধ্যযুগের কমিউনে* একটা সশস্ত্র এবং স্বশাসিত সংঘ; কোথাও স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্র (যেমন ইতালি আর

* ফ্রান্সে গড়ে-উঠতে-থাকা শহরগুলি সামন্ততান্ত্রিক প্রভু আর মনিবদের কাছ থেকে স্থানীয় স্বশাসন এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে 'তৃতীয় বর্গ', (Third Estate) রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই 'কমিউন' নাম গ্রহণ করে। মোটামুটি বলা চলে, বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এখানে ইংলন্ডকে আদর্শ দেশ ধরা হয়েছে, আর রাজনৈতিক বিকাশের বেলায় ফ্রান্সকে। [১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

জার্মানিতে), আবার কোথাও-বা রাজতন্ত্রের করদাতা 'তৃতীয় বর্গ' (যেমন ফ্রান্সে); পরে, খাস ম্যানুফ্যাকচারের পর্বে অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে একটা পালটা ভার হিসেবে আধা-সামন্ততান্ত্রিক বা নিরংকুশ রাজতন্ত্রের সেবক, এবং বস্তুত সাধারণভাবে বৃহৎ রাজতন্ত্রগুলির অবলম্বন — সেই বুর্জোয়া শ্রেণী অবশেষে আধুনিক শিল্প এবং বিশ্ব-বাজার প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজকালকার প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জিতে নিয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনের একটা কমিটি মাত্র।

ঐতিহাসিক বিচারে, বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়েছে।

বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, গোষ্ঠীতান্ত্রিক এবং রাখালিয়া সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। বিবিধ সামন্ততান্ত্রিক বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল 'স্বতঃস্ফূর্ত ঊর্ধ্বতনদের' কাছে, সেগুলোকে এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিগোচর স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখে নি। আত্মসর্বস্ব হিসাবনিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় উদ্দীপনার অতি দিব্য ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ আর কূপমণ্ডূক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তি-মূল্যকে এরা বিনিময়-মূল্যে পরিণত করেছে, আর অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা খাড়া করেছে ওই **একটিমাত্র** স্বাধীনতা — অবাধ বাণিজ্য, যাতে বিবেকের স্থান নেই। এককথায়, ধর্মীয় আর রাজনৈতিক বিভ্রমে ঢাকা শোষণের বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ, পাশবিক শোষণ।

যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী সেই সবগুলিরই মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী, যাজক, কবি, বিজ্ঞানী — সকলকেই এরা নিজেদের মজুরি-ভোগী শ্রমজীবীতে পরিণত করেছে।

ইতালী আর ফ্রান্সের শহরবাসীরা তাদের সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে স্বশাসনের প্রাথমিক অধিকার কিনে অথবা কেড়ে নেবার পর নিজেদের নগর-সম্প্রদায়ের এই নাম দিয়েছিল। [১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবারপ্রথা থেকে ভাবালু ঘোমটাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে পরিণত করেছে নিছক আর্থিক সম্পর্কে।

মধ্যযুগে শক্তির যে পাশবিক প্রকাশকে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এতটা মাথায় তোলে, তারই যোগ্য পরিপূরক হিসেবে চূড়ান্ত অলসতার নিষ্ক্রিয়তা কী করে সম্ভব হয়েছিল তা বুর্জোয়া শ্রেণীই ফাঁস করে দিয়েছে। এরাই প্রথম দেখিয়ে দিল মানুষের উদ্যমে কী হতে পারে। এদের আশ্চর্য কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের পয়ঃপ্রণালী এবং গথিক গির্জাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এদের পরিচালিত অভিযান অতীতের সকল জাতির অভিনিষ্ক্রমণ (Exoduses) এবং ধর্মযুদ্ধকে (৫৫) (crusades) ম্লান করে দিয়েছে।

উৎপাদনের সাধিত্রে অবিরাম বৈপ্লবিক বদল না ঘটিয়ে, আর তাতে করে উৎপাদন-সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কে বৈপ্লবিক বদল না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী টিকে থাকতে পারে না। তার বিপরীতে অতীতে শিল্পক্ষেত্রের সকল শ্রেণীর টিকে থাকার প্রথম শর্তই ছিল সাবেকী উৎপাদন-পদ্ধতিটাকে অপরিবর্তিত রূপে বজায় রাখা। আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক পরিবেশের অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। অনড় জমাট-বাঁধা সব সম্পর্ক এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন পূর্বসংস্কার আর মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়, নবগঠিতগুলো পোক্ত হয়ে উঠবার আগেই সাবেকী হয়ে পড়ে। যাকিছু পাকাপোক্ত তা-ই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, যা পূত তা অপবিত্র হয়ে যায়, শেষপর্যন্ত মানুষ বাধ্য হয় তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে খোলা চোখে দেখতে।

নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্যে অবিরত বেড়ে-চলা বাজারের জন্যে তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।

বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ব-বাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদনের আর পরিভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। যে-জাতীয় ভূমিটার ওপর শিল্প দাঁড়িয়েছিল সেটাকে শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়ে তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করেছে। সমস্ত সাবেকী জাতীয় শিল্পকে

হয় ধ্বংস করা হয়েছে, নয় প্রত্যহ ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই মরা-বাঁচা প্রশ্নের শামিল; যেসব শিল্পে কাজ চলে দেশজ কাঁচামাল নিয়ে আর নয় -- দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে; যেসব শিল্পের উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন সব পুরন চাহিদার বদলে দেখছি নতুন নতুন চাহিদা, যা মেটাকে দরকার দূর-দূর দেশের এবং আবহাওয়ার উৎপন্ন। আগেকার স্থানীয় আর জাতীয় বিচ্ছিন্নতা আর স্বয়ংসম্পূর্ণতার জায়গায় দেখা যাচ্ছে সর্বতোমুখী আদান-প্রদান, জাতিসমূহের পৃথিবী-জোড়া পরস্পর নির্ভর। বৈষয়িক উৎপাদনে যেমন, তেমনই মানস উৎপাদনের ক্ষেত্রেও। এক-একটা জাতির মানসিক সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি। জাতিগত একপেশেমি আর সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই আরও অসম্ভব হয়ে পড়ে; বহু জাতীয় আর স্থানীয় সাহিত্য থেকে দেখা দেয় বিশ্বসাহিত্য।

সকল উৎপাদন-সাধিত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে, যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতার মাঝে টেনে আনছে সমস্ত জাতিকে, এমনকি অতি অসভ্য জাতিকেও। যে কামান দেগে তারা সমস্ত চীনা-প্রাচীর চূর্ণ করে, অসভ্য জাতিদের অতি একরোখা বিজাতি-বিদ্বেষকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে, তা হল তাদের পণ্যের সস্তা দর। সকল জাতিকে তারা বাধ্য করে বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণে, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট জাতির বিলুপ্ত হয়ে যাবার ভয় থাকে; জাতিগুলিকে বাধ্য করে সেই বস্তু গ্রহণে যাকে তারা বলে সভ্যতা — অর্থাৎ বাধ্য করে তাদেরও বুর্জোয়া বনতে। এককথায়, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের ছাঁচে জগৎটাকে গড়ে তোলে।

গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়া শ্রেণী শহরের কর্তৃত্বাধীন করেছে। সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে প্রচুর, এবং এইভাবে জনসমষ্টির একটা বিশাল অংশকে বাঁচিয়েছে গ্রামজীবনের মূঢ়তা থেকে। গ্রামাঞ্চলকে এরা যেমন শহরের মুখাপেক্ষী করে তুলেছে, ঠিক তেমনই করেছে বর্বর আর অর্ধবর্বর দেশগুলিকে সভ্য দেশের, কৃষকবহুল জাতিকে বুর্জোয়া-বহুল জাতির, প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী।

জনসমষ্টি, উৎপাদনের উপকরণ এবং সম্পত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমাগত বেশি মাত্রায় ঘুচিয়ে দিতে থাকে। জনসমষ্টিকে এরা পুঞ্জীভূত করেছে, উৎপাদনের উপকরণগুলিকে করেছে কেন্দ্রীভূত, সম্পত্তি জড়ো করেছে অল্প লোকের হাতে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। বিভিন্ন স্বার্থ, আইনকানুন, শাসনযন্ত্র এবং করপ্রথা সম্বলিত স্বাধীন কিংবা শুধু শিথিলভাবে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রদেশকে ঠেসে মেলানো হয় **এক-একটা** জাতিতে যার **একই** শাসনযন্ত্র, **একই** আইনসংহিতা, **একই** জাতীয় শ্রেণী-স্বার্থ, **একই** সীমান্ত এবং **একই** বহিঃশুল্ক।

আধিপত্যের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে না হতেই বুর্জোয়া শ্রেণী যে উৎপাদন-শক্তি সৃষ্টি করেছে তা অতীতের সকল পুরুষ-পর্যায়ের মিলিত উৎপাদন-শক্তির চেয়েও বিশাল এবং অতিকায়। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের অধীন করা, যন্ত্রপাতি, শিল্প আর কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, স্টীম-নৌবাহ, রেলপথ, ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ, গোটা গোটা মহাদেশে চাষবাসের প্রতিবন্ধ দূর করা, নদীর গতিপরিবর্তন, ভেলকিবাজির মতো যেন মাটি ফুঁড়ে জনসমষ্টির আবির্ভাব, — সামাজিক শ্রমের কোলে এতখানি উৎপাদন-শক্তি সুপ্ত ছিল তার পূর্ববোধটুকুও কি ছিল আগেকার কোন শতকের?

তাই দেখা যাচ্ছে যে-উৎপাদন আর বিনিময়ের উপকরণের ভিত্তিতে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেকে গড়ে তুলেছে সেগুলির উৎপত্তি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে। উৎপাদন আর বিনিময়ের এইসব উপকরণ বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন আর বিনিময়ের পরিবেশ, কৃষি আর ম্যানুফ্যাকচারের সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন, এককথায় সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা-সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে খাপ খেল না। সেগুলি তখন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ল, সে শৃঙ্খল ভাঙতে হত এবং তা ভেঙে ফেলা হল।

সেগুলির জায়গায় এল অবাধ প্রতিযোগিতা, সেই সঙ্গে তারই উপযোগী করে নেওয়া সামাজিক আর রাজনীতিক গঠন, আর বুর্জোয়া শ্রেণীর আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক কর্তৃত্ব।

আমাদের চোখের সামনে আজ অনুরূপ আর একটা ধারা চলেছে। নিজের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক এবং মালিকানা-সম্পর্ক সহ

আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ — ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এমন বিপুল উপকরণসমূহ গড়ে তুলেছে যে-সমাজ — তার অবস্থা আজ সেই যাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে সেগুলিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। গত বহু দশক ধরে শিল্প আর বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু উৎপাদনের আধুনিক পরিবেশের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং সেটার আধিপত্যের অস্তিত্বের যা মূলশর্ত সেই মালিকানা-সম্পর্কের বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই আরও বেশি করে বিপন্ন করে ফেলে তার উল্লেখই যথেষ্ট। এইসব সংকটে বিদ্যমান উৎপন্নের অনেকখানিই শুধু নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তিরও অনেকটা পর্যায়ক্রমে ধ্বংস হয়। এইসব সংকটের ফলে এক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়, সেটা অতীতের সকল যুগে অসম্ভব গণ্য হত — অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়; মনে হয় যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত জীবনোপায়ের যোগান, শিল্প আর বাণিজ্য যেন ধ্বংস হয়ে গেল; কিন্তু কী কারণে? কারণ, সভ্যতা হয়েছে বড্ড বেশি, জীবনোপায়ের পরিমাণ অত্যধিক, অনেক বেশি হয়ে গেছে শিল্প, অনেক বেশি বাণিজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শক্তি আছে, তা বুর্জোয়া মালিকানার পরিবেশ বিকাশে আর সাহায্য করছে না; হচ্ছে বরং উলটোটা: যে-পরিবেশ দিয়ে সে-শক্তি শৃঙ্খলিত তার পক্ষে এই শক্তি বড্ড বেশি প্রবল; সেই শক্তি শৃঙ্খল অতিক্রম করা মাত্র তা সমগ্র বুর্জোয়া সমাজে এনে ফেলে বিশৃঙ্খলতা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানার অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজের পরিবেশ যে-সম্পদ সৃষ্টি করে তা ধারণ করার পক্ষে ঐ পরিবেশ সংকীর্ণ। বুর্জোয়া শ্রেণী এইসব সংকট কাটিয়ে ওঠে কোন উপায়ে? একদিকে, উৎপাদন-শক্তির বিপুল অংশ বাধ্য হয়ে নষ্ট করে ফেলে; অপরদিকে, নতুন বাজার দখল করে এবং পুরন বাজারের পূর্ণতর শোষণে। অর্থাৎ কিনা, আরও ব্যাপক, আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথ প্রস্তুত ক'রে, এবং সংকট রোধের উপায় কমিয়ে ফেলে।

যে অস্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভূমিসাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ তারই বিরুদ্ধে উদ্যত।

যে অস্ত্রে তার মৃত্যু, বুর্জোয়া শ্রেণী সেই অস্ত্রখানা গড়েছে শুধু তাই নয়; এমন লোকও তারা সৃষ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র চালনা করবে — আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী, **প্রলেতারিয়েত।**

যে পরিমাণে বুর্জোয়া শ্রেণী, অর্থাৎ পুঁজি বেড়ে চলে, ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশ পায় প্রলেতারিয়েত, অর্থাৎ আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী, — মেহনতীদের এ শ্রেণীটি বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর তাদের কাজ জোটে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের শ্রমে পুঁজি বাড়তে থাকে। এই মেহনতীদের নিজেদের একটু একটু করে বেচতে হয়, এরা পণ্য বাণিজ্যের অন্য সমস্ত সামগ্রীর মতোই, আর কাজেই তারা প্রতিযোগিতার, সমস্ত উত্থান-পতনের বাজারের সবরকম ওঠানামার প্রভাবাধীন।

যন্ত্রের বহুল ব্যবহার এবং শ্রমবিভাগের ফলে প্রলেতারিয়ানদের কাজের কোন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যই আর নেই, এবং সেইহেতু কাজে মজুরের আকর্ষণ লোপ পেয়েছে। সে হয়েছে যন্ত্রের লেজুড়, তার কাছে চাওয়া হয় শুধু সবচেয়ে সরল, অতি একঘেয়ে, অতি সহজে আয়ত্ত-করা দক্ষতাটুকু। সুতরাং মজুর উৎপাদনের খরচটা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে প্রায় তার বেঁচে থাকার এবং তার বংশরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য জীবনোপায়ের মধ্যেই। কিন্তু পণ্যের দাম, অতএব শ্রমেরও দাম (৫৬) তার উৎপাদন খরচার সমান। সুতরাং কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা যত বাড়ে, মজুরি তত কমে। শুধু তাই নয়; যে পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার আর শ্রমবিভাগ বাড়ে, সেই একই অনুপাতে বাড়ে খাটুনির চাপ — হয় কাজের সময় বাড়িয়ে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশি কাজ আদায় করে, অথবা যন্ত্রের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে, ইত্যাদি।

আধুনিক শ্রমশিল্প কুলপতি ধরনের মনিবের ছোট কর্মশালাকে শিল্প-পুঁজিপতির বিরাট কারখানায় পরিণত করেছে। বিপুল সংখ্যায় মজুরকে ভিড় করে কারখানায় ঢোকান হয়, তারা সংগঠিত হয় সৈনিকের ধরনে। শিল্পবাহিনীর সাধারণ সৈন্য হিসেবে তাদের রাখা হয় অফিসার আর সার্জেন্টদের একটা পূর্ণাঙ্গ স্তরবিভক্ত কর্তৃত্বাধীন। তারা কেবল বুর্জোয়া শ্রেণীর আর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস নয়; দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে তাদের করা হয় যন্ত্রের দাস, পরিদর্শকের দাস, সর্বোপরি খাস বুর্জোয়া মালিকটির দাস। এই যথেচ্ছাচার যত খোলাখুলিভাবে মুনাফালাভকেই নিজের লক্ষ্য এবং

আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করে, ততই তা হয়ে ওঠে আরও হীন, আরও ঘৃণ্য, আরও তিক্ত।

শারীরিক মেহনতে দক্ষতা ও শক্তি যতই কম লাগতে থাকে, অর্থাৎ আধুনিক শ্রমশিল্প যতই বিকশিত হয়ে ওঠে, ততই পুরুষের শ্রমের স্থান জুড়ে বসতে থাকে নারী আর শিশুর শ্রম। শ্রমিক শ্রেণীর কাছে বয়স কিংবা নারী-পুরুষের তফাতটার এখন আর কোন বিশিষ্ট সামাজিক তাৎপর্য নেই। সকলেই তারা খাটবার সাধিত্র -- বয়স অথবা স্ত্রী-পুরুষের তফাত অনুসারে তাদের কাজে লাগাতে খরচ কিছু বাড়ে-কমে মাত্র।

শিল্পের মালিক কর্তৃক মজুরের উপর শোষণ খানিকটা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র, এবং সে নগদ মজুরিটা পাওয়া মাত্র, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য অংশ — বাড়িওয়ালা, দোকানদার, মহাজন, প্রভৃতি।

মধ্য শ্রেণীর নিম্ন স্তরগুলি — খুদে ম্যানুফ্যাকচারার, দোকানদার, সাধারণভাবে ভূতপূর্ব কারবারীরা, হস্তশিল্পী এবং কৃষকেরা — এরা সবাই ক্রমে ক্রমে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নেমে যায়। তার এক কারণ হল, যে-আয়তনে আধুনিক শিল্প চালান হয়, এদের সামান্য পুঁজি তার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এরা জেরবার হয়ে যায়; অপর কারণ হল, উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতির ফলে এদের বিশিষ্ট দক্ষতা অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে, প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নতুন নতুন লোক আসে জনসমষ্টির সমস্ত শ্রেণী থেকে।

বিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায় প্রলেতারিয়েত। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম শুরু হয় জন্ম মুহূর্ত থেকেই। প্রথমটায় লড়াই চালায় পৃথক পৃথক মজুরেরা; তারপর লড়তে থাকে কোন একটা কর্মশালার মেহনতীরা; তারপর কোন একটা অঞ্চলের একই পেশায় নিযুক্ত সকল শ্রমিকরা তাদের সাক্ষাৎ শোষণকারী ব্যক্তি-পুঁজিপতিটির বিরুদ্ধে লড়ে। উৎপাদনের বুর্জোয়া পরিবেশটা নয়, তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয় উৎপাদনের উপকরণই; যে আমদানি মাল তাদের মেহনতের প্রতিযোগিতা করে সেগুলিকে তারা ধ্বংস করে, কল-কব্জা ভেঙে চুরমার করে, কারখানায় আগুন লাগায়, মধ্যযুগের মেহনতকারীর যে অবস্থা লোপ পেয়েছে, গায়ের জোরে চায় তা ফিরিয়ে আনতে।

এই পর্যায়ে মজুরেরা তখনও দেশময় ছড়ানো এলোমেলো জনতামাত্র, তারা পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ছত্রভঙ্গ। কোথাও যদি তারা অধিকতর সংহত সংস্থায় একজোট হয়ও, সেটা তখনও তাদের নিজেদের সক্রিয় সম্মিলনের ফল নয়, বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মিলনের ফলমাত্র, এই শ্রেণী নিজের রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে গোটা প্রলেতারিয়েতকে সচল করতে বাধ্য হয়, এবং তখনও কিছু দিনের জন্যে তা করতে পারেও। সুতরাং এই পর্যায়ে প্রলেতারিয়ানরা লড়ে নিজেদের শত্রুর বিপক্ষে নয়, কিন্তু শত্রুর শত্রুর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অবশিষ্টাংশ — জমিদার, শিল্প-বহির্ভূত বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এইভাবে সমগ্র ঐতিহাসিক গতিটি কেন্দ্রীভূত হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে; এভাবে অর্জিত প্রতিটি জয় হয় বুর্জোয়ার জয়।

কিন্তু শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী বাড়ে কেবল সংখ্যায় নয়; সেটা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে বৃহত্তর সমষ্টিতে, সেটার শক্তি বাড়তে থাকে, আপন শক্তি সেটা আরও বেশি করে উপলব্ধি করে। কল-কব্জা যে অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের মধ্যে পার্থক্য মুছে ফেলতে থাকে, আর প্রায় সর্বত্র মজুরি কমিয়ে আনে একই নিচু মাত্রায়, সেই অনুপাতে প্রলেতারিয়েতের কাতারে বিভিন্ন স্বার্থ আর জীবনযাত্রার অবস্থা ক্রমেই আরও সমান হয়ে যেতে থাকে। বুর্জোয়াদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং তৎপ্রসূত বাণিজ্য-সংকটে শ্রমিকের মজুরি হয় আরও বেশি দোদুল্যমান। যন্ত্রের অবিরাম উন্নতি ক্রমেই আরও দ্রুততালে বাড়তে থাকে, তার ফলে মজুরের জীবিকা হয়ে পড়ে আরও অনিশ্চিত; এক-একজন মজুরের সঙ্গে এক-একজন বুর্জোয়ার সঙ্ঘর্ষ ক্রমেই বেশি করে দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। তখন মজুরেরা মিলিত সমিতি গঠন শুরু করে (ট্রেড ইউনিয়ন) বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে; মজুরির হার বজায় রাখার জন্যে তারা জোট বাঁধে; মাঝে-মধ্যে ঘটা এইসব বিদ্রোহের ব্যাপারে আগে থাকতে ব্যবস্থা রাখার জন্যে তারা স্থায়ী সংগঠন গড়ে। এখানে-ওখানে লড়াইটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণত হয়।

মাঝে মাঝে শ্রমিকেরা জয়ী হয়, কিন্তু কেবল অল্পকালের জন্যে। তাদের সংগ্রামের আসল লাভটা আশু ফলাফলে নয়, সেটা শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান

সম্মিলনে। এই সম্মিলনে সহায় হয় আধুনিক শিল্পের সৃষ্টি-করা যোগাযোগের উন্নততর ব্যবস্থা, সেটার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। একই ধরনের অসংখ্য স্থানীয় লড়াইকে দেশব্যাপী শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত করার জন্যে ঠিক এই সংযোগটারই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটা শ্রেণী-সংগ্রামই রাজনীতিক সংগ্রাম। শোচনীয় রাস্তাঘাটের দরুন যে সম্মিলন ঘটাতে মধ্যযুগের বার্গারদের শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগেছিল, আধুনিক শ্রমিকরা রেলপথের কল্যাণে তা হাসিল করে অল্প কয়েক বছরে।

শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়ানদের সংগঠিত হওয়া এবং তার ফলে এক রাজনীতিক পার্টিতে পরিণত হওয়াটাকে অবিরাম ব্যর্থ করে দেয় তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কিন্তু প্রতিবারই প্রবলতর, দৃঢ়তর, আরও শক্তিশালী হয়ে সংগঠন মাথা তোলে। বুর্জোয়াদেরই মধ্যকার বিভেদ কাজে লাগিয়ে সেটা শ্রমিকদের এক-একটা স্বার্থকে আইনত মেনে নিতে বাধ্য করে। ইংলন্ডে দশ-ঘণ্টার বিল্ পাস হয়েছিল এইভাবে।

মোটের উপর, পুরন সমাজের নানা শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত প্রলেতারিয়েতের বিকাশের ধারাটাকে নানাভাবে এগিয়ে দেয়। বুর্জোয়া শ্রেণী অবিরাম লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে। লড়াইটা প্রথমে হয় অভিজাতদের সঙ্গে; বুর্জোয়া শ্রেণীরই যে-যে অংশের স্বার্থ শিল্পে অগ্রগতির বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে পরে; আর সর্বদাই বিদেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে। সমস্ত সংগ্রামেই বুর্জোয়াদের বাধ্য হয়ে প্রলেতারিয়েতের কাছে আবেদন করতে হয়, সাহায্য চাইতে হয়, এবং এইভাবে তাদের টেনে আনতে হয় রাজনীতিক রঙ্গভূমিতে। সুতরাং বুর্জোয়ারা নিজেরাই প্রলেতারিয়েতকে তাদের নিজেদের রাজনীতিক এবং সাধারণ শিক্ষার কিছু কিছু যোগায়, অর্থাৎ কিনা, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়বার অস্ত্র প্রলেতারিয়েতকে তারাই যোগায়।

এছাড়া, আমরা আগেই দেখেছি, শিল্পের অগ্রগতির ফলে শাসক শ্রেণীগুলির গোটা-গোটা অংশ প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, কিংবা অন্তত তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা বিপন্ন হয়। এরাও আবার প্রলেতারিয়েতকে যোগায় জ্ঞান আর প্রগতির নতুন নতুন উপাদান।

শেষপর্যন্ত, শ্রেণী-সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তের কাছে এসে পড়ে, তখন শাসক শ্রেণীর ভিতরে, বস্তুতপক্ষে পুরন সমাজের গোটা পরিধি জুড়ে সক্রিয় ভাঙনের প্রক্রিয়াটা এমন উগ্র দগদগে হয়ে ওঠে যাতে শাসক শ্রেণীর একটা ছোট অংশ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে হাত মেলায় বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে, যে-শ্রেণীর হাতেই ভবিষ্যৎ। সুতরাং আগেকার একযুগে যেমন অভিজাতদের একটা অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি এখন শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেয় বুর্জোয়াদের একটা ভাগ, বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদদের একাংশ, যারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বের দিক থেকে বুঝতে পারার স্তরে নিজেদের উন্নীত করেছে।

আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখোমুখি দাঁড়ান সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েতই প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক শিল্পের মুখে ক্ষয় হতে হতে শেষে লোপ পায়; প্রলেতারিয়েত হল এই শিল্পের বিশিষ্ট এবং সারবান সৃষ্টি।

নিম্ন মধ্যশ্রেণী, খুদে ম্যানুফ্যাকচারার, দোকানদার, কারিগর, কৃষক — এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর টুকরো হিসেবে অস্তিত্বের লুপ্তি ঠেকাবার জন্যে। তাই তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। শুধু তাই নয় — তারা প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার চেষ্টা করে তারা। আপাতিকভাবে যদি এরা বিপ্লবী হয়, সেটা কেবল তাদের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে পড়ে যাওয়াটা আসন্ন, এই বিবেচনা থেকে; সুতরাং তারা সেক্ষেত্রে রক্ষা করে তাদের বর্তমান স্বার্থ নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থ; নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে তারা গ্রহণ করে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি।

পুরন সমাজের নিম্নতম স্তরগুলো থেকে ছিটকে-পড়া নিষ্ক্রিয়ভাবে পচতে-থাকা জনতার সামাজিক আবর্জনাটা, 'বিপজ্জনক শ্রেণী'টা প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের তোড়ে এখানে-ওখানে আন্দোলনের ভিতরে এসে পড়তে পারে, কিন্তু এদের জীবনযাত্রায় ধরনটাই প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের ভাড়াটে হাতিয়ারের ভূমিকার জন্যেই তাদের তৈরি করে তোলে অনেক বেশি পরিমাণে।

পুরন সমাজের সাধারণ পরিস্থিতিটা প্রলেতারিয়েতের জীবনে ইতোমধ্যে প্রায় লোপ পেতে বসেছে। প্রলেতারিয়ানের সম্পত্তি নেই; স্ত্রী-পুত্র-কন্যার

সঙ্গে তার সম্বন্ধের আর কোন মিল নেই বুর্জোয়া পারিবারিক সম্বন্ধের সঙ্গে; আধুনিক শিল্প-শ্রম, পুঁজির কাছে আধুনিক ধরনের অধীনতা, যা ইংলন্ড বা ফ্রান্স, আমেরিকা অথবা জার্মানিতে একই প্রকার, সেটা তার জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের লেশমাত্রও অবশিষ্ট রাখে নি। তার কাছে আইন, নৈতিকতা, ধর্ম হল কতকগুলো বুর্জোয়া পূর্বসংস্কার মাত্র, যার পিছনে ওঁৎ পেতে থাকে ততগুলোই বুর্জোয়া স্বার্থ।

অতীতে যেসব শ্রেণী প্রাধান্য পেয়েছে তারা সবাই গোটা সমাজকে নিজেদের ভোগ-দখলের উপযোগী অবস্থার অধীন করে নিরাপদ করতে চেয়েছে। প্রলেতারিয়ানরা নিজেদের পূর্বতন ভোগ-দখলের প্রণালী উচ্ছেদ করে ছাড়া, এবং তাতে করে ভোগ-দখলের আগেকার প্রত্যেকটি প্রণালীর অবসান ঘটিয়ে ছাড়া সমাজের উৎপাদন-শক্তির মালিক হতে পারে না। নিরাপদে রক্ষা করার মতো নিজস্ব কিছুই তাদের নেই; ব্যক্তিগত মালিকানার সমস্ত পূর্বতন নিরাপত্তা আর নিশ্চিতি নির্মূল করে দেওয়াই তাদের নির্দিষ্ট ব্রত।

অতীত ইতিহাসে প্রতিটি আন্দোলন ছিল সংখ্যাল্পের দ্বারা অথবা সংখ্যাল্পের স্বার্থে আন্দোলন। প্রলেতারীয় আন্দোলন হল বিরাট সংখ্যাধিক্যের স্বার্থে বিপুল সংখ্যাধিক্যের আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন। প্রলেতারিয়েত আজকের সমাজে নিম্নতম স্তর; তাকে নড়তে হলে, উঠে দাঁড়াতে হলে উপরে চাপানো সরকারী সমাজের গোটা স্তরটিকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করা ছাড়া তার উপায় নেই।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াইটা মর্মবস্তুতে না হলেও আকারের দিক থেকে প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম। প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্য সর্বাগ্রে ফয়সালা করতে হবে দেশীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে।

প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ পর্যায়গুলির বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি বিদ্যমান সমাজের ভিতরে কমবেশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলে, সে-যুদ্ধ একটা সন্ধিক্ষণে প্রকাশ্য বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের বলপূর্বক উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যের ভিত্তি।

আমরা আগেই দেখেছি, আজ পর্যন্ত সব ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে অত্যাচারী আর অত্যাচারিত শ্রেণীর বিরোধের ভিত্তিতে। কিন্তু কোন শ্রেণীর উপর অত্যাচার করতে হলে সেটা যাতে তার দাসোচিত অস্তিত্বটুকু অন্তত চালিয়ে যেতে পারে এমন কিছুটা অবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। ভূমিদাসত্বের যুগে ভূমিদাস নিজেকে কমিউন-সভ্যের পর্যায়ে তুলেছিল, ঠিক যেমন সামন্ত-স্বৈরতন্ত্রের জোয়ালে পেটি বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া হয়ে উঠতে পেরেছিল। তার বিপরীতে, আধুনিক শ্রমিক শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উপরে ওঠে না, নিজ শ্রেণীর অস্তিত্বের জন্যে আবশ্যক অবস্থার নিচে, ক্রমাগত নিচে নেমে যেতে থাকে। সে হয়ে পড়ে নিঃস্ব আর নিঃস্বতা বেড়ে চলে জনসংখ্যা আর সম্পদের বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর তালে। এই সূত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর সমাজের শাসক হয়ে থাকার এবং নিজেদের অস্তিত্বের উপযোগী অবস্থাটিকে চরম বিধান হিসেবে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখার যোগ্যতা আর নেই। বুর্জোয়া শ্রেণী শাসন চালাবার উপযুক্ত নয়, কারণ সেটা দাসত্বের মধ্যে দাসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষম, দাসকে এমন অবস্থায় না নামিয়ে পারে না যেখানে দাসের দৌলতে খাওয়ার বদলে দাসকেই খাওয়াতে হয়। এই বুর্জোয়ার অধীনে সমাজ আর থাকতে পারে না, অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলতে গেলে সেটার অস্তিত্ব সমাজের সঙ্গে আর খাপ খায় না।

বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং আধিপত্যের মূলশর্ত হল পুঁজির সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি; পুঁজির শর্ত হল মজুরি-শ্রম। মজুরি-শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুরদের মধ্যকার প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। শিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা-হেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন-হেতু বৈপ্লবিক সংযুক্তি। সুতরাং, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে এবং উৎপন্ন ভোগ-দখল করে, সেই ভিত্তিটাকেই তার পায়ের তলা থেকে কেটে সরিয়ে দেয় আধুনিক শিল্পের বিকাশ। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করে সর্বোপরি তারই কবরখনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য।

২

প্রলেতারিয়ানরা এবং কমিউনিস্টরা

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়ানদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কী সম্বন্ধ?

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টিগুলির বিরুদ্ধ পৃথক পার্টি কমিউনিস্টরা গঠন করে না।

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন কোন স্বার্থ তাদের নেই।

প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে-পিটে তোলার জন্যে তারা কোন নিজস্ব গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের তফাতটা শুধু এই: (১) বিভিন্ন দেশের প্রলেতারিয়ানদের জাতীয় সংগ্রামে তারা জাতি-নির্বিশেষে সমগ্র প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে। (২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, তাতে তারা সর্বদা এবং সর্বত্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থটাকে তুলে ধরে।

সুতরাং কমিউনিস্টরা হল, একদিকে, কার্যক্ষেত্রে প্রতি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর এবং দৃঢ়চিত্ত অংশ -- যে-অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়; অপরদিকে, তত্ত্বের দিক দিয়ে, প্রলেতারিয়েতের বিপুল অংশের সঙ্গে তুলনায় তাদের এই সুবিধেটা আছে যে, প্রলেতারিয়ান আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, পরিবেশ এবং আখেরী সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে।

কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য প্রলেতারিয়ানদের অন্যান্য পার্টির উদ্দেশ্য থেকে অভিন্ন: প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী হিসেবে গঠিত করা, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনীতিক ক্ষমতা জয়।

কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি মোটেই এমন কোন ধারণা বা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যা অমুক কিংবা তমুক হবু বিশ্বসংস্কারকের উদ্ভাবন বা আবিষ্কার।

বিদ্যমান শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে, আমাদের চোখের সামনেই ঘটমান ঐতিহাসিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত বাস্তব সম্পর্কগুলি কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে সাধারণ অভিধায় প্রকাশ করা হয় মাত্র। প্রচলিত মালিকানা-সম্পর্কের উচ্ছেদটা মোটেই কমিউনিজমের বিশেষত্ব নয়।

ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে অতীতের সমস্ত মালিকানা-সম্পর্কে ক্রমাগত ঐতিহাসিক বদল ঘটেছে।

যেমন, ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া মালিকানার অনুকূলে সামন্ত মালিকানা উচ্ছেদ করে।

সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। কিন্তু শ্রেণীবিরোধের উপর, অল্পলোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন ভোগ-দখল ব্যবস্থার চূড়ান্ত এবং পূর্ণতম প্রকাশ হল আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা।

এই অর্থে কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এই এককথায় চুম্বক করা যায়: ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।

আমাদের বিরুদ্ধে — কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে — অনুযোগ করা হয় যে, ব্যক্তির নিজ পরিশ্রমের ফল হিসেবে নিজস্ব সম্পত্তি অর্জনের অধিকার আমরা উচ্ছেদ করতে চাই, বলা হয় যে, সকল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কর্ম আর স্বাবলম্বনের মূলভিত্তি হল এই সম্পত্তি।

কষ্টলব্ধ, নিজে সংগ্রহ-করা, স্বোপার্জিত সম্পত্তি! সামান্য কারিগর এবং খুদে কৃষকের সম্পত্তির কথাই কি বলা হচ্ছে, যে ধরনের সম্পত্তি ছিল বুর্জোয়া সম্পত্তির আগে? তা উচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন নেই; শিল্পের বিকাশ ইতোমধ্যে সেটাকে অনেকাংশে ধ্বংস করেছে, এখনও প্রতিদিন ধ্বংস করে চলছে।

নাকি বলা হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা?

কিন্তু মজুরি-শ্রম কি মজুরদের জন্যে কোন সম্পত্তি সৃষ্টি করে? একটুও না। সেটা সৃষ্টি করে পুঁজি, অর্থাৎ সেই ধরনের সম্পত্তি যা মজুরি-শ্রমকে শোষণ করে, নিত্য নতুন শোষণের জন্যে মজুরি-শ্রমের নতুন নতুন সরবরাহ সৃষ্টির শর্তে ছাড়া যা বাড়তে পারে না। বর্তমান ধরনের এই

সম্পত্তি পুঁজি এবং মজুরি-শ্রমের বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিরোধের দুইটি দিকই পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পুঁজিপতি হওয়া মানে উৎপাদনক্ষেত্রে শুধু একটা নিছক ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠাও পাওয়া। পুঁজি একটা যৌথ উৎপাদ; সমাজের শুধু অনেক লোকের মিলিত কাজ দিয়ে, এমনকি শেষপর্যন্ত, সমাজের শুধু সকল লোকের মিলিত কর্ম দিয়েই পুঁজিকে চালু করা যায়।

পুঁজি তাই ব্যক্তিগত শক্তি নয়, একটা সামাজিক শক্তি।

কাজেই, পুঁজিকে সাধারণের সম্পত্তিতে, অর্থাৎ সমাজের সকল লোকের সম্পত্তিতে পরিণত করলে তার দ্বারা নিজস্ব সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় না। মালিকানার সামাজিক প্রকৃতিটাই কেবল বদলে যায়। তার শ্রেণীগত প্রকৃতিটা লোপ পায়।

এবার মজুরি-শ্রমের কথা ধরা যাক।

মজুরি-শ্রমের গড়পড়তা দাম হল নিম্নতম মজুরি, অর্থাৎ মেহনতী হিসেবে মেহনতীর মাত্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার জন্যে যা একান্ত আবশ্যক, গ্রাসাচ্ছাদনের সেইটুকু উপকরণ। সুতরাং মজুরি-শ্রমিক শ্রম করে যেটুকু ভোগ-দখল করে তাতে কেবল কোনক্রমে এই অস্তিত্বটুকু চালিয়ে যাওয়া এবং পুনরুৎপাদন করা চলে। শ্রমোৎপন্নের উপর এই নিজস্ব ভোগ-দখল, যা কেবল মানুষের জীবন বজায় রাখা এবং পুনরুৎপাদনের কাজে লাগে এবং অপরের শ্রমের উপর কর্তৃত্ব চালাবার মতো কোন উদ্বৃত্ত যার থেকে অবশিষ্ট থাকে না, সেটার উচ্ছেদ একেবারেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ভোগ-দখলের এই শোচনীয় প্রকৃতিটা, যে-অবস্থায় শ্রমিক বাঁচে শুধু পুঁজি বাড়ানর জন্যে, আর তাকে বাঁচতে দেওয়া হয় শাসক শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যতটা প্রয়োজন শুধু ততখানি পর্যন্ত, শুধু সেটাকেই আমরা খতম করতে চাই।

বুর্জোয়া সমাজে জীবন্ত শ্রম হল সঞ্চিত শ্রম বাড়াবার উপায়মাত্র। কমিউনিস্ট সমাজে কিন্তু সঞ্চিত শ্রম হল মেহনতীর জীবনকে উদারতর, সমৃদ্ধতর, উন্নততর করে তোলার উপায়মাত্র।

সুতরাং বুর্জোয়া সমাজে বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত; কমিউনিস্ট সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর। বুর্জোয়া

সমাজে পুঁজি স্বাধীন, সেটার আছে ব্যক্তিতা, কিন্তু জীবন্ত মানুষ পরাধীন, ব্যক্তিতাবিহীন।

অথচ এমন অবস্থার অবসানকেই বুর্জোয়ারা বলে ব্যক্তিতা আর স্বাধীনতা উচ্ছেদ! কথাটা সত্যই। বুর্জোয়া ব্যক্তিতা, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য, বুর্জোয়া স্বাধীনতার উচ্ছেদই যে লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই।

উৎপাদনের বর্তমান বুর্জোয়া অবস্থায় স্বাধীনতার অর্থ হল অবাধ বাণিজ্য, অবাধ বেচাকেনা।

কিন্তু যদি বেচাকেনাই লোপ পায়, তবে অবাধ বেচাকেনাও অন্তর্ধান করে। এই অবাধ বেচাকেনার কথাটা এবং সাধারণভাবে স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের বুর্জোয়াদের অন্য সমস্ত 'বাক্য-বীরত্বের' যদি কোন অর্থ থাকে তবে সে শুধু সীমাবদ্ধ বেচাকেনার সঙ্গে তুলনায়, মধ্যযুগীয় বাধাগ্রস্ত বণিকদের সঙ্গে তুলনায়; কিন্তু কেনাবেচা, উৎপাদনের বুর্জোয়া পরিবেশ এবং খোদ বুর্জোয়া শ্রেণীটারই কমিউনিস্ট ধরনের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দাঁড় করান হলে ওসব কথার কোন অর্থ হয় না।

আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনসমষ্টির শতকরা নব্বই জনের বেলায় ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতোমধ্যে লোপ করা হয়েছে; অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে সেটা আছে শুধু ঐ দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে তা নেই বলে। সুতরাং, যে-ধরনের মালিকানার অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত হল সমাজের বিপুল সংখ্যাধিক লোকের কোন সম্পত্তি না থাকা, সেটা আমরা তুলে দিতে চাই, এটাই আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অনুযোগ।

এককথায়, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অনুযোগ এই যে, আপনাদের মালিকানার উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক তাইই, আমাদের সংকল্প ঠিক তা-ই।

যখন থেকে মানুষের শ্রমকে আর পুঁজি, মুদ্রা অথবা খাজনাতে পরিণত করা চলে না, যাতে একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করা যায় এমন একটা সামাজিক শক্তিতে পরিণত করা যায় না — অর্থাৎ যেই ব্যষ্টিগত সম্পত্তিকে আর বুর্জোয়া সম্পত্তিতে, পুঁজিতে রূপান্তরিত করা যায় না, আপনারা বলেন, তখন থেকে ব্যক্তিতা মিলিয়ে যায়।

তাহলে আপনাদের স্বীকার করতেই হবে যে, 'ব্যক্তি' বলতে

বুর্জোয়া ছাড়া, সম্পত্তির মধ্য-শ্রেণীর মালিক ছাড়া অন্য কাউকে আপনারা বোঝান না। এহেন ব্যক্তিকে অবশ্যই পথ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে, তার অস্তিত্ব করে তুলতে হবে অসম্ভব।

সমাজের উৎপন্ন জিনিসে ভোগ-দখলের ক্ষমতা থেকে কমিউনিজম কাউকে বঞ্চিত করে না; এমন ভোগ-দখলের সাহায্যে অপরের শ্রম করায়ত্ত করার ক্ষমতা থেকেই শুধু কমিউনিজম তাকে বঞ্চিত করতে চায়।

আপত্তি উঠেছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সর্বব্যাপী আলস্য আমাদের অভিভূত করবে।

এই মত ঠিক হলে বহুপূর্বেই নিছক আলস্যের টানে বুর্জোয়া সমাজের রসাতলে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ ও-সমাজে যারা খাটে তারা কিছু অর্জন করে না, আর যারা কিছু অর্জন করে তারা খাটে না। গোটা আপত্তিটাই অন্য ভাষায় এই পুনরুক্তির শামিল: যখন পুঁজি আর থাকবে না তখন মজুরি-শ্রমও আর থাকতে পারে না।

বৈষয়িক দ্রব্যের উৎপাদন আর ভোগ-দখল বিষয়ে কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধে যত আপত্তি আনা হয়, মানসিক সৃষ্টির উৎপাদন আর ভোগ-দখল সম্পর্কে কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধেও ঠিক সেই আপত্তি তোলা হয়। বুর্জোয়াদের কাছে শ্রেণীগত মালিকানার উচ্ছেদটা যেমন উৎপাদনেরই অবসান বলে মনে হয়, তেমনি শ্রেণীগত সংস্কৃতির লোপ তাদের কাছে সকল সংস্কৃতি লোপ পাওয়ার সমার্থক।

যে সংস্কৃতির অবসানের ভয়ে বুর্জোয়ারা বিলাপ করে, সেটা বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের কাছে যন্ত্র হিসেবে কাজ করার তালিম মাত্র।

কিন্তু বুর্জোয়া মালিকানা উচ্ছেদে আমাদের সংকল্পের বেলায় যদি আপনারা স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, আইন, ইত্যাদির বুর্জোয়া ধারণার মানদণ্ড খাটান, তাহলে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন না। আপনাদের ধারণাগুলিই আপনাদের বুর্জোয়া উৎপাদন আর বুর্জোয়া মালিকানার পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত, ঠিক যেমন আপনাদের শ্রেণীর ইচ্ছাটা সকলের উপর আইন হিসেবে চাপিয়ে দেওয়াটাই আপনাদের ব্যবহারশাস্ত্র, আপনাদের এ ইচ্ছাটার মূল প্রকৃতি আর লক্ষ্য আবার নির্ধারিত হয় আপনাদের শ্রেণীর অস্তিত্বের আর্থনীতিক অবস্থা দিয়ে।

আপনাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি আর মালিকানার ধরন থেকে যেসব সামাজিক রূপ মাথা তোলে — যেসব ঐতিহাসিক সম্পর্ক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয় এবং লয় পায় — সেগুলিকে আত্মপরায়ণ বিভ্রান্তির ফলে আপনারা প্রকৃতি আর বিচারবুদ্ধির চিরন্তন নিয়মে রূপান্তরিত করতে চান; আপনাদের আগে যত শাসক শ্রেণী এসেছে তাদের সকলেরই ছিল অনুরূপ বিভ্রান্তি। প্রাচীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে-কথাটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার, সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির বেলায় যা আপনারা মেনে নেন, সেটাকে আপনাদের নিজস্ব বুর্জোয়া ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বীকার করা অবশ্য আপনাদের বারণ।

পরিবারের উচ্ছেদ! উগ্র চরমপন্থীরা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের এই গর্হিত প্রস্তাবে ক্ষেপে ওঠে।

এখনকার পরিবার, অর্থাৎ বুর্জোয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠা কোন্ ভিত্তির উপর? সে ভিত্তি হল পুঁজি, ব্যক্তিগত লাভ। পূর্ণ বিকশিত রূপে এই পরিবার আছে শুধু বুর্জোয়াদের মধ্যেই। কিন্তু এই অবস্থার অনুপূরক দেখা যাবে প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে পরিবারের কার্যত অনুপস্থিতিতে এবং প্রকাশ্য পতিতাবৃত্তিতে।

বুর্জোয়া পরিবারের অনুপূরকটার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া পরিবার লোপ পাবে স্বভাবতই, আর পুঁজি মিলিয়ে যাবার সঙ্গেই ঘটবে উভয়ের অন্তর্ধান।

আমাদের বিরুদ্ধে কি আপনাদের অভিযোগ এই যে, সন্তানের উপর পিতামাতার শোষণ আমরা বন্ধ করে দিতে চাই? এ দোষ আমরা অস্বীকার করব না।

কিন্তু আপনারা বলবেন, আমরা সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ক ধ্বংস করে দিই যখন আমরা গৃহ-শিক্ষার স্থানে বসাই সামাজিক শিক্ষা।

আর আপনাদের শিক্ষাটা! সেটাও কি সামাজিক নয়? যে সামাজিক অবস্থার আওতায় আপনারা শিক্ষা দেন তা দিয়ে, সমাজের সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ মারফত, স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে কি সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় না? শিক্ষা ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন নয়; তারা

চায় শুধু হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলাতে, শাসক শ্রেণীর প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।

আধুনিক শিল্পের ক্রিয়াফলে প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে সকল পারিবারিক বন্ধন যত বেশি মাত্রায় ছিন্ন হতে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা যত বেশি করে মামুলি কেনাবেচার বস্তু এবং শ্রমের হাতিয়ারে পরিণত হতে থাকে, ততই পরিবার আর শিক্ষা বিষয়ে, বাপ-মা আর ছেলেমেয়েদের মধ্যে পবিত্র সম্বন্ধ বিষয়ে বুর্জোয়াদের বাগাড়ম্বর ঘৃণ্য হয়ে ওঠে।

সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণী সমস্বরে চীৎকার করে বলে — কিন্তু তোমরা কমিউনিস্টরা যে নারীর উপর যৌথ ভোগ-অধিকার কায়েম করতে চাও।

বুর্জোয়ারা নিজেদের স্ত্রীদের নিছক উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবেই দেখে থাকে। আর তারা শোনে যে, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলিকে যৌথভাবে ব্যবহার করা হবে, আর স্বভাবতই, সাধারণের ভোগ্য হবার নিয়তি ঘটবে নারীরও, এছাড়া কোন সিদ্ধান্তে তারা আসতে পারে না।

ঘুণাক্ষরেও তাদের মনে জাগে না যে, আসল লক্ষ্য হল উৎপাদনের হাতিয়ার মাত্র হয়ে থাকার দশা থেকে নারীর মুক্তি।

বাদবাকিটা সম্বন্ধে কথা হল এই যে, নারীর উপর যৌথ ভোগ-অধিকার কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, এই ভান করে আমাদের বুর্জোয়ারা যে-নৈতিক ক্রোধ দেখায় তার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু নেই। নারীর উপর যৌথ ভোগ-অধিকার কায়েম করার প্রয়োজন কমিউনিস্টদের নেই; প্রায় স্মরণাতীতকাল থেকেই সেটার প্রচলন আছে।

মামুলি বেশ্যার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, তাদের মজুরদের স্ত্রী-কন্যাদের ব্যবহারের ক্ষমতা পেয়েও আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পরস্পরের স্ত্রীকে ফুসলে নেওয়াতেই তাদের পরম আনন্দ।

বুর্জোয়া বিবাহ আসলে অনেকে মিলে সাধারণের স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা। সুতরাং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বড়জোর এই বলে অভিযোগ আনা সম্ভব যে, নারীর উপর যে যৌথ ভোগ-অধিকার ভণ্ডামির আড়ালে লুকানো রয়েছে সেটাকে তারা করতে চায় প্রকাশ্যে বিধিবদ্ধ। বাদবাকিটা সম্বন্ধে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত

নারীর উপর যৌথ ভোগ-অধিকারেরও অবসান ঘটবেই, অর্থাৎ প্রকাশ্য আর ঘরোয়া দুই ধরনেরই বেশ্যাবৃত্তি শেষ হয়ে যাবে।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ এই যে, তারা চায় দেশ আর জাতিসত্তার বিলোপ।

মেহনতীদের দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনীতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির পরিচালক শ্রেণী হয়ে উঠতে হবে, নিজেকেই হয়ে উঠতে হবে জাতি, তাই সেদিক থেকে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতীয়, যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, বিশ্ব-বাজার, উৎপাদন-পদ্ধতির একরূপতা এবং সেটার উপযুক্ত জীবনযাত্রার পরিবেশ — এইসবের জন্যে জাতিগত পার্থক্য এবং জাতিবিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই আরও মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যে সেগুলোর আরও দ্রুত অবসান ঘটবে। প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম সর্বপ্রথম শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী সভ্য দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টা।

যে পরিমাণে এক ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির শোষণ শেষ করা হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির উপর অপর জাতির শোষণও শেষ হবে। যে পরিমাণে জাতির ভিতরকার শ্রেণীবিরোধ শেষ করা হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও শেষ হয়ে যাবে।

ধর্ম, দর্শন এবং সাধারণভাবে ভাবাদর্শের দিক থেকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয় সেগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হবারও যোগ্য নয়।

মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের পরিবেশ, সামাজিক সম্পর্ক এবং সমাজ-জীবনে প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাব-ভাবনা, মতামত আর ধারণা, এককথায় মানুষের চেতনা বদলে যায়, একথা বুঝতে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাগে?

বৈষয়িক উৎপাদন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে মানসিক উৎপাদনের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে, এছাড়া আর কী প্রমাণ করে ভাব-

ধারণার ইতিহাস? প্রতি যুগেই যেসব ভাব-ধারণা আধিপত্য করেছে সেগুলি চিরকালই তখনকার শাসক শ্রেণীরই ভাব-ধারণা।

লোকে যখন এমন ভাব-ধারণার কথা বলে যা সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়, তারা শুধু এই সত্যই প্রকাশ করে যে, পুরন সমাজের ভিতরে নতুন এক সমাজের উপাদান সৃষ্টি হয়েছে, আর অস্তিত্বের পুরন পরিবেশের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে পুরন ভাব-ধারণার বিলোপ সমান তাল রেখে চলেছে।

প্রাচীন জগতের যখন অন্তিম অবস্থা, তখন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রাচীন ধর্মগুলিকে পরাস্ত করেছিল। খ্রীষ্টান ভাব-ধারণা যখন আঠার শতকে যুক্তিবাদী ভাব-ধারণার কাছে হার মানে তখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মৃত্যু-সংগ্রাম চলেছিল সেদিনের বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে। ধর্মমতের স্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতা শুধু জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার আধিপত্যটাকেই রূপ দিল।

বলা হবে যে, 'ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে ধর্মীয়, নৈতিক, দার্শনিক এবং আইনগত ধারণাগুলিতে পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সে পরিবর্তন সত্ত্বেও নিয়ত টিকে থেকেছে ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, রাজনীতি আর আইন।

'তাছাড়া, আছে স্বাধীনতা, ন্যায়, ইত্যাদি চিরন্তন সত্য, সেগুলি সমাজের সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান। কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্যগুলিকে উড়িয়ে দেয়, ধর্ম আর নৈতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে স্থাপিত না করে সব ধর্ম এবং সব নৈতিকতাই উচ্ছেদ করে; তাই কমিউনিজম সক্রিয় হয় ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে।'

এই অভিযোগ কোথায় এসে দাঁড়ায়? সকল অতীত সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণীবিরোধের বিকাশ, যে-বিরোধ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে বিভিন্ন যুগে।

কিন্তু যে রূপই নিক, একটা ব্যাপার অতীতের সকল যুগেই বর্তমান, যথা: সমাজের এক অংশের উপর অপর অংশের শোষণ। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, অতীত যুগগুলির সামাজিক চেতনায় যত বিভিন্নতা আর বিচিত্রতাই প্রকাশ পাক না কেন, তা কয়েকটি নির্দিষ্ট সাধারণ রূপ বা

সাধারণ ভাব-ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, শ্রেণীবিরোধের সম্পূর্ণ লুপ্তির সঙ্গে ছাড়া তা পুরোপুরি অদৃশ্য হতে পারে না।

কমিউনিস্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত মালিকানা সম্পর্কের সঙ্গে সবচেয়ে আমূল বিচ্ছেদ; এই বিপ্লবের বিকাশের সঙ্গে জড়িত রয়েছে চিরাচরিত ভাব-ধারণাগুলির সঙ্গে একেবারে আমূল বিচ্ছেদ, তাতে আর আশ্চর্য কি।

কিন্তু কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া আপত্তির প্রসঙ্গ এখানে শেষ করা যাক।

আগে আমরা দেখেছি, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবে প্রথম ধাপ হল প্রলেতারিয়েতকে শাসক শ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামে জেতা।

বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেওয়ার জন্যে, রাষ্ট্রের হাতে, অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত সাধিত্র কেন্দ্রীভূত করার জন্যে, এবং উৎপাদন-শক্তির সমষ্টিটাকে যথাসম্ভব দ্রুত বাড়িয়ে তোলার জন্যে প্রলেতারিয়েত তার রাজনীতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।

শুরুতে অবশ্য মালিকানা অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদনের পরিবেশের উপর জবরদস্তির হস্তক্ষেপের সাহায্য ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না; সুতরাং সেগুলি এমন ব্যবস্থা যা অর্থনীতির দিক থেকে মনে হবে যথেষ্ট নয়, টেকে না, কিন্তু চলার পথে সেগুলো নিজেদের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং পুরন সমাজব্যবস্থার উপর আরও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন সৃষ্টি করে, এবং উৎপাদন-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উপায় হিসেবে অপরিহার্য।

অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে এইসব ব্যবস্থা হবে বিভিন্ন।

তাসত্ত্বেও সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি মোটের ওপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে।

১। ভূমিতে মালিকানার অবসান; ভূমির সমস্ত খাজনা সাধারণের হিতার্থে খাটান।

২। উচ্চমাত্রার ক্রমবর্ধমান কিংবা ক্রমবিভক্ত হারে আয়কর।

৩। সবরকমের উত্তরাধিকার লোপ।

৪। সমস্ত দেশত্যাগী এবং বিদ্রোহীদের সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি।

৫। রাষ্ট্রীয় পুঁজি আর নিরঙ্কুশ একচেটিয়া অধিকারের জাতীয় ব্যাঙ্ক মারফত সমস্ত ক্রেডিট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৬। যোগাযোগ এবং পরিবহনের সমস্ত উপকরণ রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৭। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কল-কারখানা এবং উৎপাদন-সাধিত্রের প্রসার; পতিত জমির আবাদ এবং এক সাধারণ পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত জমির উন্নয়ন।

৮। সকলের পক্ষে সমান শ্রমবাধ্যতা। বিভিন্ন শিল্প-বাহিনী গঠন, বিশেষত কৃষিকার্যের জন্যে।

৯। যন্ত্রশিল্পগুলির সঙ্গে কৃষিকার্যের সংযুক্তি; সারা দেশে জনসমষ্টির আরও বেশি সম-বণ্টন মারফত ক্রমে ক্রমে শহর আর গ্রামের মধ্যে প্রভেদ লোপ করা।

১০। সরকারী বিদ্যালয়ে সকল শিশুর বিনা খরচে শিক্ষা। কারখানায় বর্তমান ধরনের শিশু-শ্রমের অবসান। শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সংযুক্তি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিকাশের ধারায় যখন সমস্ত শ্রেণী-পার্থক্য দূর হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন গোটা জাতির একটা বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারী (পাবলিক) ক্ষমতায় রাজনীতিক চরিত্র আর থাকবে না। যথাভিহিত রাজনীতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর অত্যাচার চালাবার সংগঠিত ক্ষমতা মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে লড়াইয়ের মধ্যে অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, বিপ্লবের সাহায্যে সেটা যদি নিজেকে শাসক শ্রেণীতে পরিণত করে এবং শাসক শ্রেণী হিসেবে উৎপাদনের পুরন পরিবেশকে সেটা যদি জোর করে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে, তাহলে সেই পুরন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেটা শ্রেণীবিরোধ তথা সবরকম শ্রেণীর অস্তিত্বের পরিবেশ দূর করে দেবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসেবে তার স্বীয় আধিপত্যেরও অবসান ঘটাবে।

বিভিন্ন শ্রেণী আর শ্রেণীবিরোধ সংবলিত পুরন বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে একটা সমিতি, যেখানে প্রত্যেকের অবাধ বিকাশ হবে সবার অবাধ বিকাশের শর্ত।

৩

সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সাহিত্য

১। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র

ক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

নিজেদের ঐতিহাসিক অবস্থানের কারণে ফ্রান্স আর ইংলন্ডের অভিজাতদের পক্ষে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লেখা একটা পেশা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের ফরাসী বিপ্লবে এবং ইংলন্ডে সংস্কার আলোড়নে (৫৭) এই অভিজাতেরা আবার ঘৃণ্য ভুঁইফোড়দের বশীভূত হয়। এরপর এদের পক্ষে কোন গুরুতর রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালান অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্ভব রইল একমাত্র মসিযুদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার [restoration]* যুগের পুরন ধ্বনিগুলি অচল হয়ে পড়েছিল। লোকের সহানুভূতি উদ্রেকের জন্যে অভিজাতেরা বাধ্য হল বাহ্যত নিজেদের স্বার্থ ভুলে কেবল শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থেই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ খাড়া করতে। এইভাবে অভিজাতেরা প্রতিশোধ নিতে লাগল তাদের নতুন প্রভুদের নামে টিটকারি দিয়ে, এবং তাদের কানে-কানে আসন্ন প্রলয়ের ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে।

এইভাবে দেখা দেয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্র: অর্ধেক বিলাপ আর অর্ধেক টিটকারি; অর্ধেক অতীতের প্রতিধ্বনি এবং অর্ধেক ভবিষ্য ভীতিপ্রদর্শন; মাঝে মাঝে এদের মর্মভেদী, সব্যঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা বুর্জোয়াদের মর্মে গিয়ে বিঁধত; কিন্তু আধুনিক ইতিহাসের ধারা উপলব্ধি করতে একান্ত অক্ষমতার দরুন ক্রিয়াফলটা সবসময়েই হত হাস্যকর।

জনগণকে দলে টানার জন্যে অভিজাতবর্গ নিশান হিসেবে তুলে ধরত প্রলেতারিয়ানের ভিক্ষার ঝুলিটাকে। লোকেরা কিন্তু যতবারই তাদের দলে

---

* ১৬৬০ থেকে ১৬৮৯ সালের ইংলন্ডের রেস্টোরেশন নয়, ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সালের ফরাসী রেস্টোরেশন। [১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।] (৫৮)

ভিড়েছে ততবারই তাদের পিছনদিকটায় সামন্ততান্ত্রিক দরবারী চাপরাস দেখে হো হো করে অশ্রদ্ধার হাসি হেসে ভেগে গেছে।

এই দৃশ্যটা প্রদর্শন করে ফরাসী লেজিটিমিস্টদের (৫৯) একাংশ এবং 'নবীন ইংলন্ড' (৬০) গোষ্ঠী।

বুর্জোয়া শোষণ থেকে তাদের শোষণের পদ্ধতি অন্য ধরনের, এটা দেখাতে গিয়ে সামন্ততন্ত্রীরা ভুলে যায় তাদের শোষণ চলত সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতিতে আর অবস্থায়, যা আজকের দিনে অচল। তাদের আমলে আজকালকার প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বই ছিল না দেখাতে গিয়ে তারা ভুলে যায় আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের নিজস্ব ধরনের সমাজেরই অবশ্যম্ভাবী সন্তান।

তাছাড়া অন্য সব ব্যাপারে নিজেদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়াশীল রূপটা এরা এতই কম ঢাকে যাতে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের প্রধান অভিযোগটা দাঁড়ায় এই যে, বুর্জোয়া রাজত্বে এমন একটা শ্রেণী গড়ে উঠছে, সমাজের পুরন ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া নির্মূল করাই যার নির্বন্ধ।

বুর্জোয়া শ্রেণীকে তারা ভর্ৎসনা করে প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করার জন্যে ততটা নয়, যতটা কিনা **বিপ্লবী** প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করার জন্যে। সুতরাং রাজনীতির কার্যক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিগ্রহের সকল ব্যবস্থায় এরা যোগ দেয়, আর সাধারণ জীবনযাত্রায় বড় বড় বুলি সত্ত্বেও শিল্পবৃক্ষ থেকে ঝরে-পড়া সোনার ফল কুড়িয়ে নিতে এদের আপত্তি নেই: পশম, বীটচিনি, অথবা আলুর কোহলের ব্যবসার জন্যে সত্য, প্রেম, মর্যাদা বেচতে এদের দ্বিধা হয় না।*

জমিদারের সঙ্গে যাজক যেমন, তেমনি 'সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' সঙ্গে 'যাজকীয় সমাজতন্ত্র' সর্বদাই হাত মিলিয়ে চলেছে।

---

* কথাটা বিশেষ করে জার্মানি সম্বন্ধে খাটে। সেখানে অভিজাত ভূস্বামী আর জাঙ্কাররা (৬১) জমিদারির বড় বড় মহল গোমস্তা রেখে চাষ করায়, তাছাড়া ব্যাপকভাবে বীটচিনি আর আলুর কোহল তৈরি করে। এদের চেয়ে অবস্থাপন্ন ইংরেজ অভিজাতেরা এখনও ঠিক এতটা নামে নি; কিন্তু তারাও কমতি খাজনার ক্ষতিপূরণের জন্যে কমবেশি সন্দেহজনক জয়েন্ট-স্টক কম্পানি পত্তন করার কাজে নিজেদের নাম ধার দিতে জানে। [১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

খ্রীষ্টানী কৃচ্ছ্রসাধনায় সমাজতান্ত্রিক ছোপ দেওয়ার চেয়ে সহজ কিছু নেই। খ্রীষ্টধর্ম ব্যক্তিগত মালিকানা, বিবাহ এবং রাষ্ট্রকে ধিক্কার দেয় নি কি? সেগুলোর বদলে দান আর দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য আর ইন্দ্রিয়দমন, মঠব্যবস্থা আর গির্জার প্রচার করে নি কি তারা? যে পুণ্যোদকে যাজকেরা অভিজাতদের হৃদয়জ্বালাকে পবিত্র করে থাকে তারই নাম 'খ্রীষ্টান সমাজতন্ত্র'।

খ। পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়াদের হাতে সর্বনাশ হয়েছে একমাত্র সামন্ত অভিজাত শ্রেণীরই নয়, সেটাই নয় একমাত্র শ্রেণী আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের আবহাওয়ার যেটার অস্তিত্বের জন্যে আবশ্যক অবস্থা শুকিয়ে গিয়ে মরেছে। আধুনিক বুর্জোয়াদের অগ্রদূত ছিল মধ্যযুগের বার্জিস এবং ছোট ছোট খোদকস্ত চাষী। শিল্পে আর বাণিজ্যে যেসব দেশের বিকাশ অতি সামান্য, সেখানে উঠন্ত বুর্জোয়াদের পাশাপাশি এই দুই শ্রেণী এখনও দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে।

আধুনিক সভ্যতা যেসব দেশে সম্পূর্ণ বিকশিত সেখানে একটা নতুন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়ার মাঝখানে এটা দোলায়িত; বুর্জোয়া সমাজের একটা অনুপূরক অংশ হিসেবে বারবার নতুন হয়ে উঠছে এটা। এই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন লোক কিন্তু প্রতিযোগিতার চাপে ক্রমাগতই প্রলেতারিয়েতের মধ্যে গিয়ে পড়ছে, আর আধুনিক শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরা এমনকি এটাও দেখছে যে, সময় এগিয়ে আসছে যখন আধুনিক সমাজের একটা স্বতন্ত্র অংশ হিসেবে তাদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাবে এবং শিল্প, কৃষি আর বাণিজ্যে এদের স্থান দখল করবে তদারককারী কর্মচারী, গোমস্তা এবং দোকান কর্মচারীরা।

ফ্রান্সের মতো দেশগুলিতে, যেখানে চাষীরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশি, সেখানে যে-লেখকেরা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের পক্ষাবলম্বন করে তারা বুর্জোয়া রাজত্বের সমালোচনায় কৃষক আর পেটি বুর্জোয়াদের মানদণ্ডের প্রয়োগ করবে, এবং এই মধ্যবর্তী শ্রেণীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে, তা স্বাভাবিক।

পেটি-বুর্জোয়া 'সমাজতন্ত্র' দেখা দেয় এইভাবে। এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন সিস্‌মন্দি — শুধু ফ্রান্সে নয়, ইংলন্ডেও।

আধুনিক উৎপাদনের পরিবেশের দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলির অতি প্রখর বিশ্লেষণ করেছে সমাজতন্ত্রের এই সম্প্রদায়টি। অর্থনীতিবিদদের ভণ্ড কৈফিয়তের স্বরূপ ফাঁস করেছে এরা। এরা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করেছে যন্ত্র আর শ্রমবিভাগের মারাত্মক ক্রিয়াফল, অল্প কয়েকজনের হাতে পুঁজি আর জমির কেন্দ্রীভবন, অতি উৎপাদন আর সংকট, এরা নির্দেশ করেছে পেটি বুর্জোয়া আর কৃষকের অনিবার্য সর্বনাশ, প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা, উৎপাদনে অরাজকতা, ধন বণ্টনের তীব্র অসমতা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরকে ধ্বংস করার শিল্প-লড়াই আর সাবেকী নৈতিক বন্ধন, পুরন পারিবারিক সম্বন্ধ এবং পুরন জাতিসত্তার ভাঙন।

ইতিবাচক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু 'সমাজতন্ত্রের' এই রূপটি কামনা করে হয় উৎপাদন আর বিনিময়ের পুরন উপকরণ এবং তার সঙ্গে সাবেকী মালিকানা সম্পর্ক আর পুরন সমাজ ফিরিয়ে আনতে, নয় তো উৎপাদন আর বিনিময়ের আধুনিক উপকরণকে আড়ষ্ট করে আটকে রাখতে পুরন মালিকানা সম্পর্কের কাঠামোর ভিতরে, যা এইসব নতুন উপকরণের চাপে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, তা অনিবার্য ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই সেটা প্রতিক্রিয়াশীল এবং ইউটোপীয়।

এটার শেষ কথা হল: শিল্পোৎপাদনের জন্যে সংঘবদ্ধ গিল্ড প্রতিষ্ঠান, কৃষিক্ষেত্রে গোষ্ঠীতান্ত্রিক সম্পর্ক।

শেষপর্যন্ত ইতিহাসের কঠোর সত্যে আত্মপ্রবঞ্চনার সমস্ত নেশা কেটে গেলে 'সমাজতন্ত্রের' এ রূপটার অবসান হয় একটা শোচনীয় নাকিকান্নায়।

গ। জার্মান, বা 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র

ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল ক্ষমতাধর বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপে, এটা ছিল এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিব্যক্তি, এই সাহিত্য জার্মানিতে আমদানি হয় যখন সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সেখানকার বুর্জোয়ারা সবে লড়াই শুরু করে।

জার্মান দার্শনিকেরা, হবু দার্শনিকেরা, শৌখিন ভাবুকেরা সাগ্রহে এ সাহিত্য নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করল, তাতে তারা শুধু এই কথাটুকু ভুলে

গেল যে, ফ্রান্স থেকে এ ধরনের লেখা জার্মানিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সামাজিক পরিবেশও চলে আসে নি। জার্মানির সামাজিক পরিবেশের সংস্পর্শে এসে এই ফরাসী সাহিত্যের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক তাৎপর্য হারিয়ে গেল, সেটার চেহারা হল নিছক সাহিত্যিক। তাই আঠার শতকের জার্মান দার্শনিকদের কাছে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের দাবিগুলি মনে হল সাধারণভাবে 'ব্যবহারিক বিচারশক্তির' দাবি মাত্র, এবং বিপ্লবী ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর সংকল্প ঘোষণার তাৎপর্য দাঁড়াল বিশুদ্ধ সংকল্পের, যা অবধারিত ছিল সংকল্পের, সাধারণভাবে যথার্থ মানবিক সংকল্পের নিয়ম।

জার্মান বিদ্বানদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল নতুন ফরাসী ধারণাগুলিকে নিজেদের প্রাচীন দার্শনিক চেতনার সঙ্গে খাপ খাওয়ান, নিজেদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ না করে ফরাসী ধারণাগুলিকে আত্মসাৎ করা।

যেভাবে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা হয় সেইভাবেই, অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে এই আত্মসাতের কাজ চলেছিল।

প্রাচীন পেগান জগতের চিরায়ত সাহিত্যের পুঁথিগুলির উপরে সন্ন্যাসীরা কীভাবে ক্যাথলিক সাধুদের নির্বোধ জীবনী লিখে রাখত সেকথা সুবিদিত। ভক্তিহীন ফরাসী সাহিত্যের ব্যাপারে জার্মান বিদ্বানরা এ পদ্ধতিটিকে উল্টে দেয়। মূল ফরাসীর নিচে তারা লিখল তাদের দার্শনিক ছাইপাঁশ। উদাহরণস্বরূপ, মুদ্রার অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ফরাসী সমালোচনার নিচে তারা লিখল 'মানবতার পরকতা', বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ফরাসী সমালোচনার নিচে লিখে রাখল 'নির্বিশেষ এই ধারণামৌলের সিংহাসনচ্যুতি', ইত্যাদি।

ফরাসী ঐতিহাসিক সমালোচনাগুলির পিছনে এইসব দার্শনিক বুলি জুড়ে দিয়ে তার নাম তারা দেয় 'কর্মযোগের দর্শন', 'খাঁটি সমাজতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্রের জার্মান বিজ্ঞান', 'সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি', ইত্যাদি।

ফরাসী সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সাহিত্যকে এইভাবে পুরোপুরি নির্বীর্য করে ফেলা হয়। জার্মানদের হাতে যখন এ সাহিত্য এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর সংগ্রামের অভিব্যক্তি হয়ে আর রইল না, তখন তাদের ধারণা হল 'ফরাসী একদেশদর্শিতা' অতিক্রম করা গেছে; সত্যকার প্রয়োজন নয়, প্রকাশ করা গেছে সত্যের প্রয়োজনকে; প্রকাশ করা গেছে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ নয়, মানব প্রকৃতির স্বার্থ, সাধারণভাবে যে মানুষের শ্রেণী নেই, বাস্তবতা

নেই, যার অস্তিত্ব কেবল দার্শনিক জল্পনার কুয়াশাবৃত রাজ্যে তার স্বার্থ।

এই যে জার্মান সমাজতন্ত্র সেটার স্কুলছাত্রসুলভ কাজটাকেই অমন গুরুগম্ভীর ভারিক্কী চালে গ্রহণ করে সামান্য পসরাটা নিয়ে ক্যানভাসারের মতো গলাবাজি শুরু করেছিল, সেটার পান্ডিতি সারল্যটা কিন্তু ইতোমধ্যে ক্রমে ক্রমে ঘুচে গেল।

সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতকুল আর নিরংকুশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জার্মান, বিশেষ করে প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর লড়াইটা, অর্থাৎ উদারনীতিক আন্দোলন তখন স্থিরসংকল্প হয়ে ওঠে।

তাতে করে রাজনীতিক আন্দোলনের সামনে সমাজতন্ত্রের দাবিগুলি তুলে ধরবার বহুবাঞ্ছিত সুযোগ 'খাঁটি' সমাজতন্ত্রের কাছে হাজির হয়; হাজির হয় উদারনীতি, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা, সংবাদপত্রের বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া বিধান, বুর্জোয়া মুক্তি ও সাম্যের বিরুদ্ধে চিরাচরিত অভিশাপ হানবার সুযোগ, জনগণের কাছে এই কথা প্রচারের সুযোগ যে এই বুর্জোয়া আন্দোলন থেকে তাদের লাভের কিছু নেই, সবকিছু হারাবারই সম্ভাবনা। ঠিক সময়টিতেই জার্মান সমাজতন্ত্র ভুলে গেল সেটা যে-ফরাসী সমালোচনার মূঢ় প্রতিধ্বনি মাত্র তাতে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্ব আগেই ধরে নেওয়া হয়েছিল, আর তার সঙ্গে ছিল অস্তিত্বের তদনুযায়ী আর্থনীতিক অবস্থা এবং তদুপযোগী রাজনীতিক সংবিধান, ঠিক যেগুলি হাসিল করাই ছিল জার্মানিতে আসন্ন সংগ্রামের লক্ষ্য।

যাজক, পান্ডিত, খুদে গ্রাম্য জমিদার, আমলা, ইত্যাদি অনুচর সহ স্বৈর সরকারগুলির পক্ষে সেটা আক্রমণোদ্যত বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভয় দেখাবার চমৎকার জুজু হিসেবে কাজে লাগল।

ঠিক একই সময়ে এই সরকারগুলি জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহগুলিকে চাবুক আর গুলির যে তিক্ত ওষুধ গেলাচ্ছিল তার মধুরেণ সমাপয়েৎ হল এতে।

এই 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র এইভাবে যেমন সরকারগুলির কাজে লাগছিল জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ার হাতিয়ার হিসেবে, তার সঙ্গে সেটা ছিল একটা প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের, জার্মানির কূপমন্ডূকদের স্বার্থের

প্রতিনিধি। জার্মানিতে প্রচলিত অবস্থার প্রকৃত সামাজিক ভিত্তি হল পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী, ষোল শতকের এই ভগ্নাবশেষটি, যেটা তখন থেকে নানা মূর্তিতে বারবার আবির্ভূত হয়েছে।

এ শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ হল জার্মানির বর্তমান অবস্থাটাকেই জিইয়ে রাখা। বুর্জোয়া শ্রেণীর শিল্পগত আর রাজনীতিক আধিপত্য এ শ্রেণীর নির্ঘাত ধ্বংসের বিপদ সৃষ্টি করে — একদিকে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে, অপরদিকে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অভ্যুদয়ে। মনে হল, যেন এই দুই পাখিকে এক ঢিলেই মারতে পারবে 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র। মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ল সেটা।

জল্পনাকল্পনার মাকড়সার জালের পোশাক, তার উপর বাক্যালঙ্কারের নক্সী ফুল, অসুস্থ ভাবালুতার রসে সিক্ত এই যে লোকোত্তর আচ্ছাদনে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা তাদের অস্থিচর্মসার শোচনীয় 'চিরন্তন সত্যগুলিকে' সাজিয়ে দিল, তাতে এই ধরনের লোকসমাজে তাদের মালের অসম্ভব কাটতি বাড়ে।

কূপমণ্ডূক পেটি বুর্জোয়ার বাগাড়ম্বরী প্রতিনিধিত্বটাই তার পেশা, তা জার্মান সমাজতন্ত্র নিজের দিক থেকে ক্রমেই বেশি করে উপলব্ধি করতে থাকে।

সেটা ঘোষণা করল যে, জার্মান জাতি হল আদর্শ জাতি, খুদে জার্মান কূপমণ্ডূক হল আদর্শ মানুষ। এরা এই আদর্শ মানুষের প্রতিটি শয়তানী নীচতার এক-একটা গূঢ় মহত্তর সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিল, যা সেটার আসল প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। এমনকি কমিউনিজমের 'পাশবিক ধ্বংসাত্মক' ঝোঁকের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা এবং সব ধরনের শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে পরম আর নিরপেক্ষ অবজ্ঞা ঘোষণা করতেও সেটার দ্বিধা হল না। আজকের দিনে (১৮৪৭) যত তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট রচনা জার্মানিতে প্রচলিত, যৎসামান্য কয়েকটিকে বাদ দিলে তার সমস্তটাই এই কলুষিত ক্লান্তিকর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।*

* ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক ঝড় এই সমগ্র নোংরা ঝোঁকটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে এর প্রবক্তাদের সমাজতন্ত্র নিয়ে আরও কিছু জল্পনার বাসনা ঘুচিয়ে দেয়। এই ঝোঁকের প্রধান প্রতিভূ এবং ক্লাসিকাল প্রতিচ্ছবি হলেন কার্ল গ্রুন মহাশয়। [১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

২। রক্ষণশীল, বা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটা অপ্রতিহত রাখার উদ্দেশ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ সামাজিক অভাব-অভিযোগের প্রতিকার চায়।

এই অংশের মধ্যে পড়ে অর্থনীতিবিদেরা, লোকহিতব্রতীরা, মানবতাবাদীরা, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নকারীরা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান সংগঠকেরা, পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির সদস্যরা, মাদকতা নিবারণের গোঁড়া প্রচারকেরা, সম্ভবপর সবরকম খুচরো সংস্কারকরা। এই ধরনের সমাজতন্ত্র বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ মতধারা হিসেবেও রচিত হয়েছে।

এই ধরনের নিদর্শন হিসেবে আমরা প্রুধোঁ-র 'দারিদ্র্যের দর্শন'-এর উল্লেখ করতে পারি।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের বুর্জোয়ারা আধুনিক সামাজিক অবস্থার সুবিধাটা পুরোপুরি চায়, চায় না তৎপ্রসূত অবশ্যম্ভাবী সংগ্রাম আর বিপদ। তারা সমাজের বিদ্যমান অবস্থাটা চায়, কিন্তু সেটার বৈপ্লবিক এবং ধ্বংসকর উপাদানসমূহ বাদ দিয়ে। তারা চায় প্রলেতারিয়েত ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী। যে দুনিয়ায় বুর্জোয়ারা সর্বেসর্বা, স্বভাবতই সেই দুনিয়াই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রীতিকর ধারণাটাকে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র ন্যূনাধিক পূর্ণাঙ্গ নানাবিধ মতধারা হিসেবে দাঁড় করায়। এরূপ মতধারা কাজে পরিণত ক'রে প্রলেতারিয়েত সোজা সামাজিক নব জেরুজালেমে চলে যাক, এই দাবি ক'রে এরা আসলে এটাই চায় যে, প্রলেতারিয়েত বিদ্যমান সমাজের চৌহদ্দির ভিতরেই থাকুক, কিন্তু বুর্জোয়া সম্বন্ধে সমস্ত বিদ্বেষভাব বর্জন করুক।

এই 'সমাজতন্ত্রের' আর একটা অপেক্ষাকৃত ব্যবহারিক কিন্তু কম সুসংবদ্ধ রূপ আছে। তাতে প্রতিটি বৈপ্লবিক আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এই বলে যে, কোন নিছক রাজনীতিক সংস্কারে নয়, জীবনযাত্রার বৈষয়িক অবস্থার, আর্থনীতিক সম্পর্কের পরিবর্তনেই তাদের সুবিধা হতে পারে। জীবনযাত্রার বৈষয়িক অবস্থার পরিবর্তন বলতে অবশ্য এই ধরনের 'সমাজতন্ত্র' কোনক্রমেই বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কের উচ্ছেদ বোঝে না, যে উচ্ছেদ কেবল বিপ্লব দিয়েই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব; সেটা বোঝে বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে শুধু প্রশাসনিক সংস্কার,

অর্থাৎ এহেন সংস্কার যা পর্‌ঁজি আর শ্রমের মধ্যে সম্পর্কটাকে কোন দিক থেকেই আঘাত করে না, শ্‌ধ্‌ বড়জোর ব্‌র্জোয়া সরকারের প্রশাসনের খরচ কমায় এবং সেটাকে সরল করে তোলে।

ব্‌র্জোয়া 'সমাজতন্ত্রের' উপয্‌ক্ত অভিব্যক্তি হয় শ্‌ধ্‌ তখন, যখন সেটা হয়ে ওঠে বাক্যালঙ্কার মাত্র।

অবাধ বাণিজ্য: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্যে। সংরক্ষণ শ্‌ল্ক: শ্রমিক শ্রেণীরই উপকারের জন্যে। কারাগারের সংস্কার: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্যে। ব্‌র্জোয়া 'সমাজতন্ত্রের' এই হল শেষ কথা এবং গ্‌র্‌ত্ব দিয়ে বলা একমাত্র কথা।

সংক্ষেপে সেটা এই: ব্‌র্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্যেই ব্‌র্জোয়া।

৩। সমালোচনী-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম

প্রতিটি বড় বড় আধ্‌নিক বিপ্লবে যে সাহিত্য সবসময়ে প্রলেতারিয়েতের দাবিকে ভাষা দিয়েছে, যেমন বাবেফ এবং অন্যান্যের রচনা, আমরা এখানে তার উল্লেখ করছি না।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ যখন উচ্ছেদ হচ্ছিল তখনকার সার্বজনীন উত্তেজনার কালে নিজেদের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে প্রলেতারিয়েতের প্রথম সাক্ষাৎ প্রচেষ্টাগ্‌লি অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হয়, কারণ প্রলেতারিয়েত তখন পর্যন্ত অপরিণত ছিল, তার ম্‌ক্তির অন্‌কূল আর্থনীতিক অবস্থাও তখন ছিল না, তেমন অবস্থা গড়ে উঠতে তখনও বাকি, কেবল আসন্ন ব্‌র্জোয়া য্‌গেই তা গড়ে-ওঠা সম্ভব ছিল। প্রলেতারিয়েতের এই প্রথম অভিযানসম্‌হের সঙ্গী ছিল যে বৈপ্লবিক সাহিত্য সেটার একটা প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র থাকা ছিল অনিবার্য। সে সাহিত্য প্রচার করত সর্বব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধন, অতি স্থ্‌ল ধরনের সামাজিক সমতা।

প্রকৃতপক্ষে যাকে সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট তন্ত্র বলা চলে, অর্থাৎ সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন, ইত্যাদির তন্ত্র, তা পয়দা হল প্রলেতারিয়েত

এবং বুর্জোয়াদের সংগ্রামের উপরে বর্ণিত গোড়ার দিকের অপরিণত যুগে (প্রথম অধ্যায় 'বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়ানরা' দ্রষ্টব্য)।

এইসব তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা বিদ্যমান রূপের সমাজে লক্ষ্য করেন শ্রেণীবিরোধ এবং ধ্বংসকর উপাদানগুলির ক্রিয়াটাও। কিন্তু প্রলেতারিয়েত তখনও তার শৈশবে; দেখে তাদের মনে হল সে শ্রেণীর নিজস্ব ঐতিহাসিক উদ্যম এবং কোন স্বতন্ত্র রাজনীতিক আন্দোলন নেই।

যেহেতু শ্রেণীবিরোধ বাড়ে শিল্প প্রসারের সঙ্গে সমান তালে, তাই সেদিনের আর্থনীতিক অবস্থা, তাঁরা যেমনটা দেখেন তাতে সেটা তখনও তাঁদের সামনে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির বৈষয়িক পরিবেশ তুলে ধরে নি। সুতরাং তাঁরা খুঁজতে লাগলেন সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার মতো নতুন সমাজবিজ্ঞান, নতুন সামাজিক নিয়মাবলি।

তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্ভাবন-ক্রিয়াকে আনতে হল ঐতিহাসিক ক্রিয়ার স্থানে, মুক্তির ইতিহাসক্রমে সৃষ্ট পরিবেশের বদলে কল্পিত পরিবেশ, প্রলেতারিয়েতের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রেণী-সংগঠনের বদলে এই উদ্ভাবকদের নিজেদের বানানো এক সমাজ-সংগঠন। তাঁদের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁদেরই সামাজিক পরিকল্পনার প্রচারে এবং বাস্তব রূপায়ণে পর্যবসিত হল।

পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময়ে সর্বাধিক নিগৃহীত শ্রেণী হিসেবে প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার চেতনা তাঁদের ছিল। তাঁদের কাছে প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বই ছিল কেবল সর্বাধিক নিগৃহীত শ্রেণী হিসেবে।

শ্রেণী-সংগ্রামের অপরিণত অবস্থা এবং তাঁদের স্বকীয় পরিপার্শ্বের দরুন এই ধরনের সমাজতন্ত্রীরা মনে করতেন তাঁরা সকল শ্রেণীবিরোধের বহু ঊর্ধ্বে। তাঁরা চেয়েছিলেন সমাজের প্রত্যেক সদস্যের, এমনকি সবচেয়ে সুবিধাভোগীরও অবস্থার উন্নতি করতে। সেইজন্যে শ্রেণীনির্বিশেষে সাধারণত গোটা সমাজের কাছে আবেদন জানান, এমনকি তুলনায় শাসক শ্রেণীর কাছেই আবেদন-নিবেদন জানান ছিল এঁদের বেশি পছন্দ। কেননা এঁদের তন্ত্রটা একবার বুঝতে পারলে লোকে কেমন করে না দেখে পারবে যে, এইটেই সমাজের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবস্থার জন্যে সম্ভাব্য সর্বোত্তম পরিকল্পনা?

সেইজন্যে সকল রাজনীতিক, বিশেষত সকল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে এঁরা বর্জন করলেন; এঁদের অভিলাষ হল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের

উদ্দেশ্যসাধন, চেষ্টা হল দৃষ্টান্তের জোরে, এবং যার ভাগ্যে ব্যর্থতাই অনিবার্য এমন ছোটখাট পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন সামাজিক গস্‌পেলের পথ কাটতে।

ভবিষ্যৎ সমাজের এ ধরনের উদ্ভট ছবি আঁকা হয় এমন সময়ে যখন প্রলেতারিয়েত অতি অপরিণত অবস্থার মধ্যে ছিল, নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল উদ্ভট; সমাজের ব্যাপক পুনর্গঠন সম্বন্ধে এই শ্রেণীর প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এ ধরনের ছবির মিল দেখা যায়।

কিন্তু এইসব সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট লেখার মধ্যে একটা সমালোচনামূলক দিকও আছে। বিদ্যমান সমাজের প্রত্যেকটি নীতিকে তাতে আক্রমণ করা হল। তাই শ্রমিক শ্রেণীর জ্ঞানলাভের পক্ষে অতি অমূল্য অনেক তথ্যে তা পরিপূর্ণ। শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রভেদ, পরিবার প্রথা, ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্যে শিল্প পরিচালনা এবং মজুরি ব্যবস্থার উচ্ছেদ, সামাজিক সুষমতা ঘোষণা, রাষ্ট্রের কাজকে কেবল উৎপাদনের তদারকে পর্যবসিত করা, ইত্যাদি যেসব ব্যবহারিক প্রস্তাব এইসব লেখার মধ্যে আছে সেগুলি সবই কেবল শ্রেণীবিরোধের অন্তর্ধানের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যে-বিরোধ সেদিন সবেমাত্র মাথা তুলছিল, আর এইসব লেখার মধ্যে ধরা পড়েছিল শুধু আদি অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট রূপে। প্রস্তাবগুলির প্রকৃতি তাই নিতান্তই ইউটোপীয়।

সমালোচনী-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজমের যা তাৎপর্য সেটার একটা বিপরীতমুখী সম্বন্ধ আছে ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে। আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রাম যতই বিকশিত হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে, সেই পরিমাণে এই উদ্ভট সংগ্রাম-পরিহারের, শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে এইসব উদ্ভট আক্রমণের সকল ব্যবহারিক মূল্য এবং সমস্ত তাত্ত্বিক যুক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্যই এই সমস্ত তন্ত্রের প্রবর্তকেরা অনেক দিক দিয়ে বিপ্লবী হলেও তাঁদের শিষ্যরা প্রতিক্ষেত্রে নিছক প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতেই পরিণত হয়েছে। প্রলেতারিয়েতের প্রগতিশীল ঐতিহাসিক বিকাশের বিপরীতে তারা নিজ নিজ গুরুর আদি মতগুলিকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাই তাদের অবিচল চেষ্টা যাতে শ্রেণী-সংগ্রাম নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যাতে শ্রেণীবিরোধ আপসে মিটে যায়। তারা এখনও তাদের সামাজিক ইউটোপিয়ার পরীক্ষামূলক

রূপায়ণের স্বপ্ন দেখে; বিচ্ছিন্ন 'ফালেনস্টেরি' প্রতিষ্ঠা, 'হোম কলোনি' স্থাপন, 'ছোট ইকেরিয়া'* প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখে — নব জেরুজালেমের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে — আর এইসব আকাশকুসুম বাস্তব করার জন্যে আবেদন জানাতে বাধ্য হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সহানুভূতি আর টাকার থলির কাছে। আগে যে প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীল সমাজতন্ত্রীদের বর্ণনা করা হয়েছে তাদের স্তরে এরা ধীরে ধীরে নেমে যায়, তফাৎ শুধু তাদের আরও প্রণালীবদ্ধ পাণ্ডিত্যে, এবং তাদের সমাজবিদ্যার অলৌকিক মাহাত্ম্যে অন্ধ আর সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে।

শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত রাজনীতিক কর্ম-প্রচেষ্টায় এরা তাই তীব্র বিরোধিতা করে: এদের মতে সে কর্ম-প্রচেষ্টা কেবল নব গসপেলে অন্ধ অবিশ্বাসের ফল।

ইংলন্ডে ওয়েনপন্থীরা এবং ফ্রান্সে ফুরিয়েভক্তরা যথাক্রমে চার্টিস্ট এবং Réformiste-দের (সংস্কারবাদীদের) বিরোধী (৬২)।

৪

বিভিন্ন প্রতিপক্ষ পার্টি প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের অবস্থান

শ্রমিক শ্রেণীর যেসব পার্টি এখন বিদ্যমান, যেমন ইংলন্ডে চার্টিস্টরা এবং আমেরিকায় ভূমিসংস্কারবাদীরা, তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

---

* 'ফালেনস্টেরি' (phalanstère) হল শার্ল ফুরিয়ের পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উপনিবেশ; কাবে তাঁর ইউটোপিয়া এবং পরে আমেরিকাস্থিত কমিউনিস্ট উপনিবেশকে ইকেরিয়া নাম দেন। [১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

ওয়েন তাঁর আদর্শ কমিউনিস্ট সম্প্রদায়গুলিকে 'হোম কলোনি' বলতেন; ফুরিয়ের পরিকল্পিত সর্বভোগ্য প্রাসাদের নাম ছিল 'ফালেনস্টেরি'। যে ইউটোপীয় কল্পরাজ্যের কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান কাবে বর্ণনা করেছিলেন, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইকেরিয়া'। [১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

শ্রমিক শ্রেণীর আশু লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে, উপস্থিত স্বার্থ হাসিল করার জন্যে কমিউনিস্টরা লড়াই করে থাকে, কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যে তারা সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, সেটার রক্ষক। ফ্রান্সে রক্ষণশীল এবং র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাটদের* সঙ্গে হাত মেলায়, কিন্তু 'মহান বিপ্লব' থেকে যেসব বুলি আর বিভ্রান্তি চলে আসছে সেগুলো সম্বন্ধে সমালোচনার অধিকারটুকু বজায় রেখে।

সুইজারল্যান্ডে কমিউনিস্টরা সমর্থন করে র‍্যাডিকালদের, কিন্তু এ সত্য ভোলে না যে, এই দলটি পরস্পরবিরোধী উপাদানে গঠিত, এদের খানিকটা ফরাসী অর্থে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী, আর খানিকটা হল র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া।

পোল্যান্ডে তারা সেই দলটিকে সমর্থন করে যেটা জাতীয় মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ভূমিবিষয়ক বিপ্লবের ওপর জোর দেয়, যে-দলটি ১৮৪৬ সালের ক্রাকোভ অভ্যুত্থান জাগিয়ে তুলেছিল (৬৪)।

জার্মানিতে বুর্জোয়ারা যখনই বৈপ্লবিক অভিযান করে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত-জমিদারতন্ত্র এবং পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তখন কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে।

কিন্তু বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈর-বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট উপলব্ধি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যেও বিরত হয় না; সেটা এইজন্যে যাতে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যেসব সামাজিক আর রাজনীতিক অবস্থা চালু করতে বাধ্য সেগুলোকে জার্মান শ্রমিকেরা সোজাসুজি বুর্জোয়াদের

---

* এই পার্টির প্রতিনিধিত্ব করতেন পার্লামেন্টে লেদ্রু-রলাঁ, সাহিত্য ক্ষেত্রে লুই ব্লাঁ, দৈনিক সংবাদপত্র জগতে 'Réforme' (৬৩)। সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাসি নামের উদ্ভাবকদের কাছে নামটির অর্থ ছিল গণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক দলের একাংশ, যাতে সমাজতন্ত্রের কমবেশি রং লেগেছিল। [১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

এই সময়ে ফ্রান্সে যে পার্টি নিজেকে সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাটিক বলত, সেটার প্রতিনিধি রাজনীতিক জীবনে ছিলেন লেদ্রু-রলাঁ, আর সাহিত্য জগতে লুই ব্লাঁ; সুতরাং আজকের দিনের জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সঙ্গে এর ছিল দুস্তর পার্থক্য। [১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে; সেটা এইজন্যেই যাতে জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির পতনের পরে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।

কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানির দিকে মন দিচ্ছে, তার কারণ সেদেশে বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন, যে-বিপ্লব ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর অগ্রসর পরিস্থিতির মধ্যে ঘটবে সেটা অবধারিত, আর সে-বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত থাকবে সতর শতকের ইংলন্ড এবং আঠার শতকের ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনায় ঢের বেশি পরিণত অবস্থায়, আর সেটা এই কারণে যে, জার্মানির বুর্জোয়ারা বিপ্লব হবে অব্যবহিত পরবর্তী সংঘটিত প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভূমিকামাত্র।

সংক্ষেপে, কমিউনিস্টরা সর্বত্রই বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনীতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বৈপ্লবিক আন্দোলন সমর্থন করে।

এই সমস্ত আন্দোলনেই তারা প্রত্যেকটির প্রধান প্রশ্ন হিসেবে সামনে এনে ধরে মালিকানার প্রশ্ন, মালিকানার বিকাশের মাত্রা তখন যা-ই থাক না কেন।

শেষ কথা, সকল দেশের গণতন্ত্রী পার্টিগুলির মধ্যে সম্মিলন আর বোঝাপড়ার জন্যে তারা সর্বত্র কাজ করে।

নিজেদের মতামত আর লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক পরিবেশের বলপূর্বক উচ্ছেদ দিয়ে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়ানদের হারাবার কিছুই নেই। তাদের জয় করবার জন্যে আছে সারা জগৎ।

দুনিয়ার মেহনতী জনগণ এক হও!

১৮৪৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখা

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লন্ডনে প্রথম প্রকাশিত জার্মান ভাষায়

১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণ অনুসারে প্রকাশিত

কার্ল মার্কস

বুর্জোয়া শ্রেণী এবং প্রতিবিপ্লব

দ্বিতীয় প্রবন্ধ (৬৫)

কলোন, ১১ ডিসেম্বর

মহাপ্লাবনের ক্ষুদ্র সংস্করণ মার্চের মহাপ্লাবন (৬৬) প্রশমিত হবার পর ভূপৃষ্ঠের বার্লিন ভাগে কোন দৈত্য, কোন বৈপ্লবিক অতিকায় জীব পড়ে রইল না, পড়ে রইল শুধু পুরন ধরনের জীবেরা, বামনাকার বুর্জোয়ারা — 'মিলিত প্রাদেশিক সভা'র (৬৭) (United Landtag) উদারপন্থীরা, সচেতন প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিরা। যেসব প্রদেশে বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বাপেক্ষা পরিণত, সেই **রাইনপ্রদেশ** আর **সাইলেশিয়া-ই** নতুন মন্ত্রিসভাগুলির প্রধান অংশটা সরবরাহ করে। তাদের পিছু পিছু আসে রাইন অঞ্চলের আইনবিদদের গোটা একটি দল। যে পরিমাণে সামন্তপ্রভুরা বুর্জোয়াদের পিছনের দিকে হটিয়ে দিতে থাকে, সেই পরিমাণেই রাইনপ্রদেশ এবং সাইলেশিয়া খাস প্রুশীয় প্রদেশগুলির জন্যে মন্ত্রিসভায় স্থান ছেড়ে দেয়। কেবল এলবারফেল্‌ডের একজন টোরিই (৬৮) এখনও পর্যন্ত রাইনপ্রদেশের সঙ্গে ব্র্যান্ডেনবুর্গ মন্ত্রিসভার সংযোগ রেখেছে। **হান্‌জেমান** এবং **ফন্ ডের হেইট**! প্রুশীয় বুর্জোয়াদের কাছে ১৮৪৮-এর মার্চ এবং ডিসেম্বরের মধ্যে সমগ্র পার্থক্যের দ্যোতক এই দুটি নাম!

প্রুশীয় বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল কিন্তু **বিপ্লবের** মাধ্যমে, **ক্রাউনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ দর কষাকষির** যে পথ তারা চেয়েছিল সে পথে নয়। নিজেদের স্বার্থ নয়, তাদের **জনগণের স্বার্থ** রক্ষা করার কথা ক্রাউনের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ **নিজেদেরই** বিরুদ্ধে, কারণ বুর্জোয়াদের পথ তৈরি করে দিয়েছিল একটি **গণ-আন্দোলন**। ক্রাউন অবশ্য এদের চোখে ছিল ঈশ্বরের কৃপায় একখানি যবনিকামাত্র যার অন্তরালে এদের নিজস্ব ঐহিক

স্বার্থ ঢাকা রাখার কথা। **এদের** নিজেদের স্বার্থের এবং সেই স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাজনীতিক রূপগুলির অলঙ্ঘনীয়তাকে সংবিধানের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়: **ক্রাউনের অলঙ্ঘনীয়তা**। জার্মান বুর্জোয়াদের, বিশেষত প্রুশীয় বুর্জোয়াদের **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের** প্রতি এত সোল্লাস আসক্তি এইজন্যেই। তাই প্রুশীয় বুর্জোয়াদের হাতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তুলে দেবার জন্যে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং তার জার্মান প্রতিধ্বনিগুলোকে প্রুশীয় বুর্জোয়ারা স্বাগত করলেও সেই বিপ্লব তাদের সমস্ত হিসাব ভণ্ডুল করে দেয়, কারণ তাদের শাসনকে এমন সব শর্তের দ্বারা তা কণ্টকিত করল যা তারা পূরণ করতে ছিল অনিচ্ছুক এবং অক্ষম।

বুর্জোয়ারা একটি হাতও তোলে নি। তারা জনগণকে তাদের হয়ে লড়াইটা চালাতে দিয়েছিল। কাজেকাজেই, তাদের হাতে যে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে এল তা কোন সেনাপতি কর্তৃক প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে অর্জন করা শাসনক্ষমতা নয়; এটা হল বিজয়ী জনগণের নিজেদের স্বার্থরক্ষার একটা জন-নিরাপত্তা কমিটির হাতে ন্যস্ত শাসনক্ষমতা।

কাম্পহাউজেন তবু এই পরিস্থিতির জন্যে পরম অস্বস্তিবোধ করতেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সমস্ত দুর্বলতার মূলে ছিল এই অস্বস্তিবোধ এবং যেখান থেকে এর উদ্ভব সেই পরিস্থিতি। তাঁর সরকারের সর্বাধিক নির্লজ্জ কাজগুলি যেন একটু লজ্জায় আরক্ত। আর নগ্ন **নির্লজ্জতা** এবং **ধৃষ্টতা** হল **হানজেমানের** বৈশিষ্ট্য। এই দুই চিত্রকরের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই রক্তিম আভাটুকু।

ইংরেজদের ১৬৪৮-এর বিপ্লব অথবা **ফরাসীদের** ১৭৮৯-এর বিপ্লবের সঙ্গে **প্রুশীয় মার্চ বিপ্লবকে** কিছুতেই গুলিয়ে ফেলা চলে না।

১৬৪৮-এ বুর্জোয়ারা আধুনিক অভিজাতদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ ছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামন্ত-অভিজাতদের বিরুদ্ধে এবং সরকারী-স্বীকৃত চার্চের বিরুদ্ধে।

১৭৮৯-এ বুর্জোয়ারা জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ ছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে এবং সরকারী-স্বীকৃত চার্চের বিরুদ্ধে।

১৭৮৯-এর বিপ্লবের প্রতিরূপ ছিল (অন্তত ইউরোপে) একমাত্র ১৬৪৮-এর বিপ্লব, আর ১৬৪৮-এর বিপ্লবের প্রতিরূপ ছিল শুধু স্পেনের

বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডবাসীদের অভ্যুত্থান (৬৯)। শুধু সময়ের হিসাবেই নয়, বিষয়বস্তুতেও উভয় বিপ্লবই তাদের প্রতিরূপ থেকে ছিল শতবর্ষ এগিয়ে।

দুটি বিপ্লবেই বুর্জোয়ারা **সত্যই** ছিল আন্দোলনের আগুয়ান শ্রেণী। **প্রলেতারিয়েত** এবং **বার্গারদের যে অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না,** তাদের হয় তখন পর্যন্ত বুর্জোয়াদের স্বার্থ থেকে পৃথক কোন স্বার্থ ছিল না, আর না হয় তখন পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে তারা কোন শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশ হয়ে গড়ে ওঠে নি। সুতরাং যেখানে তারা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, যেমন ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে, সেখানেও তারা বুর্জোয়াদের **ধরনে** না হলেও বুর্জোয়াদের স্বার্থ সাধনের জন্যেই লড়াই করেছিল। **সমগ্র ফরাসী সন্ত্রাসনীতিটা বুর্জোয়াদের শত্রুদের** সঙ্গে — স্বৈরতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, এবং কূপমন্ডূকতার সঙ্গে ফয়সালা করার **প্লিবিয়ান পদ্ধতি,** আর কিছু নয়।

১৬৪৮ এবং ১৭৮৯-এর বিপ্লব **ইংরেজদের** এবং **ফরাসীদের** বিপ্লব নয়। এই দুটি হল **ইউরোপীয়** ছকে বিপ্লব। **পুরন রাষ্ট্রব্যবস্থার** বিরুদ্ধে সমাজের কোন **নির্দিষ্ট** শ্রেণীর জয় নয় — এই বিপ্লব-দুটি হল **নতুন ইউরোপীয় সমাজের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঘোষণা**। এই বিপ্লব-দুটিতে বুর্জোয়ারা বিজয়ী হয়েছিল, কিন্তু তখন **বুর্জোয়াদের বিজয়** ছিল একটি **নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়,** সামন্ত মালিকানার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া মালিকানার বিজয়; প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে জাতিসত্তার, গিল্ড-এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার, সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে সম্পত্তি-বিভাগের, মালিকের উপর জমির আধিপত্যের বিরুদ্ধে জমির মালিকের, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জ্ঞানালোকের, পারিবারিক উপাধির বিরুদ্ধে পরিবারের, বীরোচিত আলস্যের বিরুদ্ধে শ্রমশীলতার, এবং মধ্যযুগীয় বিশেষ সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে আধুনিক নাগরিক আইনের বিজয়। ১৬৪৮-এর বিপ্লব ছিল ষোল শতাব্দীর বিরুদ্ধে সতর শতাব্দীর বিজয়, আর ১৭৮৯-এর বিপ্লব ছিল সতর শতাব্দীর বিরুদ্ধে আঠার শতাব্দীর বিজয়। এই বিপ্লব পৃথিবীর যে-অঞ্চলে ঘটেছিল সেই ইংলন্ড আর ফ্রান্সের প্রয়োজন প্রকাশ করার চেয়ে বেশি প্রকাশ করেছিল সেদিনের দুনিয়ার প্রয়োজনকে।

প্রাশিয়ার মার্চ বিপ্লবের মধ্যে এই ধরনের কিছুই ছিল না।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব বাস্তবক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এবং মানসক্ষেত্রে বুর্জোয়া শাসনের **বিলোপ সাধন করেছিল।** প্রাশিয়ায় মার্চ বিপ্লব হল মানসক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এবং বাস্তবক্ষেত্রে বুর্জোয়া শাসনের **প্রতিষ্ঠার** জন্যে। **ইউরোপীয় বিপ্লব** হওয়া দূরে থাকুক, এটা ছিল শুধু একটি পশ্চাৎপদ দেশে ইউরোপীয় বিপ্লবের ব্যাহত-বিকাশের পরিণাম ফল মাত্র। নিজ যুগকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার পরিবর্তে এটা হেঁচড়ে চলেছিল যুগের অর্ধশতকের বেশি পিছনে। গোড়া থেকেই এটা ছিল **গৌণ;** কিন্তু একথা সুবিদিত যে, মুখ্য রোগের চেয়ে গৌণ রোগগুলি নিরাময় করা বেশি কঠিন এবং সেই সঙ্গে সেগুলো দেহের ক্ষয় ঘটায় মুখ্য রোগের চেয়ে বেশি পরিমাণে। প্রশ্নটা এখানে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার নয়, এটা হল প্যারিসে যা লোপ পেয়েছিল বার্লিনে সেই সমাজের পুনর্জন্মের প্রশ্ন। প্রাশিয়ায় মার্চ বিপ্লব এমনকি **জাতীয়, জার্মানও** নয়; শুরু থেকেই এটা ছিল **প্রুশীয়-প্রাদেশিক।** ভিয়েনা, কাসেল, মিউনিক এবং অপরাপর নানা ধরনের প্রাদেশিক অভ্যুত্থান এটার পাশাপাশি চলেছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এটার নেতৃত্বের।

১৬৪৮ এবং ১৭৮৯-এর মধ্যে ছিল উচ্চতম সৃষ্টির অপার গর্ববোধ; একটি কালাসংগতি হওয়াই ছিল ১৮৪৮ সালের বার্লিনের উচ্চাশা। তার আলো ছিল সেইসব তারার আলোর মতো, যেগুলির আলো পৃথিবীবাসী আমাদের কাছে পৌঁছয় কেবল বিকীরণকারী জ্যোতিষ্কের বিলুপ্তির শত-সহস্র বর্ষ পরে। প্রাশিয়ার মার্চ বিপ্লব যেমন সমস্ত ব্যাপারেই ক্ষুদ্র তেমনি এই ব্যাপরেও ছিল ইউরোপের কাছে ঠিক এই ধরনের একটা খুদে তারা। এর আলো হল এমন একটি সমাজের মৃতদেহের আলো যা দীর্ঘকাল আগে পচে গলে গেছে।

এত এলোমেলো অবস্থা, ভীরুতা এবং ধীরগতির মধ্য দিয়ে জার্মান বুর্জোয়ারা বিকাশ লাভ করেছিল যে, যখন এরা একটা মহা বিপদ হিসেবে সম্মুখীন হল সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের, তখনই দেখা গেল একটা মহা বিপদ হিসেবে এদেরই সম্মুখীন হচ্ছে প্রলেতারিয়েত এবং বার্গারদের সেইসব অংশ যেগুলির স্বার্থ আর ভাব-ধারণা প্রলেতারিয়েতের কাছাকাছি। এরা

দেখল, শত্রুব্যূহ হিসেবে সজ্জিত রয়েছে **পশ্চাদভাগে** একটি শ্রেণী শুধু নয়, **সম্মুখভাগে** সমগ্র ইউরোপ। ১৭৮৯-এর ফরাসী বুর্জোয়াদের মতো পুরন সমাজের প্রতিনিধি রাজতন্ত্র এবং অভিজাতবর্গের বিপরীতে **গোটা** আধুনিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার শ্রেণী প্রুশীয় বুর্জোয়ারা নয়। এরা একটা **সামাজিক সম্প্রদায়** (social estate) গোছের একটা স্তরে নেমে গিয়েছিল, যারা সমানই স্পষ্টভাবে ক্রাউনের এবং জনসাধারণেরও বিরোধী, উভয় পক্ষেরই বিরোধিতা করতে আগ্রহশীল, অথচ পৃথক পৃথক করে ধরলে প্রত্যেকটি বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধেই অব্যবস্থিতচিত্ত, কারণ সর্বদাই এরা উভয়কে দেখতে হয় সম্মুখে, না হয় পশ্চাতে; একেবারে প্রথম থেকেই এরা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং পুরন সমাজের মুকুটধারী প্রতিনিধির সঙ্গে আপস করতে উদ্‌গ্রীব, কারণ এরা নিজেরাই হল পুরন সমাজের অংশ; পুরন সমাজের বিরুদ্ধে একটা নতুন সমাজের নয়, এরা হল জরাগ্রস্ত সমাজের মধ্যেই পুনর্নবীভূত স্বার্থের প্রতিনিধি; বিপ্লবের কর্ণধার হিসেবে এরা দন্ডায়মান, সেটা জনগণ এদের পিছনে সমবেত হয়েছিল বলে নয় — খোঁচা দিয়ে জনগণ এদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বলে; এরা আগুয়ান ছিল একটা নতুন সমাজ-যুগের উদ্যোগের প্রতিনিধি রূপে নয়, পুরন সামাজিক যুগের বদ্ধমূল বিদ্বেষেরই প্রতিনিধি রূপে; এরা হল পুরন রাষ্ট্রের একটি স্তর যা নিজে থেকে উত্থিত হয় নি, একটা ভূকম্পনের ফলে নতুন রাষ্ট্রের উপরিভাগে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে; এরা নিজেদের উপর আস্থাহীন, জনগণের প্রতি আস্থাহীন; ঊর্ধ্বতনদের প্রতি অসন্তুষ্ট, অধস্তনদের সম্মুখে কম্পমান, উভয় পক্ষের প্রতিই স্বার্থপর এবং স্বার্থপরতা সম্বন্ধে সচেতন, রক্ষণশীলদের কাছে বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের কাছে রক্ষণশীল, নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, আদর্শের বদলে বাগাড়ম্বরপ্রিয়, বিশ্ব-ঝঞ্ঝায় আতংকিত অথচ বিশ্ব-ঝঞ্ঝাকেই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে তৎপর; কোন ব্যাপারেই উদ্যোগ নেই এবং প্রতি ব্যাপারেই কুম্ভীলক, মৌলিকতার অভাবে মামুলি, আবার মামুলিপনার ক্ষেত্রে মৌলিক; নিজেদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দরকষাকষিতে মত্ত, উদ্যোগহীন, নিজেদের উপর আস্থাহীন, জনগণের উপর আস্থাহীন এবং বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকাহীন; একটি বলিষ্ঠ জাতির প্রথম যৌবনের প্রেরণাকে স্বীয় স্থবির স্বার্থে চালিত এবং বিচ্যুত করার অবধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত এক জঘন্য বৃদ্ধ —

চক্ষুহীন, কর্ণহীন, দন্তহীন, সর্বইন্দ্রিয়হীন — এমনই ছিল **প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী,** যারা মার্চ বিপ্লবের পরে প্রুশীয় রাষ্ট্রের কর্ণধার পদে পড়ে গেল।

১৮৪৮-এর ১১ ডিসেম্বর মার্কসের লেখা

১৮৪৮-এর ১৫ ডিসেম্বর 'Neue Rheinische Zeitung' পত্রিকার ১৬৯ নং সংখ্যায় প্রকাশিত

সংবাদপত্রের মূলপাঠ অনুসারে মুদ্রিত

জার্মান থেকে ইংরেজী তরজমার ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

পত্রাবলী

প্যারিসে প. ভ. আন্নেন্‌কভ সমীপে মার্কস

ব্রাসেল্‌স্‌, ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৪৬।

প্রিয় শ্রীযুক্ত আন্নেন্‌কভ,

মাত্র গত সপ্তাহে আমার পুস্তকবিক্রেতা 'দারিদ্র্যের দর্শন' নামক প্রুধোঁর বইখানি আমায় পাঠিয়েছেন, নচেৎ আপনার ১ নভেম্বর তারিখের পত্রের উত্তর আপনি বহুপূর্বেই পেতেন। যাতে সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে আমার অভিমত জানাতে পারি তজ্জন্য দু-দিনে বইখানি শেষ করেছি। খুব তাড়াতাড়ি পড়ায় বিশদ আলোচনা করতে পারব না, বইখানি পড়ে সাধারণভাবে আমার যা মনে হল, শুধু সেইটুকুই আপনাকে জানাতে পারি। যদি চান তাহলে দ্বিতীয় পত্রে বিশদ আলোচনা করা যায়।

আমি খোলাখুলিই আপনার কাছে স্বীকার করছি, বইখানি আমার কাছে মোটের উপর খারাপ লেগেছে, খুবই খারাপ লেগেছে। এই গড়নহীন এবং হামবড়া পুস্তকখানিতে 'জার্মান দর্শনের ছাপ' নিয়ে শ্রী প্রুধোঁ যে জাঁক করেছেন, তাতে তো আপনি নিজেই আপনার চিঠিতে ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু আপনি ভেবেছেন আর্থনীতিক বিচার দার্শনিক বিষে দুষ্ট হয় নি। আর্থনীতিক বিচারের ভুলভ্রান্তির জন্যে শ্রী প্রুধোঁর দর্শনকে আমিও মোটেই দায়ী করছি না। একটা আজগুবি দর্শন হাতে আছে বলেই শ্রী প্রুধোঁ অর্থশাস্ত্রের একটা ভ্রান্ত সমালোচনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন তা নয়, তিনি আমাদের এক আজগুবি দার্শনিক তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন, কারণ শ্রী প্রুধোঁ বর্তমান কালের সামাজিক পরিস্থিতিকে সেটার শৃঙ্খলাবদ্ধতার মাঝে (engrènement) বুঝতে পারেন নি; কথাটি তিনি অন্য অনেক কিছুর মতোই ফুরিয়েরের কাছ থেকে ধার করেছেন।

শ্রী প্রুধোঁ ঈশ্বরের কথা বলেছেন কেন, বিশ্বজনীন বোধির কথা বলেছেন কেন, কেন তিনি বলেছেন সর্বমানবের নৈর্ব্যক্তিক বোধির কথা, যা চির-অভ্রান্ত

এবং সর্বযুগে নিজের উপযুক্ত প্রতিপন্ন হয়েছে, যার সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারলেই সত্য হস্তগত হয়? নিজেকে একজন দুঃসাহসী চিন্তাবীর বলে জাহির করার জন্যে কেনই বা তিনি ক্ষীণ হেগেলপন্থার শরণ নিয়েছেন?

এ ধাঁধার চাবিকাঠি তিনি নিজেই দিয়েছেন। শ্রী প্রুধোঁর চোখে ইতিহাস হল একসারি সামাজিক বিকাশ; ইতিহাসে প্রগতি রূপায়িত হতে তিনি দেখেছেন; শেষে তিনি দেখতে পেয়েছেন বিভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে মানুষ জানত না তারা কী করছে এবং নিজেদের গতি সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল, অর্থাৎ তাদের সামাজিক বিকাশকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ থেকে বিশিষ্ট, আলাদা এবং স্বাধীন। তিনি এই তথ্যগুলির ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি, তাই স্বয়ংপ্রকটমান বিশ্বজনীন বোধি সংক্রান্ত প্রকল্পটি তাঁর কাছে খুবই সুবিধাজনক হয়েছে। অতীন্দ্রিয় হেতু, অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত বুলি উদ্ভাবন করার চেয়ে সহজ আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু শ্রী প্রুধোঁ যখন স্বীকার করেন যে, মানবজাতির ঐতিহাসিক বিকাশের কিছুই তিনি বোঝেন না — বিশ্বজনীন বোধি, ঈশ্বর, ইত্যাদি গালভরা কথা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তাঁর এই স্বীকৃতি প্রকাশ পায় — তখন কি তিনি পরোক্ষে এবং নিশ্চিতভাবে এই কথাই স্বীকার করেন না যে, **আর্থনীতিক বিকাশ** বুঝবার ক্ষমতা তাঁর নেই?

সমাজের রূপ যাই হোক না কেন, সমাজ কী? মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। খুশিমতো অমুক কিংবা তমুক রূপের সমাজ বেছে নেবার স্বাধীনতা কি মানুষের আছে? কোনমতেই না। মানুষের উৎপাদন-দক্ষতা বিকাশের একটি বিশেষ অবস্থার কথা যদি ধরা যায়, তাহলে এসে যাবে সংসর্গ (commerce) আর পরিভোগের একটি বিশেষ রূপ। উৎপাদন, সংসর্গ এবং পরিভোগের বিকাশের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ের কথা ধরলে এসে যাবে তদনুযায়ী সামাজিক গঠন, তদনুযায়ী পারিবারিক, বর্গীয় বা শ্রেণী সংগঠন, এককথায় তদনুযায়ী একটি নাগরিক সমাজ। একটি বিশেষ নাগরিক সমাজ ধরে নিলেই এসে যাবে একটি বিশেষ রাজনীতিক পরিবেশ, যা নাগরিক সমাজের যথাবৎ অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। এ ব্যাপারটা শ্রী প্রুধোঁ কখনও বুঝবেন না, কারণ তাঁর ধারণা রাষ্ট্র থেকে নাগরিক সমাজের কাছে, অর্থাৎ

সারসংক্ষেপ সমাজ থেকে যথাবৎ সমাজটার কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি মস্ত একটা কিছু করছেন।

বলা বাহুল্য, মানুষের সমগ্র ইতিহাসের যা ভিত্তি সেই **নিজেদের উৎপাদন-শক্তিসমূহ** তারা ইচ্ছামতো বেছে নিতে পারে না, কারণ উৎপাদন-শক্তি মাত্রই অর্জিত শক্তি, পূর্ববর্তী ক্রিয়াকলাপের ফল। অতএব উৎপাদন-শক্তিসমূহ হল মানুষের ব্যবহারিক কর্মশক্তির ফল; কিন্তু এই কর্মশক্তি নিজেই নির্দিষ্ট-রূপায়িত থাকে লোকে যে অবস্থার মধ্যে অবস্থিত সেটা দিয়ে, ইতোমধ্যে অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহ দিয়ে, তাদের আগেই বিদ্যমান সমাজ-রূপ দিয়ে, যেটাকে তারা সৃষ্টি করে না, যেটা পূর্ববর্তী পুরুষের উৎপাদিত ফল। প্রত্যেকটি পরবর্তী পুরুষ পূর্ববর্তী পুরুষের অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের অধিকারী হয় এবং তাদের জন্যে সেগুলি নতুন উৎপাদনের কাঁচামালের কাজ করে, এই সহজ ব্যাপারটার জন্যে মানবেতিহাসে একটি সুসংগতির সৃষ্টি হয়, গড়ে ওঠে মানবজাতির এক ইতিহাস, আর মানুষের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এবং কাজেই মানুষের সামাজিক সম্পর্কতন্ত্র আরও উন্নত হয়ে উঠেছে বলে এই ইতিহাস আরও বেশি করে মানবজাতির ইতিহাস। কাজেকাজেই আসে এই অপরিহার্য সিদ্ধান্ত: মানুষের সামাজিক ইতিহাস কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিকাশের ইতিহাস ছাড়া কিছুই নয়, সে সম্পর্কে তারা সচেতন থাক বা না থাক। তাদের বৈষয়িক সম্পর্কগুলিই তাদের সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তি। এই বৈষয়িক সম্পর্কগুলি হল তাদের বৈষয়িক এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ বাস্তবে রূপায়ণের প্রয়োজনীয় আধার ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রী প্রুধোঁ ভাব এবং জিনিসের তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। মানুষ যা অর্জন করে তা কখনও হাতছাড়া করে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা কখনও সেই সমাজ-রূপটি পরিহার করে না যাতে তারা কোন কোন উৎপাদন-শক্তি অর্জন করেছে। বরং উল্টো, লব্ধ ফল থেকে যাতে বঞ্চিত না হতে হয় এবং সভ্যতার ফলগুলি যাতে হারাতে না হয় সেজন্যে, যখন তাদের সংসর্গের প্রণালী আর অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের সঙ্গে খাপ খায় না, তখন থেকেই তারা তাদের সমস্ত চিরাচরিত সমাজরূপ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এখানে আমি 'commerce' শব্দটি ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহার করছি,

জার্মান ভাষায় 'Verkehr' শব্দটিকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি। যেমন, বিশেষ অধিকার, গিল্ড আর কর্পোরেশন প্রথা এবং মধ্যযুগীয় নিয়ামন বিধিব্যবস্থা, একমাত্র এইসব সামাজিক সম্পর্কই অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের অনুযায়ী ছিল, আর অনুযায়ী ছিল সেই সামাজিক অবস্থার যা ইতোপূর্বে বিদ্যমান ছিল এবং যা থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব হয়েছিল। কর্পোরেশন এবং নিয়ামনের বিধিবিধানের আশ্রয়ে পুঁজি জমে ওঠে, সামুদ্রিক বাণিজ্য বিকাশলাভ করে, উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কিন্তু এর ফল থেকে মানুষ বঞ্চিত হত, যদি যে সমাজ-রূপের আশ্রয়ে এইসব ফল পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল সেগুলিকে তারা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করত। তার থেকে দুবার বজ্রপাত হয় -- ১৬৪০ সালের এবং ১৬৮৮ সালের বিপ্লব। সমস্ত পুরন আর্থনীতিক ধরন, সেগুলোর অনুযায়ী সামাজিক সম্পর্ক, পুরন নাগরিক সমাজের যথাবৎ অভিব্যক্তিস্বরূপ রাজনীতিক পরিবেশ ইংলন্ডে ধ্বংস হয়ে গেল। এইভাবে, যেসব আর্থনীতিক ধরনে মানুষ উৎপাদন, পরিভোগ এবং বিনিময় করে সেগুলি **অস্থায়ী এবং ইতিহাসক্রমিক।** নতুন উৎপাদন-দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাদের উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তিত করে, আর উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত করে সমস্ত আর্থনীতিক সম্পর্ককেই, সেগুলি ছিল কেবল এই বিশেষ উৎপাদন-পদ্ধতিরই পক্ষে অপরিহার্য সম্পর্ক।

এই কথাটিই শ্রী প্রুধোঁ বুঝতে পারেন নি, দেখাতে তো পারেনই নি। ইতিহাসের প্রকৃত গতি বুঝতে অক্ষম শ্রী প্রুধোঁ এক আজগুবি ছায়াবাজি সৃষ্টি করেছেন, যেটাকে দ্বন্দ্বমূলক বলে তিনি প্রগল্ভ আখ্যা দিতে চেয়েছেন। তিনি সপ্তদশ, অষ্টাদশ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা বলার প্রয়োজনবোধ করেন নি, কারণ তাঁর ইতিহাস চলেছে স্থানকালের বহু ঊর্ধ্বে, কল্পনার কুয়াশা-রাজ্যে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটা ইতিহাস নয়, এ হচ্ছে পুরন হেগেলীয় মন্ড, এতো ঐহিক ইতিহাস অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস নয়, এ হচ্ছে পবিত্র ইতিহাস — ভাবসমূহের ইতিহাস। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ হচ্ছে হাতিয়ার মাত্র, যেটাকে ভাব অথবা শাশ্বত বোধি ব্যবহার করে আত্মপ্রকাশের জন্যে। শ্রী প্রুধোঁ যে **বিবর্তনগুলির** কথা বলছেন সেগুলি যেন পরম ভাবসত্তার অতীন্দ্রিয় গর্ভেই

নিষ্পন্ন হচ্ছে। এই রহস্যাচ্ছন্ন ভাষার আবরণ খসিয়ে ফেললে দেখতে পাবেন শ্রী প্রুধোঁ আপনার সম্মুখে এমন একটি শৃঙ্খলা উপস্থিত করছেন যেখানে আর্থনীতিক বর্গগুলি তাঁর নিজের মাথার মধ্যেই বিন্যস্ত হয়ে যায়। এটা যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল মনের শৃঙ্খলা, তা আপনার কাছে প্রমাণ করা আমার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হবে না।

শ্রী প্রুধোঁ তাঁর বই শুরু করেছেন **মূল্য** সম্পর্কে তত্ত্বালোচনা দিয়ে। এটি তাঁর প্রিয় বিষয়। আজ আমি এই তত্ত্বালোচনা পরীক্ষা করে দেখতে যাচ্ছি না।

শাশ্বত বোধির আর্থনীতিক বিবর্তনমালার সূচনা হয়েছে **শ্রমবিভাগ** দিয়ে। শ্রী প্রুধোঁর কাছে শ্রমবিভাগটি একেবারেই সহজ-সরল ব্যাপার। কিন্তু জাতিভেদ ব্যবস্থাও কি একটি বিশেষ শ্রমবিভাগ ছিল না? কর্পোরেশন ব্যবস্থাও কি ছিল না আরেকটি শ্রমবিভাগ? আর ইংলন্ডে ম্যানুফ্যাকচার ব্যবস্থার আমলের যে শ্রমবিভাগ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি আরম্ভ হয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শেষ হয় সেটাও কি বৃহদায়তন আধুনিক শিল্পের শ্রমবিভাগ থেকে একেবারে পৃথক নয়?

কিন্তু শ্রী প্রুধোঁ সত্য থেকে এতটা তফাতে রয়েছেন যে, মামুলী অর্থনীতিবিদেরাও যা নিয়ে আলোচনা করেন, তাকেও তিনি উপেক্ষা করে চলেন। যখন তিনি শ্রমবিভাগের কথা বলেন, তখন তিনি বিশ্ব-**বাজারের** কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন না। বেশ। তাহলে, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকে যখন কোন উপনিবেশ ছিল না, যখনও অবধি ইউরোপের কাছে আমেরিকার অস্তিত্ব ছিল না এবং তার কাছে পূর্ব এশিয়ার অস্তিত্ব ছিল কনস্টান্টিনোপল্-রূপে মাধ্যমের মারফত, তখনকার দিনের শ্রমবিভাগ কি মূলগতভাবে পৃথক ছিল না সপ্তদশ শতকের শ্রমবিভাগ থেকে, যখন উপনিবেশ বেশ ভালভাবেই স্থাপিত হয়ে গিয়েছে?

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। জাতিগুলির সমগ্র অভ্যন্তরীণ সংগঠন, জাতিগুলির সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি একটা নির্দিষ্ট শ্রমবিভাগের অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু? এবং শ্রমবিভাগের পরিবর্তন হলে এগুলির কি পরিবর্তন হবে না?

শ্রমবিভাগের সমস্যাটিকে শ্রী প্রুধোঁ এত কম বুঝেছেন যে, শহর

আর গ্রামের মধ্যে বিচ্ছেদের কথা তিনি কখনও উল্লেখ করেন নি, যে বিচ্ছেদ দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্মানিতে ঘটেছিল নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। এইভাবে, এর উদ্ভব বা বিকাশ কিছুই শ্রী প্রুধোঁ জানেন না বলে তাঁর কাছে এই বিচ্ছেদ একটা শাশ্বত নিয়ম। বইয়ের আগাগোড়া তিনি এমনভাবে লিখেছেন যেন একটি বিশেষ উৎপাদন-পদ্ধতির এই সৃষ্টিটি অনন্তকাল টিকে থাকবে। শ্রমবিভাগ সম্পর্কে শ্রী প্রুধোঁ যা-কিছু বলেছেন তা তাঁর আগে অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ হাজারো ব্যক্তি যা বলেছেন তারই সারাংশ মাত্র এবং সেটা আবার অত্যন্ত ভাসাভাসা এবং অত্যন্ত অসম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় বিবর্তন হল **যন্ত্র**। শ্রী প্রুধোঁর কাছে শ্রমবিভাগ এবং যন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পূর্ণ রহস্যময়। প্রত্যেক রকমের শ্রমবিভাগের ছিল তার বিশিষ্ট উৎপাদনের সাধিত্র। যেমন, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত লোকে সবকিছুই হাতে তৈরি করত না। তাদের সাধিত্র ছিল এবং তাঁত, জাহাজ, লেভার (levers) প্রভৃতির মতো অত্যন্ত জটিল সাধিত্র ছিল।

তাই, সাধারণভাবে শ্রমবিভাগ থেকে যন্ত্রপাতি এসেছে একথা বলার চেয়ে আজগুবি আর কিছু হতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে আরও বলে রাখি, যন্ত্রপাতির ইতিহাসক্রমিক উদ্ভব শ্রী প্রুধোঁ যৎসামান্যই বুঝেছেন, যন্ত্রপাতির বিকাশটাকে তিনি আরও কম বুঝেছেন। বলা চলে, ১৮২৫ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রথম বিশ্ব সংকটের পর্ব পর্যন্ত পরিভোগের চাহিদা সাধারণভাবে উৎপাদনের চেয়ে দ্রুত গতিতে বেড়েছিল, আর যন্ত্রপাতির বিকাশটা ছিল বাজারের প্রয়োজনের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল। ১৮২৫ সাল থেকে যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ হল স্রেফ মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে লড়াইয়ের ফল। তবে একথা শুধু ইংলন্ডের বেলাতেই প্রযোজ্য। ইউরোপীয় জাতিগুলি সম্পর্কে বলা যায়, নিজেদের দেশীয় বাজারগুলি এবং বিশ্ব-বাজার উভয়ত ইংরেজদের প্রতিযোগিতার তাড়নায় তারা যন্ত্রপাতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সর্বশেষে, উত্তর আমেরিকায় যন্ত্রপাতির প্রবর্তন হয়েছিল অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, আর মজুরের অভাব, উভয় কারণে, অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার জনসংখ্যা এবং তার শিল্পের প্রয়োজনের মধ্যে বৈষম্যের কারণে। এইসব

তথ্য থেকে বুঝতে পারেন, শ্রী প্রুধোঁ যখন যন্ত্রপাতির বিপরীত হিসেবে তৃতীয় বিবর্তন রূপে প্রতিযোগিতার জুজু সৃষ্টি করেন, তখন কী বিজ্ঞতারই না তিনি পরিচয় দেন!

সর্বশেষে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, **যন্ত্রপাতিকে** শ্রমবিভাগ, প্রতিযোগিতা, ক্রেডিট, প্রভৃতির পাশাপাশি একটি আর্থনীতিক বর্গ করে তোলা একেবারেই আজগুবি ব্যাপার।

যন্ত্রপাতি যদি আর্থনীতিক বর্গ হয় তবে হালটানা বলদও তাই। বর্তমান কালে যন্ত্রপাতির **প্রয়োগ** আমাদের বর্তমান আর্থনীতিক ব্যবস্থার অন্যতম সম্পর্কপাত, কিন্তু যে-পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো হয় সেটা খাস যন্ত্রপাতি থেকে একেবারেই পৃথক। মানুষকে জখম করার জন্যেই ব্যবহৃত হোক, কিংবা মানুষের ক্ষত সারাবার জন্যেই ব্যবহৃত হোক, বারুদ বারুদই থাকে।

শ্রী প্রুধোঁ যখন প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার, কর বা পুলিস, বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত, ক্রেডিট এবং মালিকানাকে নিজের মাথার মধ্যে ঠিক এই পরম্পরাতেই সৃষ্টি হতে দেন তখন কেরামতিতে তিনি নিজেকেই ছাড়িয়ে যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের আগেই ইংলন্ডে প্রায় সমস্ত ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠেছিল। পাবলিক ক্রেডিট ছিল কেবল করবৃদ্ধির এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতালাভ থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন চাহিদা মেটানোর একটা নতুন উপায়।

সর্বশেষে, শ্রী প্রুধোঁর শৃঙ্খলার শেষ বর্গ (category) হচ্ছে **মালিকানা**। বাস্তব দুনিয়ায় কিন্তু শ্রমবিভাগ এবং শ্রী প্রুধোঁর অন্যান্য সমস্ত বর্গই হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক, যেগুলি সামগ্রিকভাবে আজ **মালিকানা** নামে পরিচিত। এই সম্পর্কগুলির বাইরে বুর্জোয়া মালিকানা একটা আধিবিদ্যক অথবা আইনী ভেলকি ছাড়া কিছুই নয়। ভিন্ন যুগের মালিকানা, সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামাজিক সম্পর্কতন্ত্রের মধ্যে গড়ে ওঠে। মালিকানাকে স্বাধীন সম্পর্ক-রূপে দেখাতে গিয়ে শ্রী প্রুধোঁ শুধু যে একটা পদ্ধতিগত ভুল করেছেন তা নয়, তিনি স্পষ্টই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, **বুর্জোয়া** উৎপাদনের সমস্ত রূপকে একত্রে বিধৃত করে রাখে যে বন্ধন সেটাকে তিনি ধরতে পারেন নি, আর কোন বিশেষ যুগের উৎপাদনের ধরনগুলির

ইতিহাসক্রমিক এবং **অস্থায়ী** প্রকৃতিও তিনি বুঝতে পারেন নি। আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শ্রী প্রুধোঁ ইতিহাসক্রমিক উৎপাদ বলে মনে করেন না, তিনি সেগুলির উদ্ভব আর বিকাশ কোনটাই বোঝেন না, তাই সেগুলি সম্পর্কে তিনি শুধু অন্ধ গোঁড়ামিদুষ্ট সমালোচনাই করতে পারেন।

সেইজন্যেই শ্রী প্রুধোঁ বিকাশধারার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **অলীকতার** আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি ভাবেন শ্রমবিভাগ, ক্রেডিট, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি সবকিছুই উদ্ভাবিত হয়েছিল তাঁর বদ্ধ ধারণা, সমতার ধারণার খিদমত করার জন্যে। অপূর্ব অতি-সরল তাঁর ব্যাখ্যা। সমতার স্বার্থেই এইসব জিনিস উদ্ভাবিত হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গেল সমতার বিরুদ্ধে। এই হল তাঁর সমগ্র যুক্তি। অর্থাৎ, প্রথমে তিনি একটা ভিত্তিহীন অনুমান করলেন এবং পরে প্রকৃত ঘটনাবলি যখন প্রতিপদে তাঁর এই অলীকতাকে খণ্ডন করে তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন দ্বন্দ্ব-অসংগতি রয়েছে। সে বিরোধ যে শুধুই তাঁর বদ্ধ ধারণা আর বাস্তব গতির মধ্যে, সে কথা তিনি চেপে গিয়েছেন।

অতএব, প্রধানত ইতিহাসের জ্ঞানের অভাবের জন্যেই শ্রী প্রুধোঁ দেখতে পান নি যে, মানুষের উৎপাদন-দক্ষতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ তারা জীবনধারণ করতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে তাদের কতকগুলি সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে, আর উৎপাদন-দক্ষতার পরিবর্তন আর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপেই এই সম্পর্কগুলির প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, **আর্থনীতিক বর্গগুলি** হল এইসব বাস্তব সম্পর্কের **বিমূর্ত প্রকাশ** মাত্র, আর এইসব সম্পর্ক বর্তমান থাকার অবস্থাতেই সেগুলি যথার্থ। তাই, যাঁরা এইসব আর্থনীতিক বর্গকে ঐতিহাসিক নিয়ম নয়, চিরন্তন বলে ধরে নেন সেই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ভুলই তিনি করে বসেছেন, ঐতিহাসিক নিয়মগুলি কেবল একটি বিশেষ ইতিহাসক্রমিক বিকাশের ক্ষেত্রে, উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরের ক্ষেত্রেই নিয়ম। অতএব অর্থশাস্ত্রীয় বর্গগুলিকে প্রকৃত, অস্থায়ী, ইতিহাসক্রমিক সামাজিক সম্পর্কসমূহের বিমূর্ত প্রকাশ বলে গ্রহণ করার পরিবর্তে শ্রী প্রুধোঁ তাঁর রহস্যবাদী উল্টা-দৃষ্টির বলে প্রকৃত সম্পর্কগুলির মধ্যে এই বিমূর্তনগুলিরই রূপায়ণ দেখেছেন। এই বিমূর্তনগুলিও আবার জগতের আদিকাল হতে পিতা ঈশ্বরের বুকের মধ্যে সূত্রাকারে সুপ্ত ছিল।

এখানে কিন্তু বেচারা শ্রী প্রুধোঁ এক গুরুতর চিন্তা-বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। যদি এই সমস্ত আর্থনীতিক বর্গই ঈশ্বরের বক্ষোকন্দর থেকে বেরিয়ে এসে থাকে, এগুলিই যদি মানুষের প্রচ্ছন্ন এবং শাশ্বত জীবন হয়, তবে প্রথমত, কেমন করে বিকাশ বলে জিনিসটি সম্ভব হয় এবং দ্বিতীয়ত, কেমন করেই বা শ্রী প্রুধোঁকে রক্ষণশীল না বলে পারা যায়? এই সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলির ব্যাখ্যা তিনি করেছেন একটা পুরো বিরোধতন্ত্রের সাহায্যে।

এই বিরোধতন্ত্রটাকে ভালভাবে দেখাবার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

একচেটিয়া ভাল জিনিস, কারণ এটি একটি আর্থনীতিক বর্গ, অতএব ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত। প্রতিযোগিতা ভাল জিনিস, কারণ এটাও একটি আর্থনীতিক বর্গ। কিন্তু, যা ভাল নয় তা হচ্ছে একচেটিয়ার বাস্তবতাটা এবং প্রতিযোগিতার বাস্তবতাটা। যা আরও খারাপ তা হচ্ছে এই যে, প্রতিযোগিতা আর একচেটিয়া পরস্পরকে গ্রাস করে। কী করা যাবে? যেহেতু ঈশ্বরের এই দুটি শাশ্বত ভাব পরস্পরের বিরুদ্ধ, তাই শ্রী প্রুধোঁর কাছে এটা স্পষ্ট যে, ঈশ্বরের বুকের মধ্যে এ দুয়ের সংশ্লেষণও আছে, তাতে একচেটিয়ার কুফল প্রতিযোগিতার দ্বারা আর প্রতিযোগিতার কুফল একচেটিয়ার দ্বারা অপসৃত হয়ে সমতা রক্ষিত হচ্ছে। দুইটি ভাবের সংগ্রামের ফলে সে-দুটোর কেবল ভাল দিকটাই আত্মপ্রকাশ করবে। এই গোপন ভাবটি ঈশ্বর থেকে নিষ্কাশন করে এনে প্রয়োগ করলেই সবকিছুই পরম কল্যাণকর হয়ে উঠবে; মানুষের নৈর্ব্যক্তিক বোধির অন্ধকারে লুক্কায়িত হয়ে আছে যে সমন্বয়ী সূত্র সেটা উদ্‌ঘাটিত হবে। এই উদ্‌ঘাটক রূপে এগিয়ে আসতে শ্রী প্রুধোঁ এক মুহূর্তও দ্বিধা করেন নি।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যে বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বর্তমান কালের আর্থনীতিক জীবনে দেখবেন প্রতিযোগিতা আর একচেটিয়াই শুধু নয়, দেখবেন দুইয়ের সংশ্লেষণও, এবং সেটা **সূত্র** নয়, একটা **গতি**। একচেটিয়া পয়দা করে প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা পয়দা করে একচেটিয়া। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যা মনে করেন সেভাবে এই সমীকরণ বর্তমান পরিস্থিতির অসুবিধা দূর করা দূরে থাকুক, আরও কঠিন এবং তালগোল পাকান পরিস্থিতিই সৃষ্টি করে। অতএব, বর্তমান কালের আর্থনীতিক

সম্পর্কসমূহ যে-ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে যদি পালটে দেওয়া হয়, যদি বর্তমান উৎপাদন-**পদ্ধতিকে** ধ্বংস করা হয়, তাহলে ধ্বংস হবে প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া এবং দুইয়ের পারস্পরিক বিরোধিতাই শুধু নয়, আরও ধ্বংস হবে দুইয়ের ঐক্য, দুইয়ের সংশ্লেষণ, প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়ার মধ্যে যা সত্যকার ভারসাম্য সেই গতি।

এবার আমি আপনাকে শ্রী প্রুধোঁর দ্বান্দ্বিকতার একটি দৃষ্টান্ত দেব।

স্বাধীনতা আর দাসত্ব নিয়ে একটি বিরোধ। স্বাধীনতার ভাল আর মন্দ দিকগুলি সম্পর্কে বলার প্রয়োজন নেই, দাসত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়েও সেটার খারাপ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শুধু এর ভাল দিকটাই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমরা এখানে পরোক্ষ দাসত্ব নিয়ে, প্রলেতারিয়েতের দাসত্ব নিয়ে আলোচনা করছি না, আলোচনা করছি প্রত্যক্ষ দাসত্ব নিয়ে, আলোচনা করছি সুরিনামে, ব্রেজিলে, উত্তর আমেরিকার দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলিতে কৃষ্ণজাতিগুলির দাসত্ব নিয়ে।

যন্ত্রপাতি, ক্রেডিট, ইত্যাদির মতোই প্রত্যক্ষ দাসত্বও আমাদের বর্তমান শিল্পব্যবস্থার একটি খুঁটি। দাসত্ব ছাড়া তুলো অসম্ভব এবং তুলো ছাড়া বর্তমান শিল্প অসম্ভব। দাসত্ব উপনিবেশগুলিকে মূল্যবান করেছে, উপনিবেশগুলি বিশ্ববাণিজ্য সৃষ্টি করেছে, আবার বিশ্ববাণিজ্য হল বৃহদায়তন শিল্পের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। নিগ্রোদের নিয়ে দাস ব্যবসায় শুরু হবার আগে উপনিবেশগুলি পুরন দুনিয়াকে জাতদ্রব্য যোগাত খুব অল্প কয়েকটা মাত্র, পৃথিবীতে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। অতএব, দাসত্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক বর্গ। দাসত্ব ব্যতীত সবচেয়ে উন্নয়নশীল দেশ উত্তর আমেরিকা একটি গোষ্ঠীপতিশাসিত দেশে পরিণত হত। জাতিসমূহের মানচিত্র থেকে উত্তর আমেরিকাকে মুছে দিলেই দেখা দেবে শুধু নৈরাজ্য, আর বাণিজ্য এবং আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ অবক্ষয়। কিন্তু দাসত্ব বিলুপ্ত হতে দেওয়ার অর্থ জাতিসমূহের মানচিত্র থেকে উত্তর আমেরিকাকে মুছে দেওয়া। সেইজন্যেই, আর্থনীতিক বর্গ বলেই দুনিয়ার আদি থেকেই প্রত্যেক জাতির মধ্যেই দাসত্ব দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক জাতিগুলি শুধু কীভাবে নিজেদের দেশে দেশে দাসত্ব ঢেকে রাখতে হয় সেইটে শিখেছে, আর নতুন দুনিয়ায় সেটা রপ্তানি করেছে খোলাখুলি। দাসত্ব

সম্পর্কে এইসব কথার পর আমাদের গুণধর শ্রী প্রুধোঁ আর কীভাবে এগোবেন? তিনি স্বাধীনতা আর দাসত্বের মধ্যে একটা সংশ্লেষণের সন্ধান করবেন, সন্ধান করবেন স্বাধীনতা আর দাসত্বের মধ্যে একটা সুবর্ণ মধ্যপন্থা অথবা ভারসাম্য।

শ্রী প্রুধোঁ বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, মানুষই কাপড়, ক্ষৌম বস্ত্র, রেশম, প্রভৃতি তৈরি করে, এবং এইটুকু বুঝতে পারাও তাঁর পক্ষে মহাকৃতি বই কি! কিন্তু যা তিনি বুঝতে পারেন নি তা হচ্ছে এই যে, এইসব মানুষ তাদের সাধ্য অনুসারে পয়দা করে সেইসব **সামাজিক সম্পর্কও** যে-অবস্থায় তারা কাপড় আর ক্ষৌম বস্ত্র তৈরি করে। এর চেয়ে আরও কম যেটা তিনি বুঝেছেন তা হচ্ছে এই যে, যেসব মানুষ নিজেদের বৈষয়িক উৎপাদনশীলতা অনুসারে নিজেদের সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে, তারা আরও পয়দা করে বিভিন্ন **ভাব, বর্গ,** অর্থাৎ এই সামাজিক সম্পর্কগুলিরই বিমূর্ত, ভাবগত অভিব্যক্তি। কাজেই, বিভিন্ন বর্গ সেগুলির দ্বারা প্রকাশিত সম্পর্কগুলির চেয়ে বেশি শাশ্বত নয়। এগুলি ইতিহাসক্রমিক এবং অস্থায়ী সৃষ্টি। কিন্তু শ্রী প্রুধোঁর বিবেচনা বিপরীত: বিমূর্তন, বর্গ — এগুলি আদ্য হেতু। তাঁর মতে, মানুষেরা নয়, এগুলিই ইতিহাস সৃষ্টি করে। **বিমূর্তন, তদবস্থ বর্গ,** অর্থাৎ মানুষ এবং তাদের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ধরা বর্গ নিশ্চয়ই অমর, অপরিবর্তনীয়, নিশ্চল; তা হচ্ছে বিশুদ্ধ বোধির একটামাত্র রূপ; কথাটা দাঁড়ায় এই যে, বিমূর্তনটা বিমূর্তন হিসেবে বিমূর্ত। চমৎকার **জ্ঞাতজ্ঞাপন!**

এইভাবে, শ্রী প্রুধোঁর কাছে বর্গ হিসেবে বিবেচিত আর্থনীতিক সম্পর্কগুলি শাশ্বত সূত্র, যেগুলোর উদ্ভবও নেই, অগ্রগতিও নেই।

ব্যাপারটা অন্যভাবে বলা যাক: শ্রী প্রুধোঁ সরাসরি বলছেন না যে, তাঁর কাছে **বুর্জোয়া জীবন একটি শাশ্বত সত্য;** সে কথা তিনি বলছেন পরোক্ষে, যখন তিনি বর্গগুলিকে দেবত্ব দান করছেন, যেগুলি হচ্ছে চিন্তা-রূপে অভিব্যক্ত বুর্জোয়া সম্পর্ক। বুর্জোয়া সমাজের উৎপন্নগুলি তাঁর মনের কাছে বর্গ-রূপে, চিন্তা-রূপে প্রতিভাত হওয়া মাত্র সেগুলিকে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত স্বকীয় জীবনসম্পন্ন চিরন্তন সত্তা বলে ধরে নিয়েছেন। কাজেই বুর্জোয়া দিগন্তের ঊর্ধ্বে তিনি ওঠেন নি। বুর্জোয়া ভাবগুলি নিয়েই

যেহেতু তাঁর কারবার, সেগুলোর শাশ্বত সত্যই তিনি ধরে নিয়েছেন, তাই সেগুলোর একটা সংশ্লেষণ, একটা ভারসাম্যের সন্ধান তিনি করেছেন; তিনি কিন্তু বুঝতে পারেন নি যে, বর্তমানে যেভাবে সেগুলো ভারসাম্যে পেঁছিয় সেটাই একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি।

প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত ভালমানুষ বুর্জোয়া যা করেন, শ্রী প্রুধোঁও তাই করেছেন। তাঁরা সকলেই বলে থাকেন যে, নীতিগতভাবে অর্থাৎ বিমূর্ত ভাব হিসেবে বিবেচনা করলে প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া, ইত্যাদি হচ্ছে জীবনের একমাত্র ভিত্তি, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এইসব ব্যাপারে বাঞ্ছনীয় আরও অনেক কিছুই বাকি থাকে। এ'রা সকলেই প্রতিযোগিতা চান সেটার মারাত্মক ফলটা বাদ দিয়ে। তাঁরা সকলেই চান অসম্ভবকে, অর্থাৎ বুর্জোয়া জীবনযাত্রার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিগুলি বাদ দিয়ে সেই বুর্জোয়া জীবনযাত্রার পরিবেশ। তাঁদের কেউই বোঝেন না যে, উৎপাদনের বুর্জোয়া ধরনটা ইতিহাসক্রমিক এবং অস্থায়ী, ঠিক যেমন ছিল সামন্ততান্ত্রিক ধরনটা। তাঁদের এই ভুলের কারণ এই যে, তাঁরা মনে করেন বুর্জোয়া মানুষই সমস্ত সমাজের একমাত্র সম্ভাব্য ভিত্তি; এমন কোন সমাজব্যবস্থা তাঁরা কল্পনা করতে পারেন না যেখানে মানুষ আর বুর্জোয়া নয়।

কাজেকাজেই শ্রী প্রুধোঁ অনিবার্যভাবেই **অন্ধ মতবাগীশ।** যে ঐতিহাসিক গতি বর্তমান দুনিয়াকে একেবারে উল্টে দিচ্ছে, সেটা তাঁর কাছে দুটি বুর্জোয়া ভাবের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য, সংশ্লেষণ আবিষ্কারের সমস্যায় পর্যবসিত হয়। তাই, এই চতুর ব্যক্তিটি সূক্ষ্ম প্যাঁচে ঈশ্বরের গোপন চিন্তাটি, অর্থাৎ দুইটি বিচ্ছিন্ন ভাবের একত্ব আবিষ্কার করে ফেলেন; সে ভাব-দুটি যে বিচ্ছিন্ন তার একমাত্র কারণ শ্রী প্রুধোঁ এদের ব্যবহারিক জীবন থেকে, বর্তমান কালের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন; বর্তমান কালের এ উৎপাদন হচ্ছে সেইসব বাস্তবতারই সমাহার, যার অভিব্যক্তি হচ্ছে ঐ দুটি ভাব। মানুষের ইতোমধ্যে অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহ এবং সেগুলির সঙ্গে আর যা খাপ খায় না সেই সামাজিক সম্পর্কসমূহের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ থেকে উদ্ভূত বিরাট ঐতিহাসিক গতির স্থলে; প্রত্যেক জাতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব ভীষণ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে সেগুলির স্থলে; জনগণের যেসব ব্যবহারিক এবং প্রচণ্ড কার্যকরণ দিয়েই

শুধু এইসব সংঘাতের মীমাংসা হতে পারে তার স্থলে — এই বিশাল, সুদীর্ঘ এবং জটিল গতির স্থলে শ্রী প্রুধোঁ হাজির করেন তাঁর নিজের মস্তিষ্কের খামখেয়ালী গতি। তাহলে, পণ্ডিত ব্যক্তিরাই, অর্থাৎ যাঁরা ঈশ্বরের গোপন চিন্তাটা মেরে দিতে পারেন, তাঁরাই ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সাধারণ মানুষের কাজ শুধু তাঁদের ধ্যানসত্যকে প্রয়োগ করা।

এখন আপনি বুঝতে পারবেন কেন শ্রী প্রুধোঁ সমস্ত রাজনীতিক আন্দোলনের ঘোষিত শত্রু। তাঁর বিচারে বর্তমান সমস্যাবলির সমাধান হবে জনসাধারণের কার্যকরণের ফলে নয়, হবে তাঁর মাথার দ্বান্দ্বিক আবর্তনের সাহায্যে। যেহেতু তাঁর বিবেচনায় বর্গগুলিই চালিকা-শক্তি, তাই বর্গগুলিকে পরিবর্তন করার জন্যে বাস্তব জীবন পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত। বর্গগুলিকে পরিবর্তন করতে হবে, তার পরিণতি হবে বিদ্যমান সমাজের পরিবর্তন।

দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলিকে মেলাবার কামনা রয়েছে বলে শ্রী প্রুধোঁ এই মর্মে প্রশ্নটাও তোলেন নি যে, এইসব দ্বন্দ্ব-অসংগতির একেবারে ভিত্তিটাকেই উচ্ছেদ করা আবশ্যক কিনা। যিনি রাজা, প্রতিনিধি পরিষদ আর অভিজাতদের পরিষদকে সমাজ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, শাশ্বত বর্গ হিসেবে বজায় রাখতে চান, তিনি একেবারে ঠিক সেই রাজনীতিক মতবাগীশেরই মতো। তিনি শুধু এমন একটি নতুন সূত্র বার করার চেষ্টা করছেন যার দ্বারা এই শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, যে-ভারসাম্য হল ঠিক যথার্থ গতিটাই, যাতে এক শক্তি কখনও অন্য শক্তির বিজেতা, কখনও বা তার দাস। এইভাবে, অষ্টাদশ শতকে মাঝারি মাথাওয়ালা কিছু লোক এমন একটি নির্ভুল সূত্র আবিষ্কারে ব্যাপৃত ছিল, যেটার সাহায্যে সামাজিক বর্গগুলি, অভিজাত শ্রেণী, রাজা, পার্লামেন্ট, ইত্যাদির মধ্যে ভারসাম্য ঘটবে, আর হঠাৎ একদিন তারা দেখতে পেল, প্রকৃতপক্ষে কোন রাজা, পার্লামেন্ট বা অভিজাত সম্প্রদায় আর নেই। এই বিরোধের প্রকৃত ভারসাম্য ছিল সেই সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের উচ্ছেদে, যে-সম্পর্কগুলিই হয়ে ছিল এই সামন্ততান্ত্রিক জীবগুলির এবং তাদের বিরোধের ভিত্তি।

শাশ্বত ভাবগুলিকে, বিশুদ্ধ বোধির বর্গগুলিকে শ্রী প্রুধোঁ একদিকে ফেলেছেন, অন্যদিকে ফেলেছেন মানুষকে আর তাদের ব্যবহারিক জীবনকে,

যা তাঁর মতে এই বর্গগুলিরই প্রয়োগ, সেইজন্যে গোড়া থেকেই তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় জীবন আর ভাবের মধ্যে, আত্মা আর দেহের মধ্যে একটা **দ্বৈতভাব**, যা বহুরূপে প্রকাশ পায়। এখন বুঝতে পারছেন, যে-বর্গগুলিকে শ্রী প্রুধোঁ দেবতার স্তরে তুলে দেন, সেগুলির ঐহলৌকিক উদ্ভব আর ঐহলৌকিক ইতিহাস বুঝতে শ্রী প্রুধোঁর অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয় এই বিরোধটা।

আমার পত্র ইতোমধ্যে এত দীর্ঘ হয়ে পড়েছে যে, শ্রী প্রুধোঁ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যে আজগুবি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনার আর অবকাশ নেই। আপাতত আপনি আমার এই কথাটা মেনে নেবেন যে, সমাজের বর্তমান অবস্থাটাকে যিনি বুঝতে পারেন নি, তিনি সেই সমাজের উচ্ছেদের আন্দোলনকে এবং সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাহিত্যিক অভিব্যক্তিকে আরও কম বুঝবেন বলেই মনে করা যেতে পারে।

যে **একটিমাত্র বিষয়ে** আমি শ্রী প্রুধোঁর সঙ্গে একমত তা হচ্ছে ভাবাবেগাপ্লুত সমাজতান্ত্রিক দিবাস্বপ্নের প্রতি তাঁর বিরক্তি। ইতোমধ্যে, শ্রী প্রুধোঁর আগেই, আমি এই ভাবালুতাগ্রস্ত, ইউটোপীয়, ভেড়ামার্কা সমাজতন্ত্রকে বিদ্রূপ করে বহু শত্রুতা জুটিয়েছি। সমাজতান্ত্রিক ভাবালুতা, যা দৃষ্টান্তস্বরূপ ফুরিয়েরের ক্ষেত্রে আমাদের গুণধর প্রুধোঁর আত্মম্ভরি মামুলিয়ানার চেয়ে অনেক বেশি গভীর, সেটার বিরুদ্ধে নিজের পেটি-বুর্জোয়া ভাবালুতাকে উপস্থাপিত করে শ্রী প্রুধোঁ কি অদ্ভুতভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন না? শ্রী প্রুধোঁর পেটি-বুর্জোয়া ভাবালুতা বলতে এখানে আমি পরিবার, দাম্পত্যপ্রেম এবং অন্যান্য সব মামুলী ব্যাপার নিয়ে তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসের কথাই বলছি। নিজের যুক্তিসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে, এইসব জিনিস নিয়ে কথা বলতে নিজের ডাহা অক্ষমতা সম্পর্কে তিনি নিজেই এতই সম্যক সচেতন বলেই তিনি হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, উদাত্ত ক্রোধে ফেটে পড়েন, চীৎকার করেন, মুখ দিয়ে গেঁজলা তোলেন, শাপশাপান্ত করেন, গালি দেন, ধিক্কার হানেন, বুক চাপড়ান এবং ঈশ্বর আর মানুষের কাছে বড়াই করেন সমাজতান্ত্রিক কলঙ্কের দাগ তাঁর গায়ে লাগে নি! সমাজতান্ত্রিক ভাবালুতাকে অথবা সমাজতান্ত্রিক ভাবালুতা বলতে তিনি যা বোঝেন সেটাকে

তিনি গুরুত্ব দিয়ে সমালোচনা করেন নি। তিনি সাধু মোহান্তের মতো, পোপের মতো হতভাগ্য পাপীদের সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত করে দেন এবং পেটি বুর্জোয়াদের গুণগান করেন, গার্হস্থ্যজীবনের শোচনীয় পিতৃতান্ত্রিক আর প্রণয়শীল মোহের গুণগান করেন। কিন্তু এটা আকস্মিক নয়। শ্রী প্রুধোঁ হচ্ছেন আপাদমস্তক পেটি বুর্জোয়াদের দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদ। উন্নত সমাজে **পেটি বুর্জোয়ারা** তাদের অবস্থানের কারণেই অনিবার্যভাবে একদিকে সমাজতন্ত্রী, অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়ার মহিমায় তাদের চোখে ধাঁধা লাগে এবং জনসাধারণের দুর্গতির প্রতি তাদের সহানুভূতিও থাকে। তারা হচ্ছে একাধারে বুর্জোয়া এবং জনসাধারণের লোক। অন্তরে-অন্তরে তারা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, তারা নিরপেক্ষ এবং সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পেয়েছে, যে ভারসাম্যটা সুবর্ণ মধ্যপন্থা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র বলে তাদের ধারণা। এই ধরনের পেটি বুর্জোয়া **দ্বন্দ্ব-অসংগতির** মাহাত্ম্যকীর্তন করে, কারণ দ্বন্দ্ব-অসংগতিই তার অস্তিত্বের ভিত্তি। নিজে সে সক্রিয় সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছাড়া কিছুই নয়। কার্যক্ষেত্রে সে যা সেটাকে তার সমর্থন করা চাই তত্ত্ব দিয়ে, আর ফরাসী পেটি বুর্জোয়ার বৈজ্ঞানিক ভাষ্যকার হবার যোগ্যতা শ্রী প্রুধোঁর আছে — একটা সত্যিকারের যোগ্যতা, কারণ পেটি বুর্জোয়ারা হবে সমস্ত আসন্ন সমাজবিপ্লবের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত আমার বইখানি (৭০) যদি এই পত্রের সঙ্গে আপনাকে পাঠাতে পারতাম তাহলে ভাল হত। কিন্তু বইখানা ছাপানো আমার পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নি; জার্মান দার্শনিকদের এবং সমাজতন্ত্রীদের যে-সমালোচনার* কথা ব্রাসেলসে আপনাকে বলেছিলাম তাও ছাপানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। জার্মানিতে এই ধরনের বই ছাপাতে গেলে যে কীরূপ বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তা আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। বাধা আসে একদিকে পুলিসের নিকট থেকে, অন্যদিকে প্রকাশকদের নিকট থেকে, যারা নিজেরাই হচ্ছে সেইসব ধারারই স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি যে-ধারাগুলিকে আমি আক্রমণ করছি। আর আমাদের নিজেদের পার্টির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তা যে শুধু দরিদ্র

---

* মার্কস এবং এঙ্গেলস: 'জার্মান ভাবাদর্শ'। — সম্পাঃ

তাই নয়, অধিকন্তু জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির একটা বড় অংশ আমার উপর ক্রুদ্ধ এই কারণে যে, আমি তাদের ইউটোপিয়া এবং ভাবোচ্ছ্বাসগুলির বিরোধিতা করেছি...

'চিঠিপত্রে ম. ম. স্টাসিউলেভিচ এবং তাঁর সমসাময়িকেরা' বইয়ের ৩য় খণ্ডে (সেন্ট পিটার্সবুর্গ, ১৯১২) প্রথম প্রকাশিত হয় মূল ফরাসী ভাষায়

এই বই অনুসারে মুদ্রিত

ফরাসী থেকে ইংরেজী তরজমার ভাষান্তর

টীকা

(১) **'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ'** রচনাটি ক. মার্কস লেখেন ব্রাসেল্‌সে ১৮৪৫ সালের বসন্তে। এই সময়ের মধ্যেই তিনি ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্বের বিকাশ সাধন মোটের উপর শেষ করেন এবং মানবসমাজটাকে উপলব্ধি করার জন্যে বস্তুবাদ সম্প্রসারিত করেন। এঙ্গেলসের বক্তব্য অনুসারে এটি হল 'নতুন বিশ্বদৃষ্টির প্রতিভাদীপ্ত ভ্রূণসত্তার প্রথম দলিল'।

'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ' রচনায় কার্ল মার্কস ফয়েরবাখ এবং তাঁর সমস্ত পূর্বসূরীর বস্তুবাদের মূল ত্রুটি উন্মোচন করেন, সেই ত্রুটি হল সেটার নিষ্ক্রিয়-অনুধ্যানশীল দৃষ্টিপাত, মানুষের বৈপ্লবিক, 'ব্যবহারিক-পরীক্ষামূলক' কার্যকলাপের গুরুত্ব বুঝতে অপারকতা। জগৎ সংবেদ এবং জগৎটাকে নতুন করে গড়ায় বৈপ্লবিক চালিতকর্মের চূড়ান্ত ভূমিকার উপর মার্কস জোর দেন।

'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ' রয়েছে মার্কসের ১৮৪৪ — ১৮৪৭ সালের 'মন্তব্য-পুস্তক'-এ এবং শিরোনাম হল 'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে'। ১৮৮৮ সালে 'থিসিসসমূহ' প্রকাশ করার সময়ে এঙ্গেলস এগুলিতে কিছু কিছু সম্পাদকীয় পরিবর্তন করেন, যাতে এই দলিলটিকে পাঠকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত বোধগম্য করা যায় (মার্কস এটিকে ছাপা মনস্থ করেন নি)। বর্তমান সংস্করণে 'থিসিসসমূহ' দেওয়া হয়েছে এঙ্গেলসের দেওয়া আকারে, তাতে মার্কসের পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে কিছু কিছু বাঁকা ছাঁদের অক্ষর এবং উদ্ধার-চিহ্ন যোগ করা হয়েছে, যা ১৮৮৮ সালের সংস্করণে নেই। 'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ' নামটি দেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট।

পৃঃ ৯

(২) **'জার্মান ভাবাদর্শ। ফয়েরবাখ, ব. বাউয়ের এবং স্টির্নারের বর্ণিত সর্বসাম্প্রতিক জার্মান দর্শন এবং বিভিন্ন পয়গম্বরের বর্ণিত জার্মান সমাজতন্ত্রের সমালোচনা'** রচনাটি ক. মার্কস এবং ফ. এঙ্গেলস লেখেন যুক্তভাবে ব্রাসেল্‌সে ১৮৪৫—১৮৪৬ সালে। 'জার্মান ভাবাদর্শ' রচনায় মার্কস এবং এঙ্গেলস সেই প্রথম

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

'জার্মান ভাবাদর্শ'-র পাণ্ডুলিপিটি দুই খণ্ডে রচিত, এর প্রথম খণ্ড হল হেগেলোত্তর দর্শনের পর্যালোচনা এবং দ্বিতীয় খণ্ড 'প্রকৃত সমাজতন্ত্রের' সমালোচনা।

প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে 'জার্মান ভাবাদর্শ'-র গঠনমূলক প্রধান মর্মবস্তু। সেজন্যে এটা পুরো রচনাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং এটার নিজস্ব তাৎপর্য আছে।

প্রথম অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি হল মাজাঘষা-না-করা পাণ্ডুলিপির তিনটি অংশ এবং অধ্যায়ের প্রথম দিকের দুটি পরিষ্কারভাবে লেখা লিপি নিয়ে। তদনুসারে অধ্যায়টি চার ভাগে বিভক্ত।

অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হল পরিষ্কার লিপির দ্বিতীয় আকার, তাতে প্রথম আকার থেকে যোগ করা হয়েছে সেই জিনিসগুলি যা দ্বিতীয় আকারে বাদ পড়েছে। দ্বিতীয় ভাগে হাজির করা হয়েছে পুরো অধ্যায়ের আদি মর্মবস্তু। তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগ হল স্টির্নারের সম্পর্কিত অধ্যায় থেকে (প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়) নেওয়া তত্ত্বগত প্রসঙ্গান্তর। এই বইখানায় মালমশলা সাজান হয়েছে ১৯৬৬ সালে মস্কোয় রুশ ভাষায় প্রকাশিত ক. মার্কস এবং ফ. এঙ্গেলসের 'ফয়েরবাখ। বস্তুবাদী এবং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিযোগ' ('জার্মান ভাবাদর্শ'-র প্রথম অধ্যায়ের নতুন প্রকাশনা) পুস্তিকা অনুসারে।

সমস্ত সম্পাদকীয় শিরোনাম আর প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় সন্নিবেশ এবং পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার সংখ্যাও দেওয়া হয়েছে গুরু বন্ধনীতে। মার্কস এবং এঙ্গেলসের পরিষ্কার দ্বিতীয় লিপির মূল পাতাগুলির নম্বর [১ বিভাগ], ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিষ্কার প্রথম লিপিতে লেখকরা পৃষ্ঠার নম্বর দেন নি, সেগুলি এখানে [১ পৃঃ] ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। পাণ্ডুলিপির খসড়া হিসেবে লেখা তিনটে অংশের পৃষ্ঠাগুলিতে মার্কস নম্বর দিয়ে গেছেন, সেগুলি এখানে শুধু [১] ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা সূচিত। পৃঃ ১৩

(৩) এখানে ড. ফ. স্ট্রাউসের 'যীশুর জীবন' শীর্ষক প্রধান রচনাটির কথা বলা হচ্ছে (D. F. Strauß, 'Das Leben Jesu'. Bd. 1-2, Tübingen, 1835-1836)। ধর্মের দার্শনিক সমালোচনা এবং হেগেলীয় সম্প্রদায়টি ভেঙে সাবেকী হেগেলপন্থী আর নবীন হেগেলপন্থী এই দুই ধারায় বিভক্ত হবার সূত্রপাত করে এই রচনাটি। পৃঃ ১৩

(৪) এখানে অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৩

(৫) **দিয়াদোচি** — ম্যাসিডোনিয়ার আলেক্‌জান্ডরের সেনাপতিরা। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতা লাভের জন্যে তারা নিজেদের মধ্যে হিংস্র লড়াই চালায়। এই সংগ্রামের মধ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শুরু) আলেক্‌জান্ডরের সাম্রাজ্য — সামরিক-প্রশাসনিক দিক থেকে অস্থিত পারিমেল — কয়েকটা পৃথক পৃথক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। পৃঃ ১৩

(৬) **'জগৎবিদারক চিন্তন'** — ১৮৪৫ সালে 'Wigand's Vierteljahrsschrift' পত্রিকায় চতুর্থ খণ্ডে, পৃঃ ৩২৭ প্রকাশিত একটি বেনামী প্রবন্ধের উক্তি।

'Wigand's Vierteljahrsschrift' ('ভিগান্ডের ত্রৈমাসিক পত্রিকা') হল নবীন হেগেলপন্থীদের দার্শনিক পত্রিকা; ১৮৪৪—১৮৪৫ সালে লাইপজিগে ভিগান্ড কর্তৃক প্রকাশিত। ব. বাউয়ের, ম. স্টির্নারের, ল. ফয়েরবাখ এবং অন্যান্যরা এই পত্রিকায় লিখতেন। পৃঃ ১৭

(৭) 'জার্মান ভাবাদর্শ'-তে 'Verkehr' শব্দটি খুবই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পৃথক পৃথক ব্যক্তি আর সামাজিক বর্গ এবং গোটা গোটা দেশের বৈষয়িক আর মানসিক সংসর্গ এর মধ্যে পড়ে। মার্কস এবং এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, বৈষয়িক সংসর্গ এবং সর্বোপরি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থাপিত মানুষে-মানুষে সংসর্গ অন্যান্য সমস্ত ধরনের সংসর্গের ভিত্তি। 'জার্মান ভাবাদর্শ' রচনায় ব্যবহৃত 'Verkehrsform', 'Verkehrsweise', 'Verkehrsverhältnisse', 'Produktions-und Verkehrsverhältnisse' ('সংসর্গের রূপ', 'সংসর্গের প্রণালী', 'সংসর্গের সম্পর্ক বা পরিবেশ', 'উৎপাদন এবং সংসর্গের সম্পর্ক') এই কথাগুলিকে মার্কস এবং এঙ্গেলস ব্যবহার করেছেন উৎপাদন-সম্পর্ক সংক্রান্ত ধারণাটি প্রকাশ করার জন্যে, এটা তখন তাঁদের মনে দানা বেঁধে উঠছিল। পৃঃ ২০

(৮) 'Stamm' এই পরিভাষাটিকে 'জার্মান ভাবাদর্শ'-এ 'গোষ্ঠী' বলে তরজমা করা হয়েছে, এটা ১৯ শতকের পঞ্চম দশকের ইতিহাসবিজ্ঞানের রচনাগুলিতে বর্তমানের চেয়ে অনেক মস্ত ভূমিকায় থেকেছে। এটা দিয়ে বোঝানো হত একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত লোক-সম্প্রদায়কে; 'গণ' (Gens) এবং 'গোষ্ঠী' (Stamm) অর্থ এটার মধ্যে পড়ে। এই ধারণাগুলির সংজ্ঞার্থ সর্বপ্রথমে করেন লুইস হের্নার মর্গান তাঁর প্রধান রচনা 'আদিম সমাজ'-এ (১৮৭৭)। এই বিশিষ্ট মার্কিন নৃকুলবিদ্যাবিদ ও ইতিহাসকার এই প্রথম আদিম কমিউন-ব্যবস্থার কোষকেন্দ্র হিসেবে 'গণ'-এর তাৎপর্যটাকে প্রদর্শন করেন এবং এইভাবে সমগ্র আদিম সমাজের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করেন। মর্গানের আবিষ্কারগুলি থেকে এঙ্গেলস বিভিন্ন সাধারণ সিদ্ধান্ত স্থির করেন এবং 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা

ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (১৮৮৪) রচনায় 'গণ' ও 'গোষ্ঠী' সংক্রান্ত ধারণা সর্বাত্মক বিশ্লেষণ করেন। পৃঃ ২১

(৯) রোমক জন-ট্রিবিউন লিসিনাস এবং সেক্সিটয়াসের ভূমি-আইন খৃঃ পূঃ ৩৬৭ সালে গৃহীত হয় প্যাট্রিশিয়ানদের বিরুদ্ধে প্লিবিয়ানদের সংগ্রামের ফলে। এই আইন অনুসারে রোমক নাগরিকদের সাধারণের ভূমি থেকে (ager publicus) ৫০০ ইউগেরের (প্রায় ১২৫ হেক্টর) বেশি জমি দখল করতে পারত না। পৃঃ ২২

(১০) ১৮৪৫ সালের 'Wigand's Vierteljahrsschrift' পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে ৮৬-১৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ব. বাউয়েরের 'লুডভিগ ফয়েরবাখের বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে এখানে। পৃঃ ৩০

(১১) দ্রঃ হেগেল, **'ইতিহাসের দর্শন'**। মুখবন্ধ, বিশ্ব ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তি। পৃঃ ৩৩

(১২) এখানে **'লুডভিগ ফয়েরবাখের বৈশিষ্ট্য'** (১৮৪৫ সালের 'Wigand's Vierteljahrsschrift', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩০) প্রবন্ধে ব. বাউয়েরের একটা উক্তির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩৪

(১৩) 'Deutch-Französische Jahrbücher' ('জার্মান-ফরাসী বর্ষপঞ্জি') পত্রিকা প্রকাশিত হত প্যারিস থেকে জার্মান ভাষায়, ক. মার্কস এবং আ. রুগে সম্পাদনা করতেন। এর শুধু প্রথম, ডবল সংখ্যাটিই প্রকাশিত হয় (১৮৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে)। এতে ছিল ক. মার্কসের দুটি প্রবন্ধ — 'ইহুদি সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে' এবং 'হেগেলীয় দর্শনের পর্যালোচনা সম্পর্কে। মুখবন্ধ' এবং ফ. এঙ্গেলসের দুটি প্রবন্ধ — 'অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনার রূপরেখা' এবং 'ইংলন্ডের অবস্থা। টমাস কার্লাইলের "অতীত ও বর্তমান"', লন্ডন, ১৮৪৩। বস্তুবাদ ও কমিউনিজমে মার্কস এবং এঙ্গেলসের চূড়ান্ত উত্তরণ সূচিত হয় এইসব রচনায়। এই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবার প্রধান কারণ হল মার্কস এবং বুর্জোয়া র‍্যাডিকাল রুগে'র মধ্যে মূলগত মতবিরোধ। পৃঃ ৪৩

(১৪) সমস্ত অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশে কেবল যুগপৎই প্রলেতারীয় বিপ্লব সমাধা হতে পারে, অতএব একটিমাত্র দেশে বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব, এই সিদ্ধান্তটি ঠিক ছিল প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের কালে। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের কালে, ভ. ই. লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিতন্ত্রের অসম অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেন এবং সেখান থেকে এগিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছন: একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের আমলে সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের বিজয় প্রথমে কয়েকটি, এমনকি একটিমাত্র দেশেও সম্ভব এবং সব দেশে অথবা বেশির ভাগ দেশে বিপ্লবের যুগপৎ বিজয় অসম্ভব। এই থিসিস প্রথম তুলে ধরা হয় ভ. ই. লেনিনের 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বনি' প্রবন্ধে (১৯১৫)। পৃঃ ৪৪

(১৫) **মহাদেশীয় ব্যবস্থা** বা মহাদেশীয় অবরোধ — ১৮০৬ সালে প্রথম নেপোলিয়ন গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য করার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় মূলভূমির দেশগুলির প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর এটা বাতিল হয়ে যায়। পৃঃ ৪৬

(১৬) **'মার্সেলেজ', 'কার্মেনিওল',** 'Ça ira' (সা ইরা) — ১৮ শতকের শেষের দিকে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ের বৈপ্লবিক গান। শেষ গানটির ধুয়া হল: 'Ah! ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne!' ('এটাই চলবে। অভিজাতদের টাঙাও ল্যাম্পপোস্টে!')। পৃঃ ৪৯

(১৭) ম. স্টির্নারের 'অদ্বিতীয় এবং তাঁর সম্পত্তি' (M. Stirner. 'Der Einzige und sein Eigenthum'. Leipzig, 1845) থেকে এই উক্তিগুলি। পৃঃ ৫০

(১৮) ব.বাউয়েরের 'ল্যুডভিগ ফয়েরবাখের বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধ থেকে উক্তিটি গৃহীত (১৮৪৫ সালের 'Wigand's Vierteljahrsschrift' পত্রিকা, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৩৯)। পৃঃ ৫৪

(১৯) ম. স্টির্নারের 'অদ্বিতীয় এবং তাঁর সম্পত্তি' থেকে গৃহীত উক্তি। পৃঃ ৫৪

(২০) 'Hallische Jahrbücher' এবং 'Deutsche Jahrbücher' — নবীন হেগেলপন্থীদের সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকার সংক্ষেপিত নাম। লাইপজিগ থেকে দৈনিক সংবাদপত্রের আকারে প্রকাশিত হত ১৮৩৮ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৪১ সালের জুন পর্যন্ত 'Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst' ('জার্মান বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত গল্-এর বর্ষপঞ্জি') নামে এবং ১৮৪১ সালের জুলাই থেকে ১৮৪৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত 'Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst' ('বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত জার্মান বর্ষপঞ্জি') নামে। ১৮৪৩ সালের জানুয়ারিতে সরকার পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ করে দেয়। পৃঃ ৫৪

(২১) B. Bauer. 'Geschichte der Politik, Cultur und Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts.' Bd. 1-2, Charlottenburg, 1843–1845 (ব. বাউয়ের,

'অষ্টাদশ শতকের রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং জ্ঞানালোক বিতরণের ইতিহাস', ১-২ খণ্ড, শার্লোটেনবার্গ, ১৮৪৩—১৮৪৫)। পৃঃ ৫৫

(২২) **রাইন-গীত** — এটাকে জাতীয়তাবাদীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত। জার্মান পেটি-বুর্জোয়া কবি ন. বেকেরের 'জার্মান রাইন' কবিতা; কবিতাটি রচিত হয় ১৮৪০ সালে; পরবর্তী বছরগুলিতে বিভিন্ন সুরকার গানটিতে সুর দেন। পৃঃ ৫৫

(২৩) ১৮৪৫ সালের 'Wigand's Vierteljahrsschrift' পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩-২০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ল. ফয়েরবাখের ' "অদ্বিতীয় এবং তাঁর সম্পত্তি" প্রসঙ্গে "খ্রীষ্টধর্মের সারমর্ম" সম্পর্কে' প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে এখানে। প্রবন্ধটি শেষ হয় এইভাবে: 'কাজেই, ব্যক্তি হিসেবে ফয়েরবাখকে বস্তুবাদী, ভাববাদী কিংবা দার্শনিক কোনটাই বলা যায় না। তাহলে তিনি কী? তিনি বস্তুতে যা, চিন্তনে তাইই, মরদেহে, বোধশক্তিতে যা, মনেও তাই — তিনি **মানুষ; যেহেতু ফয়েরবাখ মানুষের সত্তাকে সঞ্চারিত করেন কেবল তার সম্প্রদায়ের মাঝে — তিনি** সামাজিক মানুষ, **কমিউনিস্ট।** পৃঃ ৫৬

(২৪) L. Feuerbach. 'Grundsätze der Philosophie der Zukunft', Zürich und Winterthur, 1843, S. 47 (ল. ফয়েরবাখ, 'ভবিষ্যতের দর্শনের মূল উপাদানসমূহ', জুরিখ এবং ভিন্টেরথুর, ১৮৪৩, পৃঃ ৪৭)।

সম্ভবত 'জার্মান ভাবাদর্শ' রচনার প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের জন্যে লেখা 'ফয়েরবাখ' শীর্ষক মন্তব্যলিপিতে এঙ্গেলস ফয়েরবাখের বইখানা থেকে নিম্নলিখিত অংশটা উদ্ধৃত করে তার উপর মন্তব্য করেন:

'যেটাকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন একটা সাধারণ ধারণা নয় অস্তিত্ব। বিদ্যমান সবকিছুর সঙ্গে মিলে অস্তিত্ব... অস্তিত্ব হল সত্তার অবস্থান। **আমার সত্তাই আমার অস্তিত্ব।** মাছ রয়েছে জলে, কিন্তু এই অস্তিত্ব থেকে মাছের সত্তাকে আলাদা করা যায় না। এমনকি ভাষাও অস্তিত্ব আর সত্তাকে অভিন্নরূপে ধরে। শুধু মানুষের জীবনেই অস্তিত্ব সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন — **কিন্তু কেবল ব্যতিক্রমী, অনুপযোগী ক্ষেত্রে;** এমনটা ঘটে যাতে কোন লোক যেখানে বিদ্যমান, তার সত্তা সেখানে নয়, কিন্তু এই অবস্থারই দরুন তার দেহ বাস্তবিকই যেখানে সেখানে যথার্থই থাকে না তার অন্তরাত্মা। শুধু যেখানে তোমার অন্তর, **সেখানেই তুমি।** কিন্তু সবকিছু — **অস্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে ছাড়া** — যেখানে আছে সেখানে থেকেই খুশি এবং নিজেরা যা তাই হয়েই খুশি' (পৃঃ ৪৭)।

'বিদ্যমান পরিস্থিতির সংস্কার স্তুতিই বটে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলি এবং কয়েকটি অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছেড়ে দিলে, তুমি সাত বছর বয়সে কোন কয়লাখনির

দারোয়ান হলে এবং দিনে চৌদ্দ ঘণ্টা অন্ধকারে একা থেকে খুশি, আর যেহেতু এটা তোমার অস্তিত্ব, তাই এটা তোমার সত্তাও বটে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে যে সুতো জোড়ে তার বেলায়ও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। শ্রমের কোন একটা শাখার অধীন হওয়াতেই তোমার "সত্তা"।' পৃঃ ৫৬

(২৫) 'জার্মান ভাবাদর্শ'-র প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের কথা এখানে বলেছেন মার্কস এবং এঙ্গেলস। ফয়েরবাখ সম্পর্কে এই অংশটি গোড়ায় তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর তার ঠিক পরেই ছিল মার্কস এবং এঙ্গেলস যেটার কথা বলেছেন সেই বয়ানটা। তৃতীয় অধ্যায়ের উল্লিখিত অংশে মার্কস এবং এঙ্গেলস উদ্ধৃতি দেন হেগেলের 'ইতিহাসের দর্শন' ও অন্যান্য রচনা থেকে। পৃঃ ৬২

(২৬) **শস্য-আইনবিরোধী লীগ** — ইংরেজ শিল্প-বুর্জোয়াদের একটা সংগঠন; ১৮৩৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানা-মালিক কবডেন এবং ব্রাইট এটার প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশ থেকে শস্য আমদানি সীমাবদ্ধ কিংবা নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত তথাকথিত শস্য নিয়ন্ত্রণ আইন ইংলন্ডে চালু হয়েছিল বড় জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে। অবাধ বাণিজ্যের দাবি তুলে 'লীগ' শস্য নিয়ন্ত্রণ আইন রদের চেষ্টা করে, যাতে শ্রমিকদের মজুরি কমানো যায় এবং ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতদের আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক অবস্থান দুর্বল করা যায়। এই সংগ্রামের ফলে ১৮৪৬ সালে আইনটা রদের বিল গৃহীত হয় এবং তাতে ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতদের বিরুদ্ধে শিল্প-বুর্জোয়াদের বিজয় সূচিত হয়। পৃঃ ৬৫

(২৭) **'পরিমেল'** ('Verein') — স্টির্নারের বক্তব্য অনুসারে এটা ছিল আত্মবাদীদের স্বেচ্ছা-সম্মিলনী। পৃঃ ৬৭

(২৮) J. Aikin. 'A Description of the Country from thirty to forty Miles round Manchester'. London, 1795 (জ. আইকিন, 'ম্যাঞ্চেস্টারের চারপাশে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল গ্রামাঞ্চলের বর্ণনা,' লন্ডন, ১৭৯৫)। পৃঃ ৭৫

(২৯) ই. পিন্টোর 'Traité de la Circulation et du Crédit', Amsterdam, 1771 ('মুদ্রা প্রচলন এবং ক্রেডিট সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ', আমস্টার্ডাম, ১৭৭১) বই থেকে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে 'Lettre sur la Jalousie du Commerce' ('বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে পত্র'), ২৩৪ এবং ২৮৩ পৃষ্ঠা। পৃঃ ৭৬

(৩০) A. Smith. 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth

of Nations'. London, 1776 (আ. স্মিথ, 'জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি এবং কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান', লন্ডন, ১৭৭৬)। পৃঃ ৭৬

(৩১) ১৭৬২ সালে আমস্টার্ডামে প্রকাশিত জ. জ. রুসো'র 'Du Contract social; ou, Principes du droit politique' ('পারস্পরিক সামাজিক চুক্তি বা রাজনীতিক নিয়মের মূল উপাদানসমূহ') গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৭

(৩২) ১৮৪৫ সালের 'Wigands's Vierteljahrsschrift' পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় ম. স্টির্নারের 'স্টির্নারের সমালোচকগণ' প্রবন্ধে প্রকাশিত তাঁর অভিমতের কথা বলা হচ্ছে এখানে। পৃঃ ৮৯

(৩৩) নর্মানরা ইংলন্ড জয় করে ১০৬৬ সালে; নেপল্‌স — ১১৩০ সালে। পৃঃ ৮৯

(৩৪) **বাইজ্যান্টাইন** — পূর্ব রোম সাম্রাজ্য; ৩৯৫ সালে দাস-মালিকানার রোম সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া রাষ্ট্র; এটার কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল্‌; পরে এই রাষ্ট্রের নাম হয় বাইজ্যান্টাইন; ১৪৫৩ সালের তুর্কী বিজয় পর্যন্ত এই রাষ্ট্র টিকে ছিল। পৃঃ ৯২

(৩৫) ইতালির আমাল্‌ফি শহর ১০-১১ শতকে সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এই শহরের সামুদ্রিক আইন (Tabula Amalphitana) সারা ইতালিতে বলবৎ এবং ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পৃঃ ১০১

(৩৬) **'কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ'** রচনাটি হল কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচির খসড়া, প্যারিসে 'লীগের' আঞ্চলিক কমিটির নির্দেশে এঙ্গেলসের লেখা। ১৮৪৭ সালের ২৩-২৪ নভেম্বর মার্কসের কাছে চিঠিতে এঙ্গেলস প্রশ্নোত্তরের আকার ছেড়ে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' রূপে কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচি প্রণয়নের প্রস্তাব দেন। কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (২৯ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর) মার্কস এবং এঙ্গেলসের অভিমতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেওয়া হয় এবং লীগের কর্মসূচি 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' লেখার ভার দেওয়া হয় তাঁদের উপর। 'ইশতেহার' লেখার সময়ে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় 'কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ' রচনায় তুলে ধরা কথাগুলি ব্যবহার করেন।

'কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ' রচনায় এঙ্গেলস প্রলেতারীয় পার্টির কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগত এবং কর্মকৌশলগত নীতি তাত্ত্বিকভাবে প্রতিপন্ন করেন, এবং বিজয়ী প্রলেতারিয়েত যেগুলির সাহায্যে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে প্রস্তুত হতে পারবে সেইসব ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। পৃঃ ১০৬

(৩৭) পাণ্ডুলিপিতে ২২ এবং ২৩ নং প্রশ্নের উত্তরের বদলে 'রয়েছে' কথাটি লেখা আছে। বোধ হয়, এর মানে হল কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচির কোন একটি প্রাথমিক খসড়ায় যেমনটি সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে তেমনিই রয়েছে উত্তরটা, ঐ খসড়া আমাদের কাছে পৌঁছয় নি। পৃঃ ১২৪

(৩৮) **চার্টিস্টরা** — ১৯ শতকের চতুর্থ দশক থেকে ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিকদের রাজনীতিক আন্দোলনে অংশগ্রাহীরা। কঠিন আর্থনীতিক অবস্থা এবং রাজনীতিক অধিকারহীনতার ফলেই এই আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের স্লোগান ছিল 'গণ-চার্টার' কার্যে পরিণত করার জন্যে সংগ্রাম। 'চার্টার'-এ ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং কয়েকটা শর্তের দাবি, যা শ্রমিকদের জন্যে ঐ অধিকার সুনিশ্চিত করবে। লেনিন বলেছেন, চার্টিজম হল 'প্রথম ব্যাপক, সত্যিকার সর্বজনীন, বৈপ্লবিক প্রলেতারীয় আন্দোলন যার ছিল রাজনীতিক আকার'। পৃঃ ১২৬

(৩৯) **'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'** — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রথম কর্মসূচিগত দলিল, যাতে তুলে ধরা হয়েছে মার্কস এবং এঙ্গেলসের মহৎ শিক্ষার বুনিয়াদী মূল উপাদনসমূহের সুসম্পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যান। 'এই রচনাটিতে মহাপ্রতিভাসঞ্জাত স্বচ্ছতা আর উজ্জ্বলতা দিয়ে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে এক নতুন বিশ্ববীক্ষা, সঙ্গতিপূর্ণ বস্তুবাদ, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রও যেটার অন্তর্ভুক্ত; বিকাশ সম্পর্কে সবচেয়ে সর্বাত্মক এবং গভীর শিক্ষা হিসেবে দ্বন্দ্বতত্ত্ব; শ্রেণী-সংগ্রাম এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকা সংক্রান্ত তত্ত্ব' (ভ. ই. লেনিন)।

পুঁজিতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পতন এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণে প্রলেতারিয়েতকে সজ্জিত করে এবং বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়ান আন্দোলনের কাজ এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'।

কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচি হিসেবে মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখা এই 'ইশতেহার' প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডনে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে। বর্তমান সংস্করণটিতে মূল রচনাটির ছাড়াও সমস্ত সংস্করণের মুখবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, শুধু ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত ইংরেজী সংস্করণের মুখবন্ধটি ছাড়া, কারণ এটির সারমর্ম রয়েছে অন্যান্য মুখবন্ধগুলিতে, এবং বিশেষ করে ১৮৯০ সালে প্রকাশিত জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে। পৃঃ ১২৮

(৪০) **কমিউনিস্ট লীগ** — মার্কস এবং এঙ্গেলসের প্রতিষ্ঠিত প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন, যা বিদ্যমান ছিল ১৮৪৭—১৮৫২ সালে। ফ. এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস সম্পর্কে' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২৮

(৪১) এখানে ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১২৮

(৪২) 'The Red Republican' ('লাল প্রজাতন্ত্রী') — চার্টিস্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮৫০ সালের জুন থেকে নভেম্বর অবধি লন্ডনে এটা প্রকাশ করেছিলেন জ. হার্নি। ১৮৫০ সালের নভেম্বরে এটার ২১-২৪ সংখ্যায় সংক্ষেপিত আকারে 'ইশতেহার' প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১২৮

(৪৩) জুন অভ্যুত্থান' — ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুন প্যারিসের শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান। অতি নিষ্ঠুরভাবে এটাকে দমন করে ফরাসী বুর্জোয়ারা। এই অভ্যুত্থান হল প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ইতিহাসে প্রথম মহা গৃহযুদ্ধ। পৃঃ ১২৮

(৪৪) 'Le Socialiste' ('সমাজতন্ত্রী') — ১৮৭১ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৭৩ সালের মে পর্যন্ত নিউ-ইয়র্কে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকাটি ছিল 'আন্তর্জাতিক'-এর উত্তর-আমেরিকান ফেডারেশনের ফরাসী শাখার একটি মুখপত্র। হেগ কংগ্রেসের পরে পত্রিকাটি 'আন্তর্জাতিক'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এর ফরাসী অনুবাদ 'Le Socialiste' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালের জানুয়ারি-মার্চে। পৃঃ ১২৮

(৪৫) এখানে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এর প্রথম রুশ সংস্করণের কথা বলা হচ্ছে। বাকুনিনের অনূদিত এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয় জেনেভায় ১৮৬৯ সালে। অনুবাদের সময়ে বাকুনিন কয়েক জায়গায় 'ইশতেহার'-কে বিকৃত করেন। প্রথম সংস্করণের ত্রুটি প্লেখানভের অনূদিত ১৮৮২ সালে জেনেভায় প্রকাশিত সংস্করণে দূর করা হয়। প্লেখানভের অনুবাদ রাশিয়ায় 'ইশতেহার'-এর ব্যাপক প্রচারের সূচনা ঘটায়। পৃঃ ১২৮

(৪৬) **১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউন** — ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত বিদ্যমান শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সরকার। ব্যাপক অর্থে, প্যারিস কমিউন নামে ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চের প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং তার পরবর্তী প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কালও বলে। প্যারিস কমিউনের ইতিহাস এবং তার মর্মের বিশদ ব্যাখ্যান পাওয়া যায় মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' রচনায়। পৃঃ ১২৯

(৪৭) এখানে মুক্ত রুশ ছাপাখানার কথা বলা হচ্ছে। আ. ই. গের্ৎসেন এবং ন. প. ওগারিয়োভের প্রকাশিত 'কলোকোল' (ঘণ্টা) নামক বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পত্রিকাটি এখানে ছাপা হত। গের্ৎসেনের প্রতিষ্ঠিত এই ছাপাখানা ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত ছিল

লন্ডনে, তারপর স্থানান্তরিত হয় জেনেভায়। এই ছাপাখানায়ই ১৮৬৯ সালে 'ইশতেহার'-এর প্রথম রুশ সংস্করণ ছাপান হয়। ৪৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৩০

(৪৮) ১৮৮১ সালের ১ মার্চ সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্দর 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' (জনগণের সংকল্প)-পন্থীদের হাতে নিহত হবার পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তৃতীয় আলেক্সান্দর যখন 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া'-র গুপ্ত নির্বাহী কমিটির সম্ভাব্য নতুন নতুন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ভয়ে গাৎচিনায় লুকিয়েছিলেন, সেই সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা মার্কস এবং এঙ্গেলস এখানে বলেছেন। পৃঃ ১৩১

(৪৯) **কলোন কমিউনিস্ট মামলা** (১৮৫২ সালের ৪ অক্টোবর-১২ নভেম্বর) — কমিউনিস্ট লীগের ১১ জন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রাশিয়া সরকারের সাজান মামলা। জাল দলিল এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সাত জনকে ৩ থেকে ৬ বছর কেল্লাবন্দী রাখার দন্ডাদেশ দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রুশীয় পুলিসী রাষ্ট্রের জঘন্য প্ররোচনাটাকে খুলে ধরেন মার্কস এবং এঙ্গেলস (এঙ্গেলসের 'কলোনে সাম্প্রতিক মামলা' প্রবন্ধ এবং মার্কসের 'কলোন কমিউনিস্ট মামলার রহস্যোদ্‌ঘাটন' পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৩৩

(৫০) ১৯ শতকের পঞ্চম দশক থেকে শুরু করে বহু রচনায় মার্কস এবং এঙ্গেলস এই তাত্ত্বিক উপস্থাপনাটিকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন; এখানে যেমনটা সূত্রবদ্ধ সেই আকারে এটা রয়েছে আন্তর্জাতিক মেহনতী জন সমিতির নিয়মাবলিতে।

পৃঃ ১৩৫

(৫১) উক্ত ভূমিকাটি এঙ্গেলস লেখেন ১৮৯০ সালের ১ মে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্যারিস কংগ্রেসের (১৮৮৯ সালের জুলাই) সিদ্ধান্ত অনুসারে যেদিন ইউরোপ আর আমেরিকার কতকগুলি দেশে আট ঘণ্টার কর্মদিন এবং কংগ্রেসের বিবৃত অন্যান্য দাবিতে গণ-মিছিল, ধর্মঘট এবং সভা-সমাবেশ করা হয়। এই সময় থেকে ১ মে দিনটিকে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক সংহতির সংগ্রামী প্রদর্শন দিবস হিসেবে সমস্ত দেশের শ্রমিকেরা প্রতি বছর উদ্‌যাপন করে। পৃঃ ১৩৫

(৫২) **কংগ্রেসী পোল্যান্ড** — পোল্যান্ডের যে অংশটাকে ১৮১৪—১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে পোল্যান্ড রাজ্য নামে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। পৃঃ ১৩৬

(৫৩) জার-স্বৈরতন্ত্রের পীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত ১৮৬৩—১৮৬৪ সালের পোলীয় জাতীয়-মুক্তি অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে এখানে। 'লাল' ক্ষুদ্র অভিজাত পার্টির

অযৌক্তিকতার দরুন বৈপ্লবিক উদ্যোগ তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, ফলে অভ্যুত্থানের পরিচালনা চলে যায় ভূস্বামী-অভিজাত এবং বড়ো বুর্জোয়াদের হাতে, তারা জার সরকারের সঙ্গে লাভজনক রফার চেষ্টা চালায়। ১৮৬৪ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ জারের সৈন্যবাহিনী নিষ্ঠুরভাবে অভ্যুত্থান দমন করে। পৃঃ ১৪২

(৫৪) এই টীকাটি এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এর ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণেও ব্যবহার করেন, তাতে শুধু শেষ বাক্যটি বাদ দেন। পৃঃ ১৩৭

(৫৫) **ধর্মযুদ্ধ** — মুসলমান শাসনের হাত থেকে জেরুজালেম এবং অন্যান্য 'পুণ্যক্ষেত্রে' খ্রীষ্টীয় পূতবস্তুগুলি মুক্ত করার নামে ধর্মীয় পতাকাতলে ১১-১৩ শতকে বড় বড় পশ্চিম-ইউরোপীয় সামন্ত, নাইট, ইতালীয় বাণিজ্যিক শহরগুলির পূর্ব দিকে সামরিক-ঔপনিবেশিক আন্দোলন। ধর্মযুদ্ধের আদর্শবিদ এবং প্রোৎসাহদাতা ছিল ক্যাথলিক চার্চ আর বিশ্বপ্রভুত্বকামী পোপতন্ত্র এবং প্রধান সামরিক শক্তি ছিল নাইটহুড। সামন্তদের নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে ব্যগ্র কৃষকরাও এই অভিযানগুলিতে অংশগ্রহণ করে। যেসব দেশের উপর দিয়ে ধর্মযোদ্ধারা যায় সেখানকার মুসলমান এবং খ্রীষ্টান অধিবাসীদের উপর লুণ্ঠন এবং অত্যাচার চালানো হয়। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, টিউনিসিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলিই শুধু নয়, খ্রীষ্টীয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যও ছিল এই ধর্মযোদ্ধাদের আগ্রাসী বাসনার লক্ষ্য। কিন্তু পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এই ধর্মযোদ্ধাদের বিজয় পাকাপোক্ত না থাকায় তাদের অধিকৃত এলাকাগুলি শিগগিরই মুসলমানদের হাতে ফিরে যায়। পৃঃ ১৪৬

(৫৬) পরবর্তী রচনাগুলিতে মার্কস এবং এঙ্গেলস 'শ্রমের মূল্য' আর 'শ্রমের দাম' কথাগুলির বদলে মার্কসের চালু করা আরও সঠিক পরিভাষা 'শ্রমশক্তির মূল্য' এবং 'শ্রমশক্তির দাম' ব্যবহার করেছেন (এই প্রসঙ্গে মার্কসের 'মজুরি-শ্রম এবং পুঁজি' রচনায় এঙ্গেলসের লেখা মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৫০

(৫৭) এখানে নির্বাচনী আইন সংস্কারের জন্যে আন্দোলন সম্পর্কে বলা হচ্ছে। জনসাধারণের চাপে এই আইন কমন্স্ সভায় পাস হয় ১৮৩১ সালে এবং ১৮৩২ সালের জুনে লর্ড সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এই সংস্কারটাকে তাক করা হয়েছিল ভূমি-সম্পত্তির মালিক এবং ফিনান্স অভিজাতদের রাজনীতিক একচেটে শাসনের বিরুদ্ধে এবং এটি শিল্প-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের পার্লামেন্টে প্রবেশের পথ খুলে দেয়। এই সংস্কারের জন্যে সংগ্রামের প্রধান শক্তি প্রলেতারিয়েত এবং পেটি বুর্জোয়ারা উদারপন্থী বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রতারিত হয় এবং নির্বাচনী অধিকার লাভ করে না। পৃঃ ১৬৮

(৫৮) **১৬৬০—১৬৮৯ সালের রেস্টোরেশন** — ইংলণ্ডে ১৭ শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের উচ্ছেদ ঘটিয়ে রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের পরে স্টুয়ার্ট বংশের রাজত্ব-কাল।

১৮১৪—১৮৩০ সালের রেস্টোরেশন — ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের পুনর্বার শাসনের কাল। বুরবোঁদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্র অভিজাত এবং যাজকতন্ত্রের স্বার্থ দেখত। ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে এই শাসনের উচ্ছেদ ঘটে। পৃঃ ১৬৮

(৫৯) **লেজিটিমিস্টরা** — ১৮৩০ সালে উৎখাত 'বৈধ' ('legitimate') বুরবোঁ বংশের অনুগামীরা। এই বংশ বড় বড় ভূমি-সম্পত্তি মালিক অভিজাতদের স্বার্থ দেখত। ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের উপর নির্ভর করা রাজত্বকারী অর্লিয়েন্স বংশের (১৮৩০—১৮৪৮) বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেজিটিমিস্টদের একাংশ সোশ্যাল বাগাড়ম্বরের শরণ নিয়ে বুর্জোয়াদের শোষণ থেকে শ্রমজীবীদের রক্ষক হিসেবে নিজেদের জাহির করত। পৃঃ ১৬৯

(৬০) **'নবীন ইংলণ্ড'** — টোরি পার্টির ইংরেজ রাজনীতিক এবং সাহিত্যিকদের একটি গ্রুপ; ১৯ শতকের পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে গঠিত হয়। বুর্জোয়াদের বেড়ে-চলা আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক পরাক্রমের বিরুদ্ধে ভূস্বামী অভিজাতদের অসন্তোষ প্রকাশ করে 'নবীন ইংলণ্ড' বাগাড়ম্বরের ছল দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে নিজেদের প্রভাবাধীন করা এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে নিজেদের সংগ্রামে এই শ্রেণীকে হাতিয়ারে পরিণত করার চেষ্টা করত। পৃঃ ১৬৯

(৬১) **জাঙ্কার** — সংকীর্ণ অর্থে পূর্ব প্রাশিয়ার ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী; ব্যাপক অর্থে — জার্মান ভূস্বামীদের শ্রেণী। পৃঃ ১৬৯

(৬২) ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত 'La Réforme' ('সংস্কার') পত্রিকার পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী-প্রজাতন্ত্রী এবং পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী অনুগামীদের কথা। তারা প্রজাতন্ত্র স্থাপন এবং গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করে। পৃঃ ১৭৯

(৬৩) 'La Réforme' পত্রিকার কথা ৬২ নং টীকায় দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৮০

(৬৪) ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পোল্যান্ডের জাতীয় মুক্তির জন্যে পোল্যান্ডের সমস্ত অঞ্চলে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলে। এই অভ্যুত্থানের প্রেরণাদাতা ছিলেন পোলীয় বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা (দেম্বোভ্স্কি এবং অন্যান্যরা)। কিন্তু পোলীয় অভিজাত বর্গের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অভ্যুত্থানের নেতারা প্রুশীয়

পুলিসের দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে সার্ব অভ্যুত্থান ঘটে না, শুধু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ হয়। ১৮১৫ সাল থেকে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া আর প্রাশিয়ার সংযুক্ত নিয়ন্ত্রণে ছিল ক্রাকোভ, শুধু সেখানে বিদ্রোহীরা ২২ ফেব্রুয়ারি জয়লাভে এবং জাতীয় সরকার গঠনে সমর্থ হয়; সামন্ত মনিবদের বাধ্যতামূলক খাটুনির প্রথা বাতিল ক'রে ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিল এই সরকার। ১৮৪৬ সালের মার্চের গোড়ার দিকে ক্রাকোভের অভ্যুত্থান দমন করা হয়। ১৮৪৬ সালের নভেম্বরে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে, তাতে ক্রাকোভ অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃঃ ১৮০

(৬৫) এই প্রবন্ধটি ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বরে লেখা মার্কসের 'বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রতিবিপ্লব' রচনার অংশ। এই রচনাটিতে মার্কস প্রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের বিজয়ের কারণগুলিকে ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেন এবং জার্মানির মার্চ বিপ্লবের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করেন। পৃঃ ১৮২

(৬৬) এখানে জার্মানির ১৮৪৮ সালের মার্চ বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৮২

(৬৭) প্রাশিয়ার সমস্ত প্রাদেশিক সভার প্রতিনিধিদের সাম্প্রদায়িক সংস্থার কথা বলা হচ্ছে এখানে। বর্তমান ক্ষেত্রে মার্কস দ্বিতীয় 'মিলিত প্রাদেশিক সভা'র কথা বলছেন, এটি আহূত হয় ১৮৪৮ সালের ২ এপ্রিল কাম্পহাউজেনের মন্ত্রণালয়ে। তা প্রাশিয়ার জাতীয় সভা নির্বাচনের আইন চালু করে এবং ঋণ মঞ্জুর করে, যা সরকারকে দিতে ১৮৪৭ সালের 'মিলিত প্রাদেশিক সভা' অস্বীকার করেছিল। এর পর ১৮৪৮ সালের ১০ এপ্রিলে সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। পৃঃ ১৮২

(৬৮) **টোরি** — ইংলন্ডে ১৮ শতকের শেষে উদ্ভূত একটি রাজনীতিক পার্টি। এই পার্টি ভূস্বামী অভিজাত এবং উচ্চ যাজক সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রকাশ করত, সামন্ততান্ত্রিক অতীতের ঐতিহ্য রক্ষা করত এবং উদারপন্থী আর প্রগতিশীল দাবিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাত। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে টোরি পার্টির ভিত্তিতে কনসার্ভেটিভ পার্টি গঠিত হয়। পৃঃ ১৮২

(৬৯) তখনকার স্পেন সাম্রাজ্যের অধীন নেদারল্যান্ডসের (এখনকার বেলজিয়াম আর হল্যান্ড) ১৫৬৬-১৬০৯ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা এখানে বলা হচ্ছে; এই বিপ্লবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং জনসাধারণের সংগ্রাম এবং স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধের সংযুক্তি ঘটে। ১৬০৯ সালে কতকগুলি পরাজয়ের পর স্পেন বুর্জোয়া হল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৬ শতকের নেদারল্যান্ডসের বুর্জোয়া বিপ্লব ইউরোপে বুর্জোয়া

বিপ্লবগুলির বিজয়লাভের যুগের সূচনা করে। এখনকার বেলজিয়ামের রাজ্যক্ষেত্র স্পেনের দখলে ছিল ১৭১৪ সাল পর্যন্ত। পৃঃ ১৮৪

(৫০) এখানে মার্ক্সের পরিকল্পিত 'রাজনীতি এবং অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা' রচনাটির কথা বলা হচ্ছে, যা শেষ পর্যন্ত তিনি লিখে যেতে পারেন নি। পৃঃ ২০২

নামের সূচি

অ

অগস্তাস (খৃঃ পূঃ ৬৩ - খৃঃ ১৪) — প্রথম রোমক সম্রাট (খৃঃ পূঃ ২৭-খৃঃ ১৪)। —৩১

আ

আইকিন (Aikin), **জন** (১৭৪৭-১৮২২) — ইংরেজ চিকিৎসক, র‍্যাডিকাল প্রাবন্ধিক। — ৭৫

আন্নেন্‌কভ, পাভেল ভাসিলিয়েভিচ (১৮১২-১৮৮৭) — রুশ উদারনৈতিক জমিদার, সাহিত্যিক। —১৭৮-২০৩

আলেক্‌জাণ্ডর, ম্যাসিডনের (খৃঃ পূঃ ৩৫৬-৩২৩) — প্রাচীন দুনিয়ার বিখ্যাত সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। — ৭০

আলেক্সান্দর তৃতীয় (১৮৪৫-১৮৯৪) — রুশ সম্রাট (১৮৮১-১৮৯৪)। — ১৩১

এ

এঙ্গেলস (Engels), **ফ্রিডরিখ** (১৮২০-১৮৯৫) —১৩৩-১৩৬, ১৪২

ও

ওয়েন (Owen), **রবার্ট** (১৭৭১-১৮৫৮) — মহান ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। —১০, ১৭৬, ১৭৯

ক

কাবে (Cabet), **এতিয়েন** (১৭৮৮-১৮৫৬) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, চতুর্থ-পঞ্চম দশকে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রাহী, শান্তিপূর্ণ ইউটোপীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, 'ইকেরীয় ভ্রমণ' গ্রন্থের লেখক। —১৩৫, ১৭৯

কাম্পহাউজেন (Camphausen), **লুডল্‌ফ** (১৮০৩-১৮৯০) — জার্মান ব্যাঙ্কমালিক, রাইন অঞ্চলের উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের অন্যতম নেতা; ১৮৪৮ সালের মার্চ-জুনে প্রাশিয়ার মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি। —১৮৩

গ

গিজো (Guizot), **ফ্রাঁসোয়া পিয়ের গিয়োম** (১৭৮৭-১৮৭৪) — ফরাসী

বুর্জোয়া ইতিহাসকার ও রাষ্ট্রনায়ক, ১৮৪০ সাল থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কর্মনীতি কার্যত পরিচালনা করেন। —১৪১

গোটে (Goethe), **ইয়োহান ভলফ্‌গাং** (১৭৪৯-১৮৩২) — মহান জার্মান লেখক ও মনীষী। —৩১

গ্র্যুন (Grün), **কার্ল** (১৮১৭-১৮৮৭) — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি 'খাঁটি সমাজতন্ত্রের' অন্যতম মুখ্য প্রতিনিধি। —১৭৪

চ

চার্লস, মহান (শার্লেমেন) (৭৪২-৮১৪ নাগাদ) — ফ্র্যাংকদের রাজা (৭৬৮-৮০০) এবং সম্রাট (৮০০-৮১৪)। —৯৪

ড

ডারউইন (Darwin), **চার্লস রবার্ট** (১৮০৯-১৮৮২) — বিখ্যাত ইংরেজ নিসর্গবেদী, জীবঅভিব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাতা। —১০২

দ

দান্তে আলিগিয়েরি (Dante Alighieri), (১২৬৫-১৩২১) — বিখ্যাত ইতালীয় কবি। —১৪০

ন

নিউটন (Newton), **আইজাক** (১৬৪২-১৭২৭) — মহান ইংরেজ পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ, ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। —৭৭

নেপোলিয়ন তৃতীয় (লুই-নেপোলিয়ন বোনাপার্ট) (১৮০৮-১৮৭৩) — প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি (১৮৪৮-১৮৫১), ফরাসী সম্রাট (১৮৫২-১৮৭০)। —১৩৭

প

পিন্টো (Pinto), **আইজাক** (১৭১৫-১৭৮৭) — মস্ত ওলন্দাজ শেয়ার কারবারী, অর্থনীতিবিদ। —৭৬

প্রুধোঁ (Proudhon), **পিয়ের জোসেফ** (১৮০৯-১৮৬৫) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক, পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ, নৈরাজ্যবাদের আদি তত্ত্ববিদদের অন্যতম; ১৮৪৮ সালে সংবিধান-সভার ডেপুটি। —১৭৫

ফ

ফয়েরবাখ (Feuerbach), **ল্যুডভিগ** (১৮০৪-১৮৭২) — প্রাক্-মার্কসীয় কালে সবচেয়ে বিখ্যাত জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক। —৯-১৭, ২৯-৩৩, ৫৪-৫৭, ৮৪

ফুরিয়ে (Fourier), **শার্ল** (১৭৭২-

১৮৩৭) — মহান ফরাসী ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। —১৭৬, ১৭৯

ব

বাউয়ের (Bauer), **ব্রুনো** (১৮০৯-১৮৮২) — জার্মান ভাববাদী দার্শনিক, অন্যতম বিখ্যাত নবীন হেগেলপন্থী, বুর্জোয়া র‍্যাডিকাল; ১৮৬৬ সালের পরে জাতীয়তাবাদী-উদারপন্থী। —১৬, ১৭, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৪৮-৫১, ৫৩-৫৭

বাকুনিন, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮১৪-১৮৭৬) — রুশ গণতন্ত্রী, সাংবাদিক, জার্মানির ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশগ্রাহী; নৈরাজ্যবাদের অন্যতম মতাদর্শবিদ; প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কসবাদের শত্রু হিসেবে বক্তৃতা দেন; ১৮৭২ সালে হেগ কংগ্রেসে ভাঙনমূলক কার্যকলাপের জন্যে প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে বহিস্কৃত হন। —১৩০, ১৩৩

বাবেফ (Babeuf), **গ্রাক্‌স** (আসল নাম ফ্রাঁসোয়া নয়েল) (১৭৬০-১৭৯৭)— ফরাসী বিপ্লবী, ইউটোপীয় ঢালাও সমতাবাদী কমিউনিজমের প্রখ্যাত প্রতিনিধি; 'সব সমানদের' ষড়যন্ত্রের সংগঠক। —১৭৬

বিভেন (Bevan), **ভার্বলিউ** — সোয়ান্‌সি শহরের ট্রেড-ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি, ১৮৮৭ সালে এই শহরে অনুষ্ঠিত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। —১৩৪

বিসমার্ক (Bismarck), **অট্টো,** ভূস্বামী (১৮১৫-১৮৯৮) — প্রাশিয়া ও জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিবিদ, প্রুশীয় জাংকারদের প্রতিনিধি; প্রাশিয়ার মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি (১৮৬২-১৮৭১), জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলর (১৮৭১-১৮৯০)। —১৩৭

ব্র্যান্ডেনবুর্গ (Brandenburg), **ফ্রিডরিখ ভিলহেল্‌ম,** কাউন্ট (১৭৯২-১৮৫০) — প্রুশীয় জেনারেল ও রাষ্ট্রনায়ক, প্রতিবৈপ্লবিক মন্ত্রিসভার প্রধান (১৮৪৮ সালের নভেম্বর - ১৮৫০ সালের নভেম্বর)। — ১৮২

ব্লাঁ (Blanc), **লুই** (১৮১১-১৮৮২)— ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, ইতিহাসকার; ১৮৪৮ সালে সাময়িক সরকারের সদস্য এবং লুক্সেমবুর্গ কমিশনের সভাপতি; ১৮৪৮ সালের আগস্ট থেকে লন্ডনে পেটি-বুর্জোয়া দেশান্তরীদের অন্যতম নেতা।—১৮০

ভ

ভাইটলিং (Weitling), **ভিলহেল্‌ম** (১৮০৮-১৮৭১) — গোড়ার দিককার জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, ইউটোপীয় ঢালাও সমতাবাদী কমিউনিজমের অন্যতম তত্ত্বকার। — ১৩৫

ভেনেডে (Venedey), **ইয়াকব** (১৮০৫-১৮৭১) — জার্মান র‍্যাডিকাল সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মী, উদারনৈতিক। —৫৫

ম

মর্গান (Morgan), **লুইস হেনরি** (১৮১৮-১৮৮১) —বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী, আদিম সমাজের ইতিহাসকার, স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদী।—১৪২

মাউরার (Maurer), **গেওর্গ ল্যুডভিগ** (১৭৯০-১৮৭২) — বিশিষ্ট জার্মান বুর্জোয়া ইতিহাসকার, প্রাচীন ও মধ্যযুগের জার্মানির সমাজব্যবস্থা অধ্যয়ন করেন। —১৪২

মার্কস (Marx), **কার্ল** (১৮১৮-১৮৮৩)। —১৩১-১৩৬, ১৩৮, ১৮৮-১৯০, ১৯৪

মেটের্নিখ (Metternich), **ক্লেমেন্স,** প্রিন্স (১৭৭৩-১৮৫৯) — প্রতিক্রিয়াশীল অস্ট্রীয় রাষ্ট্রনায়ক; পররাষ্ট্র-মন্ত্রী (১৮০৯-১৮২১) ও চ্যান্সেলর (১৮২১-১৮৪৮), 'পবিত্র মিতালী'র অন্যতম সংগঠক। —১৪১

ম্যাকফারলেন (Macfarlane), **হেলেন** —১৮৪৯-১৮৫০ সালে চার্টিস্ট পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেন, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। —১২৮

র

রুসো (Rousseau), **জাঁ জাক** (১৮১২-১৭৭৮) — বিখ্যাত ফরাসী জ্ঞানপ্রচারক, গণতন্ত্রী, পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ। —৮৭

ল

লাসাল (Lassalle), **ফের্ডিনান্ড** (১৮২৫-১৮৬৪) — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, ব্যবহারজীবী, রাইন প্রদেশের ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রাহী; সপ্তম দশকের গোড়ায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন, সাধারণ জার্মান শ্রমিক লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৩); প্রাশিয়ার কর্তৃত্বে জার্মানিকে 'উপর' থেকে যুক্ত করার কর্মনীতি সমর্থন করেন, জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারার সূত্রপাত করেন। —১৩৩

লিসিনাস (গাই লিসিনাস স্তলোন) — খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধে রোমের রাষ্ট্রনায়ক; একজন রোমক শাসক হিসেবে সেকস্টিয়াসের সঙ্গে একত্রে প্লিবিয়ানদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করেন। —২২

লেদ্রু-রলাঁ (Ledru-Rollin), **আলেক্সাঁদর অগ্যুস্ত** (১৮০৭-১৮৭৪) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অন্যতম নেতা, 'Réforme' সংবাদপত্রের সম্পাদক; সংবিধান-সভা ও আইন-সভার ডেপুটি এবং এই দুই সভায় 'পর্বত' পার্টির নেতৃত্ব করেন, পরে দেশান্তরী হন। —১৪০

শ

শেরবুলিয়ে (Cherbuliez), **আঁতুয়া এলিজে** (১৭৯৭-১৮৬৯) — সুইস অর্থনীতিবিদ, সিস্মন্দি-র অনুগামী। —৯৪

স

সাঁ-সিমোঁ (Saint-Simon), **আঁরি** (১৭৬০-১৮২৫) — বিখ্যাত ফরাসী ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী।—১৭৬

সিসমন্দি (Sismondi), **জাঁ শার্ল লেওনার সিমোন্দ দ্য** (১৭৭৩-১৮৪২) — সুইস অর্থনীতিবিদ, পুঁজিতন্ত্রের পেটি-বুর্জোয়া সমালোচক। — ৯৪, ৯৫, ১৭১

স্টির্নার (Stirner), **মাক্স** (ক্যাস্পার শ্মিড্টের ছদ্মনাম) (১৮০৬-১৮৫৬) —জর্মান দার্শনিক, নবীন হেগেলপন্থী, বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নৈরাজ্যবাদের অন্যতম মতাদর্শবিদ। —১৬, ১৭, ৫৩-৫৭, ৬২, ৮১, ৮৯

স্ট্রাউস (Strauß), **ডাভিড ফ্রিডরিখ** (১৮০৮-১৮৭৪) —জার্মান দার্শনিক, অন্যতম বিশিষ্ট নবীন হেগেলপন্থী; ১৮৬৬ সালের পরে জাতীয়তাবাদী উদারনীতিক। —১৩, ১৬

স্মিথ (Smith), **অ্যাডাম** (১৭২৩-১৭৯০) — ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিনিধি। —৭৬, ১৯৩

হ

হাক্স্টহাউজেন (Haxthausen), **আগস্ট** (১৭৯২-১৮৬৬) — প্রুশীয় রাজকর্মচারী ও লেখক, রাশিয়ার ভূমি-সম্পর্ক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী প্রথার জেরের বর্ণনা করেন নিজের রচনায়। —১৪২

হান্সেমান (Hansemann), **ডাভিড** (১৭৯০-১৮৬৪) — বিশিষ্ট পুঁজিপতি, রাইন অঞ্চলের উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের অন্যতম নেতা; ১৮৪৮ সালের মার্চ-সেপ্টেম্বরে প্রাশিয়ার অর্থমন্ত্রী। —১৮২, ১৮৩

হেইট (Heydt), **আগস্ট**, ব্যারন ফন্ ডের (১৮০১-১৮৭৪) — প্রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক, বাণিজ্য, শিল্প ও পূর্ত মন্ত্রী (১৮৪৮-১৮৫৮)। —১৮২

হেগেল (Hegel), **গেওর্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ** (১৭৭০-১৮৩১) — জার্মান চিরায়ত দর্শনের মহান প্রতিনিধি, বিষয়গত ভাববাদী। — ১৩, ১৪, ১৫, ৩৩, ৫২, ৫৪, ৫৮, ৬২

হেনরি, অষ্টম (১৪৯১-১৫৪৭) — ইংলন্ডের রাজা (১৫০৯-১৫৪৭)।—৭২

দুনিয়ার মজদুর এক হও!